‘জাতীয় খাদ্য নীতি ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন’

পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, ২০১৮

মে ২০১৮

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এই সংকলনটি যাদের যৌথ প্রয়াসের ফসল:

কৃষি মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ ও অভ্যন্তরিণ সম্পর্ক বিভাগ)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
খাদ্য মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শিল্প মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (পরিকল্পনা কমিশন,তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগ, আইএমইডি)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক সমন্বয়ক
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)
খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত.কপি/হালনাগাদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: মহাপরিচালক, **এফপিএমইউ,** খাদ্য ভবন।
১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা ১০০০। www.fpmu.gov.bd// ইমেইল- dg@fpmu.gov.bd or naser.farid@gmail.com

সূচিপত্র

		আদ্যক্ষর সমষ্টি	*iv*
		নির্বাহী সারসংক্ষেপ	*vii*
১.		**সূচনা**	১
২.		**পরিবীক্ষণ পদ্ধতি**	২
৩.		**জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য ও ফলাফলের অগ্রগতি**	৭
	৩.১	জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য	৭
	৩.২	জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য-১ ও ফলাফল	১০
	৩.৩	জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য-২ ও ফলাফল	১৬
	৩.৪	জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য-৩ ও ফলাফল	২২
৪.		**খাদ্যের লভ্যতা : 'জাতীয় খাদ্য নীতির বিনিয়োগ পরিকল্পনা'-এর লক্ষ্য ও ফলাফলের অগ্রগতি**	**২৮**
	৪.১	কর্মসূচি ১: সমন্বিত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই এবং বৈচিত্র্যময় কৃষি	২৮
	৪.২	কর্মসূচি ২: সেচের জন্য উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো	৩৫
	৪.৩	কর্মসূচি ৩: উন্নত কৃষি উপকরণ ও মাটির উর্বরতা	৩৯
	৪.৪	কর্মসূচি ৪: মৎস্য ও মৎস্য-চাষ উন্নয়ন	৪৭
	৪.৫	কর্মসূচি ৫: হাঁসমুরগি এবং দুগ্ধ উৎপাদনকে কেন্দ্র করে প্রাণি-সম্পদের উন্নয়ন	৫৪
৫.		**খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ : 'জাতীয় খাদ্য নীতির বিনিয়োগ পরিকল্পনা'-এর লক্ষ্য ও ফলাফলের অগ্রগতি**	**৫৯**
	৫.১	কর্মসূচি ৬: উন্নত বাজারজাতকরণ, কৃষিতে মূল্য-সংযোজন ও কৃষি বহির্ভূত আয়	৫৯
	৫.২	কর্মসূচি ৭: রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৬৫
	৫.৩	কর্মসূচি ৮: সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন	৭০
	৫.৪	কর্মসূচি ৯: কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তার অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	৭৬
৬.		**খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার:'জাতীয় খাদ্য নীতির বিনিয়োগ পরিকল্পনা'-এর লক্ষ্য ও ফলাফলের অগ্রগতি**	**৮১**
	৬.১	কর্মসূচি ১০: সম্প্রদায়-ভিত্তিক পুষ্টি কর্মসূচি এবং সেবাসমূহ	৮১
	৬.২	কর্মসূচি ১১: তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম উপস্থাপন	৮৯
	৬.৩	কর্মসূচি ১২: নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং খাদ্যের গুণগত মানোন্নয়ন	৯৬
৭.		**খাদ্য নিরাপত্তার বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অর্থায়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি**	**১০২**
	৭.১	খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ পরিকল্পনায় সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট	১০২
	৭.২	সিআইপি অর্থায়ন: সময়সীমা ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ	১০৩
	৭.৩	সিআইপি বাজেট: মূল্যায়ন	১০৫
	৭.৪	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সিআইপি-তে বিনিয়োগ	১১৩
	৭.৫	সুপারিশমালা	১১৪
৮.		**সামগ্রিক মূল্যায়ন ও সুপারিশমালা**	**১১৫**
	৮.১	সামগ্রিক মূল্যায়ন	১১৫
	৮.২	সার্বিক সুপারিশমালা	১১৭
৯.		**পাদটীকা ও তথ্যসূত্রসমূহ**	**১২১**
১০.		**সংযুক্তিসমূহ**	**১২৬**

আদ্যক্ষর সমষ্টি

সংক্ষিপ্ত নাম	বিস্তারিত নাম
6^{th} FYP	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
7^{th} FYP	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ADB	এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক
ADP	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
AI	আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন
AIN	আয় ও পুষ্টির জন্য মৎস্য চাষ
ANC	গর্ভবতী মায়ের যত্ন
AoI	এরিয়া অব ইন্টারভেনশন
ASF	প্রাণিজ খাদ্যের উৎস
BADC	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
BANBEIS	বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশন ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিকস
BARC	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
BARI	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট
BAU	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
BB	বাংলাদেশ ব্যাংক
BBF	বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন
BBS	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
BCC	বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশনস
BDHS	বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ
BFRI	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট
BFSA	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
BIDS	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
BIHS	বাংলাদেশ সমন্বিত গৃহ-জরিপ
BIID	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট
BINA	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট
BIRDEM	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইন ডায়াবেটিক, এন্ডোক্রাইন এন্ড মেটাবলিক ডিজঅর্ডার
BIRTAN	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট
BJRI	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট
BLRI	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট
BMDA	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)
BMI	বডি মাস ইনডেক্স
BRAC	বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি
BRRI	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট
BSCIC	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
BSRI	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট
BSTI	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
CARS	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্স
CBN	মৌলিক চাহিদা খরচ
CED	শক্তির তীব্র ঘাটতি
CF	সম্পূরক খাবার
CFI	তীব্র খাদ্যাভাব
CIG	কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সম-স্বার্থ দল)
CIP	রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা
DAE	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
DALY	অক্ষমতা সমন্বয়কৃত জীবনকাল
DAM	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
DAP	ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট
DCI	সরাসরি ক্যালোরি গ্রহণ
DDP	কাঙ্ক্ষিত খাদ্যতালিকা প্যাটার্ন
DES	খাদ্যে শক্তির যোগান
DFID	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (যুক্তরাজ্য)
DG	মহাপরিচালক
DGFP	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা
DGHS	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

DLS	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
DoF	মৎস্য অধিদপ্তর
DP	উন্নয়ন সহযোগী
DPHE	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
DU	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
EBF	এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং
EEZ	এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন
FAO	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
FCT	ফুড কম্পোজিশন সারণী
FIAC	কৃষি তথ্য ও উপদেশ কেন্দ্র
FPMC	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি
FPMU	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট
FPWG	খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ
FSN	খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি
FSNIS	খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি তথ্য সেবা
FSNSP	খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিগত নজরদারি কর্মসূচি
FTF	ফিড দ্যা ফিউচার
GAM	বৈশ্বিক অপুষ্টির তীব্রতা
GDP	গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট
GED	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
GIZ	জিআইজেট (জার্মান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা)
GoB	বাংলাদেশ সরকার
GR	নৈমিত্তিক ত্রাণ
HFSNA	পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি অ্যাসেসমেন্ট
HIES	পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ
HKI	হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল
HPAI	অতি প্যাথোজেনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা
HPNSDP	স্বাস্থ্য, জনগণ ও পুষ্টিগত নিরাপত্তা কর্মসূচি
HYV	উচ্চ ফলনশীল জাত
IAPP	সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প
ICN২	দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি কনফারেন্স
ICT	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
IDA	আয়রন ঘাটতিজনিত এনিমিয়া
IEC	তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ
IEDCR	ইন্সটিটিউট অফ এপিডেমোলোজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ
IFA	আয়রন ফলিক এসিড
IFAD	ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট
IFPRI	ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট
IMED	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
INFOODS	ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব ফুড ডেটা সিস্টেমস
INFS	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট
IPC	ইন্টিগ্রেটেড খাদ্য নিরাপত্তা ফেজ সাইট
IPHN	সমন্বিত জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইন্সটিটিউট
IPM	সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা
IYCF	শিশু ও কিশোর পুষ্টি
JICA	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি
JPGSPH	জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল
LAN	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক
LANSA	দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কৃষি ও পুষ্টির ওঠানামা
LGD	স্থানীয় সরকার বিভাগ
LGED	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ
MAM	মধ্যম মাত্রার অপুষ্টি
MDG	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
MFSFP	আধুনিক খাদ্য সংগ্রহ সুবিধা প্রকল্প
MICS	মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে
MIS	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস

MoA	কৃষি মন্ত্রণালয়
MoDMR	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
MoEF	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
MoFL	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
MoFood	খাদ্য মন্ত্রণালয়
MoHFW	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
MOP	মিউরেট অব পটাশ
MoPME	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
MoSW	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
MoWCA	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
NAP	জাতীয় কৃষি নীতি
NARS	জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমস
NATP	জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প
NC	জাতীয় কমিটি
NCD	অসংক্রামক রোগ
NFP	জাতীয় খাদ্য নীতি
NFPCSP	জাতীয় খাদ্য নীতির সক্ষমতা জোরদারকরণ কর্মসূচি
NIS	পুষ্টি ইনফরমেশন সিস্টেমস
NMSS	জাতীয় গৌণ-খাদ্য উপাদান পরিস্থিতি জরিপ
NNS	জাতীয় পুষ্টি সেবাসমূহ
NPAN	জাতীয় পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা
NSSS	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল
NWRD	জাতীয় পানিসম্পদ ডাটাবেইজ
OMS	খোলা বাজারে বিক্রি
ORT	মৌখিক পুনরুদন থেরাপি
PFDS	সরকারি খাদ্য সরবরাহ সিস্টেম
PoA	কর্ম পরিকল্পনা
PoU	অপুষ্টির প্রকোপ
RDCD	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
REACH	শিশু ক্ষুধার বিরুদ্ধে পুণর্নবীকরণ প্রচেষ্টা
RNA	গ্রামীণ নন-ফার্ম কৃষি কর্মকান্ড
SAARC	দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা
SAM	অতি তীব্র অপুষ্টি
SDC	সুইস উন্নয়ন কর্পোরেশন
SDG	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
SMART	সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, সাধনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং সময় উপযোগী
SME	ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ
SOFI	বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা পরিস্থিতি
SRDI	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট
SSNP	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি
SUN	পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম
TSP	ট্রিপল সুপার ফসফেট
TT	বিষয়ভিত্তিক দল
TVET	টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং
UESD	আবশ্যিক সেবা সরবরাহ ব্যবহার
UNICEF	জাতিসংঘ শিশু তহবিল
USAID	জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা
USD	মার্কিন ডলার
USG	গুটি ইউরিয়া
VGD	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট
VGF	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং
WASH	পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন
WB	বিশ্ব ব্যাংক
WDB	পানি উন্নয়ন বোর্ড
WFP	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
WHO	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

উন্নয়নের মূলধারায় বাংলাদেশ 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'কে সংযুক্ত করে, যা দেশে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বাস্তবায়নের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিগত ২০১৫ সালের শেষে এমডিজি-এর মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ তার উন্নয়নের স্রোতধারায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়নকালে পরিকল্পনার সাথে পূর্ববর্তী উন্নয়ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের সঙ্গতি নিশ্চিত করা ছাড়াও এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সার্বিকভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সুশীল-সমাজ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে ব্যাপক ও নিবিড় অংশীদারিত্ব ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন। পরিকল্পনা ও কর্মসূচির অগ্রগতি পরিমাপ এবং পরিবীক্ষণের জন্য শক্তিশালী তথ্য-ধারা বজায় রাখতে অধিকতর সম্পদ এবং উন্নতমানের মৌলিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় ২০১৭ সাল পর্যন্ত অগ্রগতি বিশ্লেষণের ফলাফল সম্বলিত ২০১৮ সালের প্রারম্ভে প্রণীত এই পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনটি বর্তমান সিরিজের সপ্তম ও সর্বশেষ প্রতিবেদন, কারণ জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা (এন.এফ.পি-পি.ও.এ ২০০৮-২০১৫) ও কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সি.আই.পি, ২০১০-২০১৫)-এর মেয়াদান্তে ২০১৬-২০২০ সময়ে বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিশ্লেষণের বিষয়টি ২০১৮ সালের শেষে প্রণীতব্য পরবর্তী সিরিজের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ধারাবাহিক তথ্যের এই সংকলন খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞানের সঞ্চয়ন ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এ লক্ষ্যে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রতিবেদন ভবিষ্যতে প্রণিতব্য 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি'র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সুপারিশ করেছে।

পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে চার স্তর-বিশিষ্ট ফলাফল চেইনের ওপর ভিত্তি করে ফলাফল-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (Results-oriented Monitoring Approach) গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্যকে সর্বোচ্চ স্তর বিবেচনা করে তা প্রাপ্ত ফলাফল একীভূত করা হয় (২য় পর্যায়ে), তা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল (৩য় পর্যায়ে) ও ইনপুট গ্রহণ করা হয় (৪র্থ পর্যায়ে)। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ফলাফল কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে লক্ষ্যের বিপরীতে অগ্রগতি পরিমাপে বিভিন্ন নির্দেশক (Indicator) ব্যবহার করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং খাদ্য নীতি বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা এ দু'টি দলিলে একই ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে যাতে প্রত্যাশিত ফলাফল পরিবীক্ষণ করা যায়। সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রকল্প সংক্রান্ত অর্থায়ন ও বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত।

পরিবীক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

জাতীয় খাদ্য নীতি ও তদসংশ্লিষ্ট নীতি-বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো' বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় সাধন করে। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের পক্ষে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সার্বিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকল্পে গঠিত "খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফ.পি.এম.সি)" এ বিষয়ে কৌশলগত নির্দেশনা এবং আন্তঃ-খাত সহযোগিতায় উচ্চ পর্যায়ের নীতিগত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। সকল অংশীজনের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় কমিটি সি.আই.পি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া তদারকি করে থাকে। ফুড পলিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ (FPWG) কারিগরি ও প্রায়োগিক পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক চারটি কারিগরি দলের (Thematic Team) পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা ও সমন্বয়ে সহযোগিতা প্রদান করে। একই সাথে, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী যারা বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনায় জড়িত তারাও সি.আই.পি'র আর্থিক পরিবীক্ষণের জন্য তথ্য প্রদান করে।

জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি

জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। জাতীয় খাদ্য নীতি-এর কর্ম-পরিকল্পনা (পি.ও.এ) ২০০৮-২০১৫ অর্থবছর সময়কালে এ কৌশলগুলো ২৬টি হস্তক্ষেপযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা'টি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বিনিয়োগের একটি পথ নির্দেশক দলিল হিসাবে বিবেচিত, যা জাতীয় খাদ্য নীতি-এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য ১২টি বিনিয়োগ কর্মসূচিকে সুনির্দিষ্ট করেছে। জাতীয় খাদ্য নীতির কর্ম-পরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ১.৪ এবং দ্বিতীয় অংশে যথাক্রমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন কৌশল ও দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট করা রয়েছে।

জাতীয় খাদ্য নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে, 'সব সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা'। জাতীয় খাদ্য নীতি (এন.এফ.পি)-এর লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য তিনটি নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন; অপুষ্টির বিস্তার (পি.ও.ইউ), স্বল্প ওজনের শিশু (বয়স অনুপাতে ওজন কম), শিশুর খর্বতা (বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম)। তার সাথে আরও চারটি নির্দেশক যোগ করা হয়েছে, যা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অপুষ্টির বিস্তার নির্দেশক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ২০১৫ সালের পূর্বেই এমডিজি-এর-১ এর লক্ষ্যমাত্রা (<১৭%) অর্জন করেছে। ২০১৩ সালে সামান্য অবনতির পরে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই লক্ষ্যমাত্রা (১৬.৯%) অর্জিত হয় এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অপুষ্টির বিস্তার (১৬.৪%) আরও হ্রাস পায় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে আরও উন্নতি (১৫.১%) হয়েছে। কম ওজনের শিশুর সংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে এমডিজি-১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৯৯০ সালে ৬৬% থেকে ২০১৫ সালে ৩৩% এ নেমে আসে। জাতীয় খাদ্য নীতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সময়ে কম ওজনের শিশুর সংখ্যা হ্রাসে স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। ২০১২-১৩ অর্থবছরে অপরিহার্য সার্ভিস ডেলিভারির ব্যবহার (ইউ.ই.এস.ডি) জরিপে প্রাক্কলিত কম ওজনের শিশুর সংখ্যা ছিল ৩৫.১%। বিডিএইচএস-এর জরিপ অনুসারে ২০১৪ সালে কম ওজনের শিশুর সংখ্যা ছিল ৩২.৬% এবং এসএফএসএন জরিপ অনুসারে পরবর্তী বছরে তা ৩১% দাঁড়ায়। প্রাপ্ত তথ্যে আরও দেখা যায় যে, শিশু খর্বতা ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ছিল ৬০%, বিডিএইচএস-এর জরিপ অনুসারে যা ২০১৪ সালে হ্রাস পেয়ে ৩৬.১% এবং এসএফএসএন-এর জরিপ অনুসারে তা পরবর্তী বছরে ৩৫%-এ দাঁড়ায়। শিশু অপুষ্টি নির্দেশকের উন্নতি সত্ত্বেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জনস্বাস্থ্য গুরুত্বসীমা অনুসারে এই হার এখনও অনেক বেশি। এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য বহুখাত-ভিত্তিক উদ্যোগ জোরদার করা দরকার।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামোতে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত চারটি নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কৃষিজ জিডিপি-এর প্রবৃদ্ধি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩.১২% থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৫০% এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.৬৫% এ উন্নীত হয়। পরিবীক্ষণকালীন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও সামাজিক নিরাপত্তায় জিডিপি-এর শতকরা হিসেবে সরকারি ব্যয় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.১৯% থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.০৯% নেমে এসেছে যা লক্ষ্যমাত্রার নীচে ছিল। সর্বশেষ পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ-২০১৬ (HIES-২০১৬) অনুসারে দারিদ্র্যের হার গড়ে বার্ষিক প্রায় ১.৭২ শতাংশে হারে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালের ৩২% থেকে ২০১৫ সালে ২৪.৩% এ নেমে এসেছে। ২০১৫ সালে দারিদ্র্যের হার ২৪.৮% নেমে আসার ফলে এমডিজি-এর সুপারিশকৃত (২৯%) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জিত হয়েছে। মজুরী উপার্জনকারীর ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপকের প্রক্সি হিসাবে তিন বছরের চলমান গড়ের ভিত্তিতে চাল-ভিত্তিক জাতীয় মজুরী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের (১২.৮৫%) তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (৮.৫%) হ্রাস পেয়েছে, যা বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার (৫.৩%) ওপরে বজায় ছিল।

জাতীয় খাদ্য নীতির ফলাফল অর্জনে অগ্রগতি

খাদ্য লভ্যতা: বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শস্য খাতের বৃদ্ধির নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত থাকার ফলে বনজ সম্পদ ব্যতীত কৃষিজ জিডিপি ২.৫% অর্জিত হয়, কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কৃষিজ জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬৫% এ দাঁড়ায়। পরিবীক্ষণ সময়ে ৩ বছরের চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে চালের আমদানি নির্ভরশীলতা প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৪.২% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.০% হয়। ভারতীয় চালের আমদানি মূল্য কিছুটা কম থাকায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ১.৩৩ লাখ মে. টন চাল বেসরকারিখাতে আমদানি করা হয়েছে। চালের উৎপাদন স্থিতিহীনতা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৩.০৪%-এর তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৩.০৫% হয়েছে। চালের উৎপাদন ভালো হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে গমের মূল্য কম থাকায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চাল এবং গমের বাজার দরের নিম্নগামিতা পরিলক্ষিত হয়। বিরাজমান বাজার দরে মোট ফুড ভ্যালু সংযোজনের ক্ষেত্রে চালের অংশ ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৮.৭% দাঁড়িয়েছে। এই ক্রমাগত হ্রাসের ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উৎপাদনের বহুমুখীকরণ চলমান আছে এবং বিশেষ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে তা টেকসইভাবে বজায় ছিল।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় হিসেবে কতিপয় সুপারিশ:

- শস্য বহুমুখীকরণে গতিশীলতা ও ধানের উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধি;
- বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন টেকসইকরণ;
- প্রতিযোগিতামূলক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন; এবং
- পরিবেশ রক্ষার্থে বনজ সম্পদের মজুদ গণনায় সহায়তা।

খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ: তিন বছরের চলমান গড়ের ভিত্তিতে মোটা চাল ক্রয় ক্ষমতার বিপরীতে জাতীয় মজুরীর সূচকের পরিবর্তনের হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১২.৮৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮.৫ এ নেমে এসেছে। গত এক দশকে কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী প্রায় চার তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৭৯ টাকা থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩১২ টাকায় উন্নীত হয়েছে। অঞ্চল-ভেদে পার্থক্য থাকলেও আগের দশকের তুলনায় ২০০০ ও ২০১৬ সালের মধ্যে আয়-দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি এবং সন্তোষজনক দারিদ্র্য হ্রাসের হারের সঙ্গে আয়-বৈষম্য হ্রাসে যৌক্তিক যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়নি।

জানুয়ারি ২০১৩ মাসে সকল মূল্যস্ফীতি পুনরায় একই বিন্দুতে মিলিত হয় এবং তখন থেকেই ডিসেম্বর ২০১৪ মাস পর্যন্ত দুই বছরে পুনরায় একই পর্যায়ে আসার আগ পর্যন্ত খাদ্য-মূল্যস্ফীতি সাধারণ-মূল্যস্ফীতির উপরে ছিল এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত খাদ্য, খাদ্য বহির্ভূত এবং সাধারণ মূল্যস্ফীতি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ছিল। জানুয়ারি, ২০১৫ মাস থেকে আগস্ট, ২০১৫ মাস পর্যন্ত খাদ্য, খাদ্য বহির্ভূত এবং সাধারণ মূল্যস্ফীতি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল অবস্থায় ৬%-এর সামান্য উপরে ছিল, পরবর্তীতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করে জুন/১৬তে তা ৪.২৩% এ নেমে অঅসে এবং একই সময়ে ডিসেম্বর/১৭ তে খাদ্য মূল্যস্ফিত বৃদ্ধি পেয়ে ৭.১৩% দাঁড়ায়।

এক্ষেত্রে পরবর্তী কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- আয় বৈষম্য হ্রাসকরণ;
- গ্রামীণ কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ
- জনসাধারণের জন্য খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;
- মৌসুমি ও জরুরী প্রয়োজন মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম সমপ্রসারণ, এবং
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ ।

খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহার: বিগত ২০১৪-১৫ সময়ে শস্য থেকে খাদ্য-শক্তি সরবরাহ ও গ্রহণ কিছুটা ধীর গতিতে হ্রাস পেয়েছে, যা সুপারিশকৃত লক্ষ্যমাত্রার ৬০% এর উপরে থাকে। মহিলাদের দীর্ঘমেয়াদী শক্তি ঘাটতির হার শরীর ভর-সূচক (বিএমআই<১৮.৫) ভিত্তিতে chronic energy deficiency (সিইডি) ২০১১ সালের ৩৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩ সালে ১৯% হয়, যা জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। অপরদিকে, ওজনাধ্যিকের হার (বিএমআই>২৩.০) বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৩৯% ছিল এবং ২০১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪১%-এ দাঁড়ায়। ৬ মাস থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য হার ২০১১ সালের ২১% থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ২৩% এ উন্নীত হয়েছে। যদিও এই হারে অগ্রগতির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী শিশু-খাদ্য গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬ সালের মধ্যে ৫২% অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি। আয়োডিন-যুক্ত লবণ গ্রহণের হার ২০১১ সালের ৮২% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ৮১% এ নেমে এসেছে। আয়োডিন-যুক্ত লবণের মান এবং পর্যাপ্ত আয়োডিন লবণের প্রাপ্যতা এখনও একটি উদ্বেগের বিষয়। সাম্প্রতিক বছরে আয়রনের স্বল্পতাজনিত রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কিছুটা উন্নত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য ও পানি, দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, অনিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ এবং খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী খর্বতার হার হ্রাসকরণ;
- খাদ্যভিত্তিক কর্মসুচির কৌশলের মাধ্যমে অণুপুষ্টির ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ;
- ২য় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কার্যালয় পুনর্গঠন ;
- পুষ্টি সংবেদনশীল কার্যক্রম এবং পুষ্টি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন;
- খাদ্যভিত্তিক ব্যবস্থাতে নীতি সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- খাদ্য বৈচিত্র্য এবং পুষ্টি নিশ্চিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- শিশুদের খাদ্য সেবনসহ জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- অসংক্রামক রোগের নিবারণ এবং নিয়ন্ত্রণ;
- নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- শিশু অপুষ্টি দূরীকরণে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশনকে অগ্রাধিকার প্রদান; এবং
- জাতীয় পুষ্টি জরিপ পরিচালনা করে উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন।

ফলাফল পরিবীক্ষণ: রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং খাদ্য নীতির কর্ম-পরিকল্পনার হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রসমূহ

গবেষণা এবং সম্প্রসারণ: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিশেষ করে ধান, গম, আলু এবং শাক-সবজির নতুন জাতের (ভ্যারাইটি) অবমুক্ত-করণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কর্তৃক কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে অ-প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের (১.৫৮ মিলিয়ন) তুলনায় হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (১.৫৫ মিলিয়ন) হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আট লক্ষাধিক (৮,০০,০০০) কৃষক আধুনিক কৃষি সংক্রান্ত কলাকৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। মোট ফসলী জমির মধ্যে ধান ফসলের আওতায় জমির পরিমাণ গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৭৩.৭%-এর তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ( ) এ দাঁড়িয়েছে। আউশ ও বোরো ধানের আবাদাধীন জমি হ্রাসের ফলে ধানের উৎপাদন ২.৪% হ্রাস পেয়েছে। ভুট্টা, গম, আলু, ডাল, কুমড়া, শিম এবং ভোজ্য তৈল বীজের উৎপাদন বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শস্য ও কৃষি বহুমুখীকরণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- চাহিদাভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ;
- পুষ্টি উন্নয়নে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজের আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা;
- মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত কারণে অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উন্নয়নে অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ।

পানি ব্যবস্থাপনা ও সেচ: সরকারের নানামুখী উদ্যোগের (শক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, সেচ নালা নির্মাণ, পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুষ্ককরণ কৌশল চালুকরণ, অচল হয়ে যাওয়া গভীর নলকূপ মেরামত, সেচ খাল পুনঃখনন, রাবার ড্যাম নির্মাণ, বিএডিসি কর্তৃক ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ইত্যাদির) ফলে সেচের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। উত্তরাঞ্চলে ২০১৬ সালে ভূ-গর্ভস্থ পানির তলের গভীরতা ছিল ৭.৩ মিটার, যা ২০১৭ সালে ৮.৫৮ মিটারে দাঁড়িয়েছে। বোরো ধানের উৎপাদন ব্যয়ে সেচের খরচ দ্বিতীয় বছরের মতো হ্রাস পেয়েছে।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- সেচ কার্যে ভূ- উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- উপকূলীয় অঞ্চলের পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেজ (এনডব্লিউআরডি) হালনাগাদকরণ ;
- নদীর গতিপথ ও পানি-প্রবাহ অব্যাহত রাখতে কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- হাওর এবং জলাভূমির সার্বিক ও টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।

উপকরণ ও মাটির উর্বরতা: কৃষি-তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তায় ভুট্টা, আলু ও শাক-সবজির বীজসহ অন্যান্য ফসলের উন্নতমানের বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভুট্টার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বীজ সরবরাহের তুলনায় ২৭.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বীজ সরবরাহ ৯২.২% হয়েছে। তিন বছরের গড় শস্য উৎপাদনের ভিত্তিতে ধান, ,গম এবং আলুতে বেশি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেগুন, মিষ্টি কুমড়া ও শিম ও লালশাকে কম উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি-ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২০৯.৯৯ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ৩৩.৫৩ বিলিয়ন টাকা বেশি ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সারের দাম অপরিবর্তিত ছিল।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- খামার পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
- আইপিএম (IPM) এর মাধ্যমে শস্যের রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;
- যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিনিয়োগের জন্য ঋণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- উচ্চ-ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ।

মৎস্য চাষ ও জলজ কৃষি: কৃষিজ জিডিপি-তে (বনজ-উপখাত ব্যতীত) মৎস্য খাতের অবদান ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ০.৭৮% বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৭.৪৯% উন্নীত হয়েছে। এই ধারা ২০০৯-১০ অর্থবছরে শুরু হয়ে গত ৬ বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। সে সময়ে জিডিপি-তে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ২২.৫%। এই ধারায় মৎস্য খাতের কাঠামোগত পরিবর্তন (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ থেকে অভ্যন্তরীণ চাষে) এনেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ৬.৬৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ির উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাছের পোনা উৎপাদন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আগের বছরের তুলনায় ১১ হাজার মে.টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরের পরে নতুন তিনটি মাছের জাত অবমুক্তির পরে আর কোন জাত অবমুক্ত না হলেও বিএফআরআই গবেষণার মাধ্যমে চার ধরণের উচ্চ-ফলনশীল জাতের দেশীয় উন্নত রুই, রাজপুঁটি, কৈ ও সুপার গিফট তেলাপিয়া মাছের-পোনা উন্নয়ন করেছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে পরিমাণ ও মূল্যের দিক থেকে মৎস্য-খাতের রপ্তানি নিম্নমুখী, তবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬৮.৩০ হাজার মে টন মাছ রপ্তানি করে ৪২৮৮ কোটি টাকা রপ্তানি আয় করেছে ।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- প্রধান প্রধান মাছের উন্নত জাতের পোনা সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য-পুষ্টি নিরাপত্তায় ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভিটামিন-এ ঘাটতি পূরণ;
- সামুদ্রিক মাছের সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন;

- প্রজননের মাধ্যমে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ;
- মাছের অভয়ারণ্য বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্রের সুরক্ষা বৃদ্ধিকরণ;
- মৎস্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- মৎস্য চাষে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সার্বিক কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১২.২৪%, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৫-১৬) তুলনায় ০.০৭% বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে ৩.৩১ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা ফসলের ক্ষেত্রে ১.৯% এবং মৎস্যের ক্ষেত্রে ৬.২৩%। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাংসের উৎপাদন পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তুলনায়১৬% বৃদ্ধি পায়।২০১৬-১৭ অর্থবছরে দুগ্ধ উৎপাদন ৯.২৮ মিলিয়ন মে.টন যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২৭.৬৪% বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে ডিমের উৎপাদন ছিল ১৫ মিলিয়ন। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কৃত্রিম প্রজননের বার্ষিক পরিবর্তনের হার ছিল ১.৫৬%, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.২%। অতি-আক্রমণ-সংবেদনশীল এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে হাঁসমুরগির মৃত্যুর হার ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরদ্বয়ে শূন্যে নেমে আসে। এ সময়ে প্রাণিসম্পদের ক্রমাগত বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে প্রাণিসম্পদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৩.৯৫ মিলিয়ন ।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- সম্মুখ এবং পশ্চাৎ যোগসূত্র (backward and forward linkage) শক্তিশালীকরণ;
- প্রাণিসম্পদ পণ্য উন্নয়ন ও এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- চামড়ার গুণগত মান উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ;
- দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- গুণগত মানের জাত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ; এবং
- বিপণন চেইন পাওয়ার নিশ্চয়তা বৃদ্ধিকরণ।

বাজারে প্রবেশের সক্ষমতা ও মূল্য সংযোজন: পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, আলু ও মসুর ডাল ব্যতীত অধিকাংশ কৃষি পণ্যের (মোটা চাল, ডাল, পেঁয়াজ, আলু) খামার-গেট-পর্যায়ের মূল্য ও খুচরা মূল্যের পার্থক্য হ্রাস পেয়েছে। , ,বিগত চার বছরে বিভিন্ন প্রকার ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে সারের মূল্যের তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নতুন উৎপাদন কেন্দ্র, পল্লী বাজার, মহিলা বাজার কেন্দ্র এবং সংগঠন পরিষদ সংস্থা (ইউনিয়ন পরিষদ) কমপ্লেক্স স্থাপনের সংখ্যা ৩৯০টি থেকে কমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৬১টিতে নেমে আসে। কৃষি খাতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মজুরীর পার্থক্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৩৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৪%-এ দাঁড়িয়েছে, যদিও এই ব্যবধান ২০০৭-০৮ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের ৪০%-এর তুলনায় যথেষ্ট কম। ক্ষুদ্র শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৮.৫% প্রবৃদ্ধি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৯.২%-এ উন্নীত হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে (টিভিইটি) ভর্তির সংখ্যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮০ হাজার জনের কাছাকাছি ছিল।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- খামার-গেট এবং খুচরা পর্যায়ের মূল্য ব্যবধান হ্রাসকরণ;
- খাদ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি ও অপচয় হ্রাসকরণ;
- গ্রামীণ পরিবহণ ও বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন;
- কৃষি খাতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মজুরীর পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কৃষি কর্মসংস্থান উৎসাহিত প্রদান;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ; এবং
- কৃষক সংগঠনগুলির দর-কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

এন.এফ.পি এবং সি.আই.পি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চলমান বা নতুন সনাক্তকৃত প্রকল্পে ৬.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত বিনিয়োগ চাহিদা সংযোজিত হয়েছে। যার মধ্যে ২.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট-চাহিদা সম্পন্ন সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত ৫৯টি প্রকল্প পাইপ-লাইন আকারে সবুজ পাতায় অর্থায়ন প্রাপ্তির অপেক্ষাধীন আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২টি নতুন শুরু হওয়া প্রকল্পের বিপরীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অতিরিক্ত অর্থায়ন হয়েছে ১.৪৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সাত বছর সময়ে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে মোট বাজেট বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৭.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে প্রায় ৬৫% (১১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিয়োগের জন্য অর্থের সংস্থান করে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত মোট ৫০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাত বছরে বিনিয়োগের জন্য মোট ১৭.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংস্থানের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৬৫% ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশ ৩৫% দাঁড়ায়। সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে মোট ১৭.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ৬.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ২০১৬-১৭ অর্থবছরের পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- নীতি, কর্মপরিকল্পনা এবং কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- নতুন নীতি এবং সিআইপি বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; এবং
- নীতি বিষয়ক দিক-নির্দেশনা ও নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সরবরাহ শক্তিশালীকরণ।

উন্নত সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা: এন.এফ.পি-পি.ও.এ এবং সি.আই.পি পরিবীক্ষণকালে সরকারি খাদ্য গুদামের কার্যকর ধারণ-ক্ষমতা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১.৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.৮৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ-ক্ষমতার গড় সদ্ব্যবহার ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৭% থেকে ৭৫% উঠা-নামার বিপরীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা আরও কমে ৪৪% এ নেমে আসে। সরকারি অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, আমদানি ও বিভিন্ন খাতে বার্ষিক বিতরণের উপর ধারণ-ক্ষমতার গড় ব্যবহার নির্ভরশীল। ২০১৭ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে মোট সরকারি বোরো সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩.৩৮ লাখ মেট্রিক টন, যা পূর্ববর্তী কয়েক বছরের তুলনায় সবচেয়ে কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যায় যে, সংগ্রহ মৌসুমে চালের পাইকারি দাম মোটামুটি বোরোর উৎপাদন খরচের তুলনায় মোটামুটি উপরে রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও বোরো সংগ্রহ মূল্য একটু বেশি থাকায় লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭% বোরো সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পাইকারি বাজার মূল্য বেশি থাকায় মূলত: আশানুরূপ সরকারিভাবে বোরো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ণি। খোলা বাজারে চাল বিক্রির (ওএমএস) হার দেশে মোট চাল সরবরাহের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট চাল সরবরাহের মাত্র ৩.৬২% ছিল। ওএমএস-খাতে বিক্রির পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সরবরাহের ক্ষুদ্র অংশ হলেও বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে এর ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যায় না।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- সরকারি খাতে মানসম্পন্ন খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ ত্বরান্বিতকরণ;
- সরকারি সংগ্রহ কর্মসূচির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য মজুদ পরিবীক্ষণ উন্নতকরণ;
- কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং খাদ্য তথ্য-ব্যবস্থা প্রণয়ন; এবং
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর সাথে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা (PFDS)-এর সমন্বয় সাধন।

কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে (এসএসএন) জিডিপি-এর শতাংশ হিসাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরের জিডিপি-এর ১.৯৫% থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.৫৬%-এ নেমে এসেছে। বর্তমান মূল্যে সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বাজেট অবশ্য বেড়েছে; ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩০৫.৮ বিলিয়ন টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী-খাতে বরাদ্দ ছিল মোট সরকারি বাজেটের ১২.২%, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯.৬% এ নেমে এসেছে। , , ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) খাতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৬৪.৭ লাখ জনেই অপরিবর্তিত রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত সময়ে বড় ধরণের কোন মৌসুমি বিপর্যয়,

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মূল্য বৃদ্ধি না হওয়ায় ভিজিএফ-এর অধীনে বিতরণ হ্রাস পেয়েছে। ভিজিডি-খাতে বিতরণ জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনার ভিত্তি-বছর ২০০৭-০৮-এর ৮৮.৩ লাখ জন-মাস থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২০ লাখ জন-মাসে উন্নীত হয়েছে এবং ভিজিডি খাতের উপকারভোগীর সংখ্যা পুর্ববর্তি তিন বছরে অপরিবর্তিত থাকলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিজিএফ ও বিনামূল্যে প্রদত্ত রিলিফ (জিআর) খাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪.২৮ লাখ মেট্রিক টন থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩.৯১ লাখ মে.টন হয়েচে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে দরিদ্রদের জন্য কর্ম-সৃজন (ইজিপিপি)-এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪.৪ লাখ জন এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও তা অপরিবর্তিত রয়েছে, যা সিআইপি-এর ভিত্তি-বছর ২০০৯-১০-এর তুলনায় সামান্য কম।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের সঙ্গে নগদ এবং খাদ্য-ভিত্তিক কর্মসূচির সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ;
- বাজার-তাড়িত উদ্যোগসহ ক্ষুদ্র/মাঝারি শিল্প সম্প্রসারণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; এবং
- পুষ্টি সমন্বিত খাদ্য-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ।

কমিউনিটি বা সম্প্রদায়-ভিত্তিক পুষ্টি: বাংলাদেশ জন-তাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্য জরিপ (বিডিএইচএস)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী নবজাতককে শুধুমাত্র মাতৃ-দুগ্ধ খাওয়ানোর হার ১৯৯৩ সালের ৪৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৬৪%-এ উন্নীত হয়েছিল, যা ২০১৩ সালে হ্রাস পেয়ে ৫৯.৭% হয় এবং ২০১৪ সালে আরও হ্রাস পেয়ে ৫৫.৩%এ নেমে আসে, তবে ইউইএসডি ২০১৬ রিপোর্ট অনুযায়ী এ হার বেড়ে ৬০% এ উন্নীত হয়েছে। বসত-বাড়িতে বাগান এবং হাঁস-মুরগীর খামার রয়েছে এমন দরিদ্র পরিবারের হার ২০১১ সালের ৪২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৪৯%-এ উন্নীত হয়। সুপারিশকৃত পর্যায়ের তুলনায় এ হার কম হলেও খাদ্যে মোট খাদ্য শক্তি সরবরাহে প্রাণিজ খাদ্য থেকে প্রাপ্ত আমিষ ও চর্বির পরিমাণ ২০০৮ সাল থেকে ২০১৩ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর বৈশ্বিক তীব্র অপুষ্টির হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১৪.৩% হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০%-এ নেমে এসেছে। একই সময়ে অতি-অপুষ্টির হার ৩.১% থেকে হ্রাস পেয়ে ২%-এ নেমে এসেছে। এসএফএসএন ২০১৫ অনুযায়ী, সম্পদের স্তর-বিবেচনায় সব-থেকে দরিদ্রদের ১৫% এবং সব-থেকে ধনীদের ক্ষেত্রে ৬% তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। বিভিন্ন সাব-গ্রুপে গর্ভবতী মহিলাদের সেবার (এএনসি) পরিধি ২০০৭ সাল থেকে ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৫ সালে তা কিছুটা কমে এসেছে। যদিও স্থান ভেদে এই হারের কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য মায়েদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য ও এএনসি সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে হতে পারে।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- ঢাকা শহরের বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণের উপর জোরদারকরণ;
- দেশব্যাপী দুগ্ধপোষ্য ও কম বয়সী শিশু-খাদ্যের কর্মসূচি (IYCF Programme) প্রচার বৃদ্ধিকরণ;
- মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতে পুষ্টি সংবেদনশীল কৌশল সম্প্রসারণ, বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়ন জোরদারকরণ;
- সেবা-দানকারীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সহযোগিতা প্রদান;
- খাদ্যে পুষ্টি-সমৃদ্ধকরণের উদ্যোগ জোরদারকরণ;
- পুষ্টি বিষয়ক এক দশকের কর্মকান্ডে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ;
- দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনের ঘোষণা এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ; এবং
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিসমূহের সংকলন ও হালনাগাদকরণ।

উন্নত পুষ্টির জন্য তথ্য: ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিসিসি (behavioural change communication) কর্মকান্ডের সংখ্যা ছিল ৮০০; যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০০০-এর উপরে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিগত নিরাপত্তা কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) এর তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) পরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদকৃত

পুষ্টি মডিউল মাঠ পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছে। সম্পদের স্তর বিবেচনায় দেখা যায় যে, সব-থেকে ধনীদের মধ্যে ৫৮% শিশু ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করেছে এবং সব-থেকে দরিদ্রদের মধ্যে ২৩% প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করছে। উন্নত অনুশীলন পরীক্ষা (Trial and Improved Practices-TIPS) পদ্ধতির মাধ্যমে ৩৫টি উন্নত পরিপূরক খাদ্যের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ফুড কম্পোজিশন তথ্যভান্ডার (এফসিডিবি) এবং ফুড কম্পোজিশন সারণী (এফসিটি)-এর সরলীকরণ করা হয়েছে, যা ব্যবহারের জন্য প্রকাশিত হয়েছে এবং তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চালু রয়েছে। জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা শীর্ষক পুস্তিকাটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে তার প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ে নতুন সেক্টরাল পরিকল্পনা HNPSIP (২০১৬-২০২১) বাস্তবায়ন;
- বিসিসি-র ব্যবধান (gap) কমাতে কার্যকর কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন;
- খাদ্যের পুষ্টিমানের সারণী এবং খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থায় বিরাজমান বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন; এবং
- পুষ্টির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং সমন্বয়ের উৎকর্ষ সাধন।

নিরাপদ ও গুণগত মানের খাদ্য: খাদ্য-পণ্যের মান প্রমিতকরণের ক্ষেত্রে সামান্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে বাধ্যতামূলক প্রমিত-মানসম্পন্ন শিল্প-জাত খাদ্য সামগ্রীর সংখ্যা ৫৯-এ স্থির রয়েছে। এসএফএসএন-এর প্রতিবেদন মতে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুর ডায়রিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবের হার ২০১৪ সালের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ৮%-এ নেমে এসেছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল নাগরিক নিরাপদ পানি সরবরাহ পাচ্ছে; বাসায় ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহের হার ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৯৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯৯% উন্নীত হয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অপরিবর্তিত রয়েছে। বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা এখনও পূরণ হয়নি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহের হার ছিল ৮৭% এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮% এ উন্নীত হয়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারণ একটি যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) গঠিত হয়েছে এবং একটি পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির জন্য সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্তঃ-মন্ত্রণালয় এবং আন্তঃ-সংস্থা সহযোগিতা জোরদার করার জন্য তাঁরা কাজ করে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের সুপারিশমালা:

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১) ও এর পথ নকশার যথাযথ বাস্তবায়ন;
- নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধি ও প্রবিধানমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ;
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রচারণামূলক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ ও তা অব্যাহত রাখা;
- বাজারে সরবরাহকৃত খাদ্যের নিরাপদ মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডায়রিয়ার প্রকোপ হ্রাসকরণ; এবং
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য-শৃঙ্খলের সকল স্তরের সামর্থ্য (capacity) শক্তিশালীকরণ।

সিআইপি ২০১৬ আর্থিক যোগান পরিবীক্ষণ: বিগত ২০১৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের চাহিদা ছিল ১৭.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ১১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন সম্পন্ন সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত ৪৫৮টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয় এবং ৬.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদা সম্পন্ন সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত ৫৯টি প্রকল্প পাইপ-লাইন আকারে সবুজ পাতায় অর্থায়ন প্রাপ্তির অপেক্ষাধীন ছিল। এক্ষেত্রে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নের হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%।

২০১০ সালের জুলাই থেকে শুরু করে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সাত বছর সময়ে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে মোট বাজেট বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৭.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৬৫% (১১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) অর্থায়ন সম্পন্ন করে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত ৫০৬ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নের হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%। অবশিষ্ট ৬.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ চাহিদা সম্পন্ন ২১০টি প্রকল্প চলমান অথবা অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন (৫৯টি পাইপ-লাইন প্রকল্প) পর্যায়ে রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি আঙ্গিক, যথা - খাদ্য লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাজেট বিভাজনের হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬.২%, ৫০.০৫% এবং ৩.৭৫%। এক্ষেত্রে ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাজেট উক্ত বিভাজন ছিল যথাক্রমে ৫৬.৮%, ৪০.৭% এবং ২.৫%। উল্লেখ্য, সিআইপি-এর ভিত্তি বছরে আঙ্গিক-ওয়ারী প্রত্যাশিত বাজেট বিভাজন ছিল যথাক্রমে ৪৬.৬%, ৫০.৬% ও ২.৮%। বর্তমান ও ভিত্তি-বছরের আঙ্গিক-ওয়ারী বাজেট বিভাজনে পার্থক্য নির্দেশ করে যে, খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে প্রত্যাশিত অগ্রাধিকার বাস্তব ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত হয়নি, বিশেষত: পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত 'খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহার'-এর ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

সর্বশেষ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম থেকে শিক্ষণীয়: জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনার (এন.এফ.পি-পি.ও.এ) অধীন পরিকল্পিত হস্তক্ষেপ অনুধাবন ও বাস্তবায়নের জন্য সিআইপি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এটি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বর্ধিত বরাদ্দ যোগানে সফল হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নীতির কর্ম-পরিকল্পনা এবং সি.আই.পি-এর পরিবীক্ষণ অবকাঠামোগুলো সফলভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়েছে, পর্যাপ্ত কভারেজ ও সামঞ্জস্যতা এনে তাদের 'বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন' যৌথ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরিচালনা ও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ক্রমবিকাশের চিত্রাবলী তুলে ধরা ছাড়াও এতদসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণের 'সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার' গড়ে তোলা হয়েছে, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারসহ বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ ও অংশীজনদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)-এর আওতায় চারটি বিষয়-ভিত্তিক কারিগরি দলের (থিমেটিক টিম) সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন আইএমইডি-এর 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন'-এ প্রকাশিত উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত চূড়ান্ত তথ্যাদি এই প্রতিবেদনে সংযোজন করত: সকল উৎস থেকে বছরব্যাপী প্রাপ্ত উপাত্ত ও ফলাফলসমূহ সার্বিকভাবে যাচাইকরণের পথকে উন্নত ও সুগম করা হয়েছে।

১. সূচনা (Introduction)

নীতি কাঠামো (The policy framework)

জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফ.পি.এম.সি)-এর অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এটি খাদ্য নিরাপত্তার সকল মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। যার মধ্যে রয়েছে একজন মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা; যা সে তার নিয়মিত খাদ্যাভ্যাস থেকে পূরণ করে এবং জৈবিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে তা যেন সহজলভ্য হয়। এগুলো নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় খাদ্য নীতি (এন.এফ.পি)-এর অন্যতম তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে;

-জাতীয় খাদ্য নীতি উদ্দেশ্য ১: নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত এবং স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করা;

-জাতীয় খাদ্য নীতি উদ্দেশ্য ২: জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা; এবং

-জাতীয় খাদ্য নীতি উদ্দেশ্য ৩: সকলের জন্য বিশেষত: নারী ও শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা।

জাতীয় খাদ্য নীতির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে দেশে সকল সময়ে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। জাতীয় খাদ্য নীতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ-কল্পে ২৬টি কৌশলগত হস্তক্ষেপযোগ্য ক্ষেত্র (এওআই)-এর মাধ্যমে প্রয়োগের সুযোগ রেখে ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নকল্পে খাদ্য-নীতি বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫) অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য-নীতির কর্ম-পরিকল্পনা (এন.এফ.পি-পি.ও.এ)-তে দায়িত্বপ্রাপ্ত সত্ত্বা (সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে), প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপের লক্ষ্য এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের কার্যকর অগ্রগতি পরিমাপের নির্দেশকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দলিল আন্তঃ-মন্ত্রণালয় সমন্বয়, খাত-ভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নে জন্য নানাবিধ নির্দেশনা প্রদান করে। এন.এফ.পি-পি.ও.এ-এর সাথে সঙ্গতি রেখে গৃহীতব্য কর্মসূচিসমূহের আর্থিক বিনিয়োগের চাহিদা মেটানোর জন্য ২০১০ সালে প্রণীত 'রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সি.আই.পি)' কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিতে বিনিয়োগের একটি রোডম্যাপ। সি.আই.পি একটি পাঁচ বছর মেয়াদী সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা, যা ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল। এটি খাদ্য নীতির ৩টি উদ্দেশ্য অর্জনে ১২টি কর্মসূচি ও ৪০টি উপ-কর্মসূচি নিয়ে গঠিত। এটি একটি দেশীয় নেতৃত্বে করা পরিকল্পনা, যা সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং সম্পদ একত্রীকরণে হাতিয়ার হিসেবে পরিচিত। এটি টেকসই উপায়ে বৈচিত্র্যময় খাদ্যের লভ্যতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে কার্যকর সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

২০১০ সালে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সি.আই.পি)- দলিলের প্রথম খসড়াটি প্রণয়নপূর্বক ২৬-২৭ মে ২০১০ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ সম্মেলনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচিত হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে সরকার, সুশীল সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীসহ প্রধান প্রধান অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করে এটি আরও উন্নত করে ২০১১ সালের জুন মাসে চূড়ান্ত দলিল হিসাবে প্রকাশ করা হয়। শুরু থেকেই সি.আই.পি একটি বিকাশমান দলিল। যদিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উপ-কর্মসূচির গঠন অপরিবর্তিত রয়েছে, এতে সন্নিবেশিত বিভিন্ন প্রকল্পের সংখ্যা এবং তদসংশ্লিষ্ট আর্থিক সম্পদের পরিমাণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সি.আই.পি দলিলে বিধৃত ফলাফল কাঠামোর বিপরীতে এবং পরবর্তীকালে উত্থিত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পর্যবেক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিশ্লেষণ ও বিনিয়োগ বাজেট হালনাগাদ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচি এবং আর্থিক অবকাঠামোতে সি.আই.পি-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন: (১) জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনায় বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ, (২) ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫ ও ২০১৬-২০) দলিল প্রণয়ন, (৩) সরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের বাজেট থেকে সম্পদ বণ্টন বৃদ্ধিকল্পেও একটি পরামর্শমূলক ও আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে এটি বিবেচিত হয়। সি.আই.পি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য বর্ধিত বরাদ্দ প্রচারে অত্যন্ত সফল হয়েছে।

পরিবীক্ষণ অনুশীলন পরিচিতি (Introducing the monitoring exercise)

কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নীতি নির্ধারকগণকে জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও খাত-ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত সাফল্য পরিমাপ এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সক্ষম করে তোলে। জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা এবং সি.আই.পি-এর পরিবীক্ষণ অবকাঠামোগুলো ২০১২ সালে সফলভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়েছে যাতে বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের মাধ্যম পর্যাপ্ত কভারেজ ও সামঞ্জস্যতা এবং সঠিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তুলে ধরা সম্ভবপর হয়। আজ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ৬টি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যা খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ক্রমবিকাশের চিত্র এবং তদসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণের সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার হিসেবে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও অংশীজনদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

২০১৮ সালে প্রণীত এই পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনটিতে প্রাথমিকভাবে ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়কালের প্রকৃত আর্থিক বিনিয়োগসহ ২০১৭ সালে খাদ্য নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের অগ্রগতি ও নীতি উন্নয়নের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি এই সিরিজের সর্বশেষ প্রতিবেদন, কারণ ২০১৮ সালেই দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হবে এবং নতুন নির্দেশক এবং ভিত্তি তথ্য নিয়ে নতুন আঙ্গিকে জাতীয় খাদ্যনীতি কর্মপরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করা হবে। এই মনিটরিং রিপোর্টে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ধারাবাহিক তথ্যের সংরক্ষণ এবং ২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত অগ্রগতি তুলে ধরেছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির বিভিন্ন আঙ্গিকের জ্ঞানের সঞ্চয়ন ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটি ভবিষ্যতে 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়নে বিভিন্নভাবে সহায়তা করবে।

এই প্রতিবেদন সম্পর্কে

২০১৬-১৭ অর্থবছরের (পরিবীক্ষণ বছর) নির্বাচিত লক্ষ্যের নির্দেশক, ফলাফল এবং প্রাপ্তি; পূর্ববর্তী দুই বছরের তথ্য, সি.আই.পির ভিত্তি-বছর (২০০৯-১০) এবং জাতীয় খাদ্য নীতি'র কর্মপরিকল্পনা ভিত্তি-বছর (২০০৭-০৮)-এর তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। খাদ্য নীতি বাস্তবায়নে বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, ১ জুলাই ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত (৩০ জুন ২০১৭) আর্থিক বিনিয়োগের তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনা এবং সি.আই.পি বাস্তবায়নের পদ্ধতি একসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহারের অগ্রগতি বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সি.আই.পির ১২টি কর্মসূচি কিভাবে খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহারের অবদান রেখেছে তা বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ নীতি এবং খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে অর্জিত সাফল্য চিহ্নিতকরণসহ উন্নয়ন নীতি/কর্মসূচি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় সরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে সার্বিক বিশ্লেষণের আলোকে অর্জিত অগ্রগতি এবং পরামর্শসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টাংশে পরিবীক্ষণ নির্দেশক, বিষয়-ভিত্তিক কারিগরি দলসমূহের গঠন এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট উপাত্তসমূহ (৩০শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত) বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (Approach to monitoring)

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অবকাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, চার স্তর-বিশিষ্ট ফলাফল-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্যকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় রেখে তা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল (২য় পর্যায়ে) একীভূত করা হয়েছে, যার উৎপত্তি (৩য় পর্যায়ে) আউটপুট থেকে এবং যা সাধারণত ইনপুট (৪র্থ পর্যায়ে) থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। নিচে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং লেখচিত্র-১ এ তা দেখানো হয়েছে ।

১. খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা জাতীয় খাদ্য নীতিতে সর্বোচ্চ পরিবীক্ষণ পর্যায়ে অবদান রাখে। জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম সঙ্গতিপূর্ণ। এটির লক্ষ্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামোর লক্ষ্যমাত্রার সাথে অত্যন্ত ব্যাপক, যার ফলে শুধুমাত্র কর্মপরিকল্পনা এবং সিআইপি এর অবদানই সাফল্য হিসেবে-ধরা ঠিক হবে না; তবে এগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২. জাতীয় খাদ্য নীতির তিনটি উদ্দেশ্য যথাঃ খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং খাদ্যের সদ্ব্যবহারের সাথে এই ফলাফল সংগতিপূর্ণ। ফলাফল নির্দেশক নির্ধারণ একটি জটিল কাজ, কারণ সেগুলো সহজেই কোন একক সংস্থার সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়না । একই ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করে তাদের পরিবীক্ষণ করা হয় বিধায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং জাতীয় খাদ্য নীতির বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার অভিন্ন ফলাফল আশা করা যায়।

৩. অর্জিত ফলাফল মধ্যমেয়াদী উন্নয়নের নির্দেশক। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার সামগ্রিক অর্জন ১২টি কর্মসূচি (আউটপুট), ৪০টি উপকর্মসূচি সাথে পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত। জাতীয় খাদ্য নীতির বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনায় ২৬টি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে (এওআই), ফলাফল নির্ধারকগুলো বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রভাবে বহুলাংশে প্রভাবিত হতে পারে।

৪. রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিনিয়োগ যোগান আসে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্থায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপ থেকে। কর্মপরিকল্পনার ইনপুট বহুমুখী, কর্মসূচির জন্য প্রায় ৩০০ ধরনের কর্মপন্থা, নীতি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা এখানে জড়িত রয়েছে। উভয় ধরনের ইনপুটই এই প্রতিবেদনে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

লেখচিত্র- ১: রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) ও খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা (পিওএ)এর যৌথ পরিবীক্ষণের পর্যায়সমূহ পর্যায়সমূহ

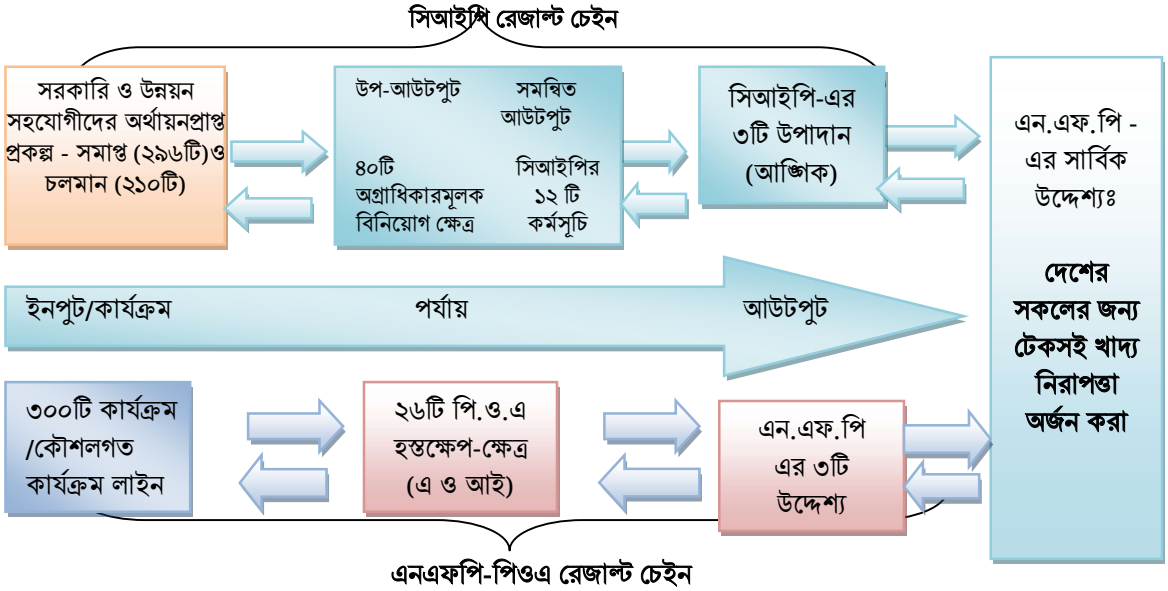

উপরোক্ত কাঠামোর প্রত্যেক পর্যায়ের পরিবীক্ষণ নির্দেশকসমূহ তথ্য প্রাপ্তি এবং স্মার্ট [SMART=Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timebound]- ভাবে নির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জন-যোগ্য, সম্পৃক্ত/সংশ্লিষ্ট এবং সময়োপযোগী মানদণ্ডের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা, ভিত্তি এবং প্রক্সি-নির্দেশকসমূহ প্রদান করে।

লক্ষ্য পরিবীক্ষণ (Goal Monitoring)

সকল সময়ে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্ম-পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার লক্ষ্য। জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত পরিমার্জিত ও সরলীকৃত নির্দেশকসমূহ অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য সি.আই.পি'তে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অধিকন্তু, লক্ষ্যমুখী অগ্রগতি পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামোর সংশ্লিষ্ট নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে।

ফলাফল পরিবীক্ষণ (Outcome Monitoring)

জাতীয় খাদ্য নীতির বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (পিওএ) এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) দলিল-দ্বয়ের ফলাফল পর্যায় একই ধরণের এবং একই রকমের নির্দেশকের মাধ্যমে অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০১১ সালের সি.আই.পি-এর পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নকালে নির্দেশকগুলো সরলীকরণ করে একই নির্দেশকসমূহ জাতীয় খাদ্য নীতির বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (পিওএ)-এর পরিবীক্ষণ কাঠামোতেও ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে আউটকাম পর্যায়ে নির্দেশকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে (খাদ্যের লভ্যতার জন্য ৪টি এবং খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের জন্য ৫টি করে)। উল্লেখ্য, 'কিশোরী বালিকাদের মধ্যে আয়রন স্বল্পতার প্রাদুর্ভাব' শীর্ষক খাদ্যের সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশকটি ২০১২ সালের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ ও তুলনামূলক তথ্য-উপাত্তের অভাবে ২০১৩ সালের ফলাফল সারণী থেকে তা বাদ দেয়া হয়েছে। তদস্থলে কিশোরী বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে আয়রন-স্বল্পতা সংক্রান্ত মূল-পাঠ্যে মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট ঘাটতি আলোচনা করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টির ওপর খাদ্য নিরাপত্তা প্রভাব বর্ণনাকরত: শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। উপরন্তু, নির্বাচিত ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ খাদ্যের মান এবং খাদ্য পরীক্ষণের ক্ষেত্রসমূহে অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নীতি প্রণয়নের কর্মক্ষমতা নির্ণয়ে সাম্প্রতিক পরিকল্পিত নীতি উন্নয়নমূলক কাজে অধিক প্রতিনিধিত্বকে সাফল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে।

আউটপুট পরিবীক্ষণ (Output Monitoring)

রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা দলিলটি জাতীয় খাদ্য নীতি ও এর কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করেছে। উপরোক্ত দু'টি দলিলের যৌথ পরিবীক্ষণের জন্য এক গুচ্ছ কেন্দ্রীভূত নির্দেশক ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা কর্মপরিকল্পনার পূর্ণ পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূল পাঠ্যে আলোচনা করা হয়েছে। সিআইপি ও জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনার আউটপুট পর্যায়ের প্রস্তাবিত নির্দেশকগুলো নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে;

১) জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অনুশীলনের জন্য ২০১০ সালে ফলাফল পর্যায়ের নির্বাচিত নির্দেশকসমূহকে সরলীকরণের প্রচেষ্টা ;

২) রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার অংশীদারদের সাথে নিয়ে পরামর্শমূলক সভায় প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা; এবং

৩) জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রগুলো পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা, যাতে করে প্রস্তাবিত নির্দেশকসমূহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে সহজে ব্যবহার করা যায়।

বিগত ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে ব্যবহৃত আউটপুট নির্দেশকসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার সকল কর্মসূচির জন্য স্মার্ট (SMART) নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র সিআইপি কর্মসূচি-৭ ব্যতীত অন্যান্য কর্মসূচিগুলো জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপযোগ্য ক্ষেত্রগুলোর সাথে মিল রয়েছে এবং এ জন্য আরও কিছু নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সিআইপি-তে স্বল্প-পরিসরে পরিবীক্ষণ করা হয়। সিআইপি-এর যে কর্মসূচিগুলোর সাথে জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপযোগ্য ক্ষেত্রগুলোর মিল রয়েছে, সেগুলো পরিশিষ্ট ১-এ দেখানো হয়েছে এবং আউটপুট প্রক্সি নির্দেশক রূপে যৌথ পরিবীক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বার্ষিক পরিবীক্ষণ চক্র (সেপ্টেম্বর-এপ্রিল সময়)-এর শুরুতেই বিষয়-ভিত্তিক কারিগরি দলের পরামর্শমূলক সভায় নির্দেশকের তালিকা নিশ্চিতকরণ এবং প্রস্তাবিত পরামর্শ সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সিআইপি কর্মসূচি-১ (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ-১) এ উচ্চ ফলনশীল জাত আবাদের জমির পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের প্রতিবেদনের তুলনায়

২০১৪ সালের প্রতিবেদনে বোরো হাইব্রিড অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধনী আনা হয়েছে। অন্য একটি পরিবর্তন, যেমন সিআইপি কর্মসূচি-৪ (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ-১.৪) এ তিনটি নতুন নির্দেশক (যেমন; নতুন মাছের জাত উন্নয়ন, মোট রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতের হার, মাছের পোনা (ফিঙ্গারলিং) উৎপাদনের বাৎসরিক পরিবর্তন) সংযোজনপূর্বক উক্ত কর্মসূচির পর্যাপ্ত কভারেজ প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সিআইপি ইনপুট পরিবীক্ষণ (CIP input monitoring)

ইনপুট পর্যায়ের পরিবীক্ষণে সিআইপি-এর অর্থায়ন ও বরাদ্দ প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোকপাত করা হয়েছে। যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পগুলোর অর্থায়নের জন্য তালিকা হালনাগাদকরণ;
- সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত অথবা আওতা বহির্ভূত প্রকল্পের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা হালনাগাদকরণ;
- সিআইপি-এর আওতা-ভুক্ত অথবা আওতা-বহির্ভূত প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগীদের চলমান সহায়তা হালনাগাদকৃত অবস্থায় সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অন্তর্ভুক্তিকরণ; এবং
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)- কর্তৃক প্রতি বছর মার্চ মাসে প্রকাশিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ দলিলে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প-সমূহের তথ্যের সাথে সিআইপি-এর আর্থিক উপাত্তের সামঞ্জস্য যাচাইকরণ।

সিআইপি অর্থায়ন সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অংশ মাত্র। তা এই প্রতিবেদনের প্রকল্প, কর্মসূচি এবং উপ-কর্মসূচি পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইনপুট যা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন বাজেটের বার্ষিক বরাদ্দের অংশ মাত্র নির্দেশ করে। এই কারণে এই প্রতিবেদনের ৭.১ অনুচ্ছেদে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নে জাতীয় বাজেটের ব্যয়ের সাম্প্রতিক পরিবর্তন উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সিআইপি হালনাগাদকরণ হয়ে থাকে যা এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট-৩.১ এ সিআইপি-এর ভিত্তি-বছর এবং প্রতি বছরের সংস্করণ বা রিভিশন প্রকাশ করা হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয় (Lessons Learned)

জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনার অধীন পরিকল্পিত হস্তক্ষেপ অনুধাবন ও বাস্তবায়নের জন্য সিআইপি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এটি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বর্ধিত বরাদ্দ চাহিদার প্রচারে অত্যন্ত সফল হয়েছে বলে ধরা হয়। জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনা এবং সিআইপি-এর পরিবীক্ষণ কাঠামোগুলো ২০১২ সালে সফলভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়েছে যাতে যৌথ বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নির্দেশকগুলোর পর্যাপ্ত কভারেজ ও সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত হয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সঠিকভাবে প্রতিবেদনে তুলে ধরা সম্ভব হয়। ২০১০ সাল থেকে বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে যাতে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ক্রম-বিকাশমান চিত্র এবং তদসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ, সমৃদ্ধ তথ্য-ভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছে যা সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও অংশীদারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় যা এই প্রতিবেদনে প্রয়োগ করা হয়েছে:

১) জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অনুশীলনের জন্য ২০১০ সালে ফলাফল পর্যায়ের নির্বাচিত নির্দেশকসমূহকে সরলীকরণের প্রচেষ্টা ;

২) রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার অংশীদারদের সাথে নিয়ে পরামর্শমূলক সভায় প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা; এবং

৩) জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রগুলো পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা, যাতে প্রস্তাবিত নির্দেশকগুলো এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

পরিবীক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (The institutional setting for monitoring)

জাতীয় খাদ্য নীতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা সমন্বয়, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে একটি বহুমাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (চিত্র-২)। মন্ত্রিপরিষদ সমপর্যায়ের একটি উপ-কমিটি যেমন; খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)[২] রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবগণ এই কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন। এই কমিটি খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কৌশলগত-দিক নির্দেশনা প্রদান করে এবং আন্তঃ-খাত সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে সব ধরনের সহায়তা করে থাকে। খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় কমিটিতে[৩] বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিবৃন্দ রয়েছেন। অন্যান্য কাজের পাশাপাশি জাতীয় কমিটি সিআইপি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া দেখাশুনা করে। ফুড পলিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ[৪] কারিগরি ও প্রায়োগিক পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক দলের (টিটি)[৫] মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-১ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অগ্রগতি জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনা এবং সিআইপি-এর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করে থাকে।

লেখচিত্র ২ - প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো

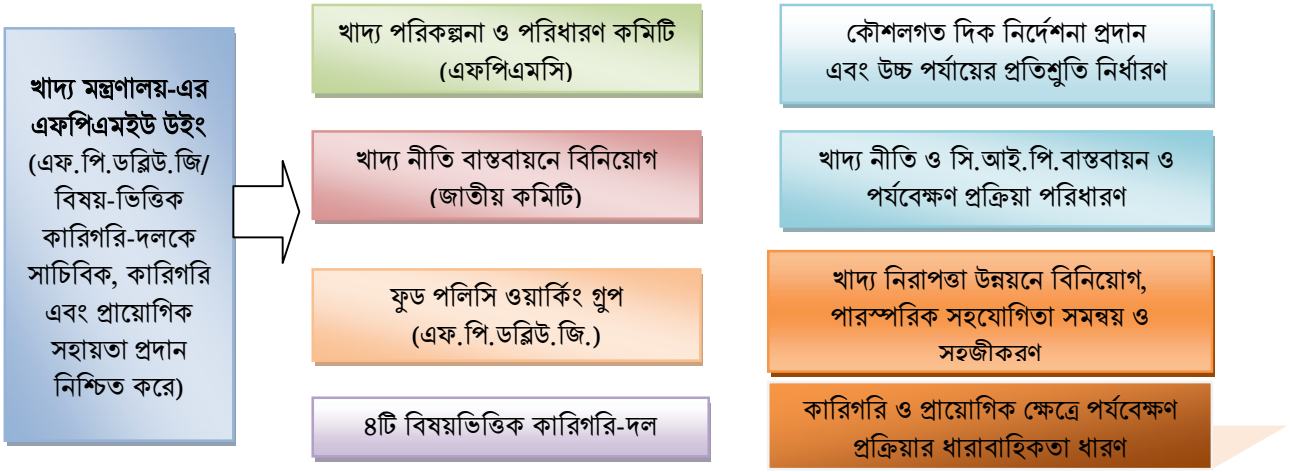

সচিবালয় হিসেবে এফপিএমইউ সার্বক্ষণিকভাবে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে কারিগরি ও নীতি সহযোগিতা দিয়ে থাকে। এছাড়াও সরকারের ৩০ টির বেশী সংস্থা সিআইপি-এর অধীন বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পল্লী উন্নয়নের জন্য গঠিত স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপের অধীন উন্নয়ন সহযোগীসহ সরকারি সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট পরিবীক্ষণ সেকশনে আর্থিক ইনপুট প্রদান করে থাকে।

৩. জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য ভিত্তিক অগ্রগতি ও ফলাফল

৩.১. জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য ক্রমবিকাশ ও উত্তরণ

৩.১.১ জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য

জাতীয় খাদ্য নীতির ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে ''সকল সময়ে সকল জনগণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা''। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বুঝায়- বস্তুগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, যা একজন মানুষের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য খাদ্য গ্রহণ চাহিদা এবং খাদ্য অভিরুচি পূরণ করে থাকে। পারিবারিক পর্যায়ে পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার এই ধারণা (concept) প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরাই প্রাথমিক লক্ষ্য। খাদ্য নিরাপত্তার এই নীতির লক্ষ্য হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত জনগণ, বিশেষ করে নারী ও শিশুর বিশেষ পুষ্টি-চাহিদা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে সকল অঞ্চলের এবং সব বয়সের সকল জনগণের উন্নত পুষ্টিগত ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা জোরদার করা। জাতীয় খাদ্য নীতির ধারণাগত কাঠামো (conceptual framework) ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ, যেমন: খাদ্য উৎপাদন, পরিবারের দারিদ্র্য, সেবা পাওয়ার সুযোগ, জ্ঞান ও তথ্য এবং আচরণ সব মিলিয়ে ব্যক্তি-পর্যায়ে এবং বৃহৎ-পরিসরে সকল জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টিগত ফলাফলকে তুলে ধরে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় খাদ্য নীতি এরূপ নির্দেশনা দেয় যে, এই বিষয়গুলো হঠাৎ অভিঘাত সাপেক্ষে অথবা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় (যেমন- খাদ্য সরবরাহের স্থিতিশীলতার অভাবে) ঘটে থাকে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিকে প্রভাবিত করে থাকে।

সারণী - ১: খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির সাথে সম্পর্কিত এনএফপি এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচকসমূহ

সূচকসমূহ	২০০৭-০৮ (পিওএ ভিত্তিবছর)	২০০৯-১০ (সিআইপি ভিত্তিবছর)	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫	উৎস
অপুষ্টির হার (তিন বছরের গড়)	১৭.০% (সংশোধিত)	১৭.২% (সংশোধিত)	১৬.৪%	তথ্য নেই	১৫.১%	১৭% (এমডিজি-১) 🟢	এফএও, এসওএফআই
শিশুর ওজন স্বল্পতার হার (০-৫৯ মাস)[৬]	৪১% (বিডিএইচএস)	*তথ্য নেই*	*তথ্য নেই*	৩১% (এসএফএস	*তথ্য নেই*	৩৩% (এমডিজি-১)[৭] 🟢	বিডিএইচএস, ইউইএসডি
শিশু খর্বতার হার (০ - ৫৯ মাস)[৮]	৪৩.২% (বিডিএইচএস)	*তথ্য নেই*	*তথ্য নেই*	৩৫% (এসএফএস	*তথ্য নেই*	৩৮%[৯] 🟢	বিডিএইচএস, ইউইএসডি
স্থির মূল্যে কৃষিজ জিডিপি-এর প্রবৃদ্ধি (২০০৫-০৬)[১০]	২.৯৪%	৭.১৩%	৩.১২%	২.৫০%	২.৬৫%	৪.৩% 🟡	বিবিএস কৃষি পরিসংখ্যান এর বর্ষপঞ্জি
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জিডিপি-এর শতকরা হিসেবে সরকারি ব্যয়[১১]	*তথ্য নেই*	২.৪২%	২.০২%	২.১৯%	২.০৯%	৩.০% 🔴	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
মাথাপিছু দারিদ্র্যের সূচক (সিবিএন দারিদ্র্যের উচ্চসীমা)	৪০.১% (২০০৫)	৩১.৫% (২০১০)	*তথ্য নেই*	*তথ্য নেই*	*২৪.৩০%*	২৯% (এমডিজি-১) 🟢	বিবিএস, এইচআইইএস প্রতিবেদন
মোটা চালের কেজি প্রতি ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে জাতীয় মজুরির পরিবর্তন (গড় নচলমা বছরের-৩)	-৮.১১%	৫.৭১%	১১.৩০%	১২.৮৯%	৮.৫০%	৫.৩% (মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি+০.৫) 🟢	বিবিএস পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি (মজুরি) ডিএএম (মূল্য)

রঙিন সূচকগুলো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি নির্দেশ করে

🟢 লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত 🟡 লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পথে 🔴 লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি

জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে তিনটি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। সূচকসমূহ হল- অপুষ্টির প্রকোপ (পিওইউ)[১২], শিশু ওজন-স্বল্পতার হার (বয়স অনুপাতে ওজন কম) এবং শিশুর খর্বতা (বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম)। এ সকল সূচকের নির্বাচন জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সরঞ্জামসমূহের সাথে বিশেষ করে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জাতীয় খাদ্য নীতির মাধ্যমে সরকার এমডিজি'র "ক্ষুধা হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা"-তে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা একই রকম দুইটি সূচকের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়েছে (পিওইউ এবং শিশুর ওজনস্বল্পতা)। বয়সভিত্তিক সূচক দুটিঃ "শিশুর ওজনস্বল্পতা ও শিশুর খর্বতা" পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিগত কল্যাণের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

অপুষ্টির সূচক নির্দেশ করছে যে, ২০১৫ সালের পূর্বেই (তথা এনএফপি-পিওএ-এর ভিত্তি-বছর ২০০৭-০৮ অর্থবছর নাগাদ) এমডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা (১৭%) ভালভাবে অর্জিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ২০০৮ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে কিছুটা অবনতি পরিলক্ষিত হলেও এ লক্ষ্যমাত্রা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (১৬.৪%) পুনরায় অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে আরও উন্নতি (১৫.১%) হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি উন্নয়নে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অসম অগ্রগতির জন্য পুষ্টি হারের অনগ্রসরতাকে দায়ী করা হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সঙ্কটের পর অস্থিতিশীল এবং উর্ধ্বগামী খাদ্য মূল্য জনগণের খাদ্য-ভিত্তিক শক্তি সরবরাহের উপর প্রভাব ফেলেছিল। গরিব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে খাদ্য থেকে পর্যাপ্ত শক্তি আহরণ এবং চলমান অপুষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। আবার বিভিন্ন বিষয় যেমন; নদী ভাঙ্গন, স্থানীয় বন্যা, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে অবস্থার যে অবনতি হয়েছে তা কৃষি উৎপাদন এবং স্থিতিশীলতায় অব্যাহত হুমকি হিসাবে চলমান রয়েছে।

অপুষ্টির বিস্তার তথা পিওইউ (PoU) শুধুমাত্র খাদ্য থেকে প্রাপ্ত শক্তির নিরিখে "অপুষ্টি" অবস্থার আনুমানিক হিসাব করে থাকে। অপুষ্টি ও রুগ্নতা শুধুমাত্র ক্যালরি গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়। তাছাড়া খাদ্য থেকে কম ক্যালরি আহরণের অন্তর্নিহিত কারণ এখনও অজানা রয়েছে।[১৩] এ কারণে পিওইউ-কে একটি অতি দরকারি হাতিয়ার (diagnostic tools) হিসেবে দেখা হয়। এর পাশাপাশি কম খাদ্য-শক্তি গ্রহণের নির্দেশকসমূহকে নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

লেখচিত্র ৩: শিশুদের অপুষ্টি হ্রাসের প্রবণতা

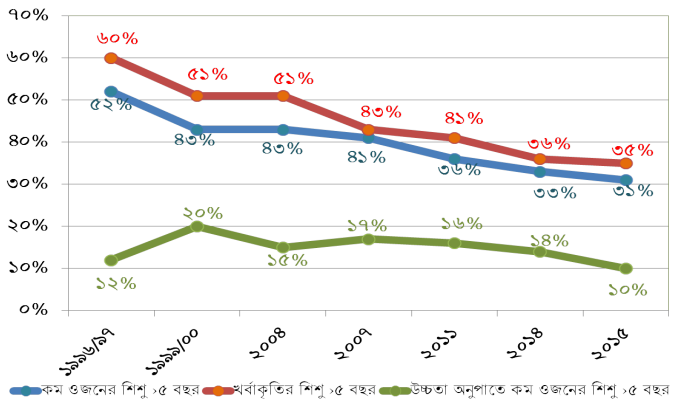

উৎস: বিডিএইচএস ১৯৯৬/৯৭, ১৯৯৯/২০০০, ২০০৪, ২০০৭, ২০১১, ২০১৪ এবং এসএফএসএন ২০১৫

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, কম ওজনের শিশুর সংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রেও এমডিজি-১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) পরিবীক্ষণ সময়ে কম ওজনের শিশুর সংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পরিচালিত ইউইএসডি (Utilization of Essential Service Delivery) জরিপের হিসাব মতে কম ওজনের শিশুর হার ছিল ৩৫.১%। তাছাড়া, বিডিএইচএস জরিপ ২০১৪ অনুসারে কম ওজনের শিশুর হার ৩২.৬% এবং এসএফএসএন জরিপ ২০১৫ অনুসারে এই হার ছিল ৩১%। এখানে এটাই লক্ষণীয় যে, কম ওজনের শিশুর হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে (সারণী-১)।

শিশুদের খর্বতার ক্ষেত্রেও একইরকম হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষণীয়, যা ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ৬০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ৩৬% -এ নেমে এসেছে (লেখচিত্র-৩)। নিরাপদ পানি ও উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উন্নততর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ (hygiene) ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নতিই হচ্ছে শিশুর পুষ্টি উন্নয়নের অন্যতম কারণ।[১৪] এ ক্ষেত্রে গৃহ সম্পদের উন্নয়ন, পিতামাতার শিক্ষা, উন্নত প্রসব-পূর্ব এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি, পাইপ দ্বারা সরবরাহকৃত পানি প্রাপ্তির সুযোগ, জন্ম হার হ্রাস এবং সন্তান জন্মে দীর্ঘ বিরতির ফলে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের সম্পৃক্ততা লক্ষণীয়।[১৫] শিশু অপুষ্টি সূচকের ক্রমাগত উন্নয়ন সত্ত্বেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানদণ্ড অনুসারে এগুলো এখনও তুলনামূলকভাবে বেশি।[১৬] এই লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক পর্যায়ে শস্য-

বহির্ভূত খাদ্যসহ মৌলিক প্রধান খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং তা ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদান, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, অণুপুষ্টির ঘাটতি এবং অপুষ্টির অন্যান্য কারণও এর আওতাধীনে রয়েছে। জীবনচক্রে অপুষ্টির জন্য দায়ী অন্যতম বিষয়সমূহের মধ্যে বাল্য-বিবাহ, কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ এবং জন্মের সময় শিশুর খর্বতার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত।

জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামো (Result Framework)-তে অন্তর্ভুক্ত চারটি সূচক আলোচনা করা হয়েছে (সারণী-১)। দেশে কৃষিজ জিডিপি (Agricultural GDP)-এর প্রবৃদ্ধি বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৪.৩০% থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৫০% এ নেমে আসলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬৫% হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জিডিপি-এর শতকরা হিসাবে সরকারি ব্যয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি-এর ২.০২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.১৯% হলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ২.০৯% হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার (৩%) তুলনায় বেশ কম (সারণী ১)। যদিও এক্ষেত্রে সরকারি বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১৩৮.৪ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৭৫.৫ বিলিয়ন টাকা হয়েছে।

এমডিজি পরিবীক্ষণ সময়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সর্বশেষ পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES-২০১০) অনুসারে দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০% থেকে ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৩১.৫% এ নেমে এসেছিল, যা প্রতিবছর গড়ে ১.৭২ শতাংশ হারে হ্রাসমান ধারা নির্দেশ করে। এমডিজি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মতে ২০১৫ সালের দেশে মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৮% এবং HIES-২০১৬ অনুসারে তা কমে হয়েছে ২৪.৩%; দারিদ্র-সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ৫৮% থেকে ২৯% এ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এমডিজি-সুপারিশকৃত লক্ষ্যমাত্রা ২০১২ সালেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে[১৭] (লেখচিত্র-৪)। তবে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে তারতম্য লক্ষণীয়; ২০১৬ সালে শহরাঞ্চলের (১৮.৯%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (২৬.৪%) এ হার বেশী ছিল। দেশের পূর্বাঞ্চলের বিভাগসমূহে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট) অধিকতর দারিদ্র্য হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে এবং একই ভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেও (বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী) দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর অঞ্চলে ২০১৬ সালে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে[১৮]। ১৯৯১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে শহরে দারিদ্র্য ৪২.৮% থেকে ১৮.৯% হ্রাস পাবার মাধ্যমে এটাই প্রতিফলিত হয় যে, শহরে জনসংখ্যার দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এমডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা ২০১০ সালেই অর্জিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় ২০০০-২০১৬ প্রায় দেড় দশক সময়ে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই সফলতার সাথে দেশের সার্বিক পুষ্টি উন্নয়নে সফলতার চিত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি, বরং কম ওজনের শিশুর হার ও শিশুর খর্বতার প্রকোপ হ্রাসের ক্ষেত্রে কিছুটা ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়েছে[১৯]।

লেখচিত্র-৪: দারিদ্র হ্রাসের হার

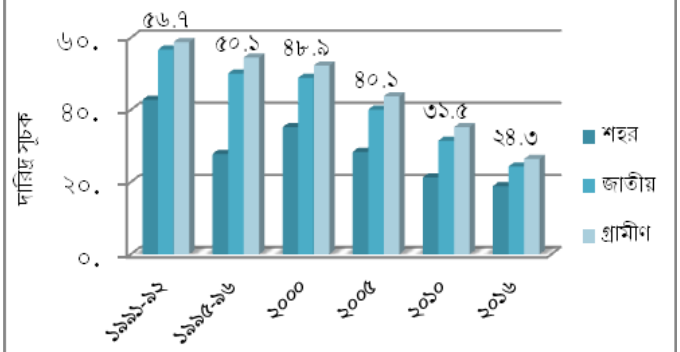

উৎসঃ বিবিএস এইচআইইএস, ১৯৯১-৯২ থেকে ২০১৬

মোটা চালের ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে দৈনিক জাতীয় গড় মজুরীর পরিবর্তন শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতার একটি পরিমাপ হিসাবে পরিগণিত। তিন বছরের চলমান গড়ের ভিত্তিতে এই মজুরী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের (১১.৩০%) তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (১২.৮৫%) কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কমে হয়েছে ৮.৫%। বিগত ২০০৭-০৮ অর্থবছরে চালের বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধির পরে চাল-ভিত্তিক মজুরীতে বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে; পরবর্তীতে চাল-ভিত্তিক মজুরী কিছুটা অস্থিরতার (Fluctuations) মধ্য দিয়ে বাড়তে থাকে, তা ২০১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রার (৫.৩%) উপরে ছিল। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, এ সময়কালে প্রধান খাদ্য-প্রাপ্তির সুযোগে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৩.১.২ জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়নে বিনিয়োগের ক্রমবিকাশ ও উত্তরণ

২০১৫ সাল পরবর্তী কার্যক্রমের ক্রান্তিকাল

২০১৫ সালে এমডিজি'র মেয়াদ শেষ হয় এবং বাংলাদেশে ১ জানুয়ারি ২০১৬ সাল থেকে ১৭ টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG বা এসডিজি)-এর সমন্বয়ে ২০১৫ সাল পরবর্তী কর্মসূচিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ ঘোষণাকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ তার উন্নয়ন কর্মসূচিতে এমডিজি-কে মূলধারায় রেখেছিল, যা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সাম্প্রতিক দশকের উপর ভিত্তি করে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন, ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ উন্নয়নে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণে বাংলাদেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে । ২০৩০ সাল নাগাদ সকল জনগণ, বিশেষত: শিশু-সহ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের ক্ষুধা দূরীকরণ এবং বছরের সকল সময় নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিতকরণে এসডিজি-২ (ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, উন্নত পুষ্টি এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন) প্রাথমিকভাবে বিবেচ্য বিষয়। এসডিজি-২ এর আরও লক্ষ্য হচ্ছে ২০২৫ সাল নাগাদ ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর খর্বতা ও কম ওজনের শিশুর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সকল প্রকার অপুষ্টি দূরীকরণ এবং কিশোরী, গর্ভবতী, প্রসূতি মহিলা ও বয়স্ক মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা। জাতীয় পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬-২০২০ সময়ের জন্য প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি-কে বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সরকারের নেতৃত্বে এসডিজি-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের বৃহত্তর এবং অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব অত্যাবশ্যক। এই লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। তাছাড়াও, নতুন লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে তথ্য ও উপাত্তের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় নীতি ও কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণে বর্ধিত সম্পদ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও যোগাযোগের প্রয়োজন হবে। এসডিজি ২-এর খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নির্বাচিত সূচকসমূহ সারণী-২ তে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সারণী-২: এসডিজি ২ এর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্বাচিত সূচকসমূহ

লক্ষ্যমাত্রা	সূচক
২.১। ২০৩০ সাল নাগাদ সকল জনগণ, বিশেষত শিশুসহ গরিব ও অসহায় মানুষের ক্ষুধা দূরীকরণ এবং সারা বছর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিতকরণ।	২.১.১। অপুষ্টির প্রকোপ
	২.১.২। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা স্কেল (Food Insecurity Experience Scale)-ভিত্তিক পরিমাপ মতে জনগণের মাঝে মৃদু বা মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রকোপ
২.২। ২০২৫ সাল নাগাদ ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর খর্বতা, কম ওজন ও কৃশকায়তা হ্রাসের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলা এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের পুষ্টির চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সাল নাগাদ সকল প্রকার অপুষ্টি দূরীকরণ।	২.২.১। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতার প্রকোপ (বয়সের অনুপাতে উচ্চতা<-২ আদর্শ বিচ্যুতি, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শিশু বৃদ্ধির আদর্শ-মানের মধ্যক দ্বারা পরিমাপিত)।
	২.২.২। ধরণ অনুসারে (কম ওজন এবং অতিরিক্ত ওজনের) ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মাঝে অপুষ্টির প্রকোপ (উচ্চতা অনুসারে ওজন >+২ বা <-২ আদর্শ বিচ্যুতি যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শিশু বৃদ্ধির আদর্শ-মানের মধ্যক দ্বারা পরিমাপিত)।

উৎস: এসডিজি সূচকের উপর ইন্টার-এজেন্সি এবং এক্সপার্ট গ্রুপের প্রতিবেদন (ই/সিএন৩/২০১৬/২/আরইভি-১)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সি.আই.পি-২ এর অবতারণা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নীত হবে মধ্য আয়ের দেশে, আর এজন্য প্রয়োজন বর্ধিত সম্পদ সঞ্চালনের ব্যাপক উদ্যোগ, আমূল প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন এবং উন্নততর সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ। জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা দলিলে বিধৃত অভীষ্ট 'সকল সময়ে দেশের সকল নাগরিকের জন্য নির্ভরযোগ্য ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা' অর্জনে তিনটি উদ্দেশ্য যথা - (১) নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ততা ও নিয়মিত সরবরাহ (২) বর্ধিত ক্রয় ক্ষমতা ও সবার খাদ্য প্রাপ্তির সক্ষমতা এবং (৩) প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) মেয়াদে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে ২০১০ সালে সি.আই.পি ১ প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রাক্কালে একটি 'পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য পদ্ধতি' উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত উপায়ে যথাশীঘ্রসম্ভব পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সময়াবদ্ধ পথরেখা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার আলোকে সি.আই.পি-১ এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য অভিন্ন রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য সি.আই.পি-২ প্রণয়ন করা হয়েছে। সি.আই.পি-২ তে 'সমগ্র খাদ্য ব্যবস্থা'কে বিবেচনায় এনে এমন একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে খাদ্যের সকল উপাদান (পরিবেশ, মানুষ, উপকরণ, প্রক্রিয়া, অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, বিপণন ও বাণিজ্য) এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বিপণন, প্রস্তুতকরণ ও ভোগের সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম এবং তাদের অন্তস্থঃ যূথবদ্ধ পরস্পর নির্ভরশীল ফলাফলসমূহ, যার মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত ফলাফলও[১] অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ধরণের 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাবনা' ২০১২ সালের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সংজ্ঞা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিটির সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি কনফারেন্সে বিস্তৃত আকারে যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে - 'সকল মানুষ সবসময় ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে খাদ্য গ্রহণে সক্ষম থাকলেই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকে, যা তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য গুন ও মানে পর্যাপ্ত থাকে এবং পর্যাপ্ত পয়:নিষ্কাশন, স্বাস্থ্য সেবা ও যত্ন দ্বারা সমর্থিত হয়, যার মাধ্যমে সুস্থ ও কর্মঠ জীবন নিশ্চিত হয়'। খাদ্য ব্যবস্থার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দ্বৈততা পরিহার ও খাদ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ককে বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয়।

একটি পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থার পথরেখা

সি.আই.পি-২ তে খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খলের সাথে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র নিরূপণের জন্য পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থাকে এপ্রোচ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্র উৎপাদক, কৃষি-প্রতিবেশ নীতি, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, স্থানীয় বীজ ও পশুর জাত প্রজনন, প্রচারিত জ্ঞান ও চর্চা, স্থানীয় বাজার, টেকসই ও শক্তিশালী জীব-বৈচিত্র্যের[২] প্রতি অঙ্গিকার, একই সাথে খাদ্যের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থার উপর পুষ্টি নির্ভর করা উচিৎ। পুষ্টিকে কেন্দ্রে রেখে, এতে পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম ও শিশু ক্ষুধার বিরুদ্ধে পুণর্নবীকরণ প্রচেষ্টার প্রতি অঙ্গীকারকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। পাশাপাশি, সবার জন্য সবসময় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, সেই সকল খাত, (১৮ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ) উন্নয়ন সহযোগী, ব্যক্তি-খাত, সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সামগ্রিক কর্ম-পরিকল্পনার সমর্থনে সি.আই.পি-২ কে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে :

ক) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আওতায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা নিরূপণ এবং একটি পুষ্টিসংবেদনশীল খাদ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন, যা সমন্বিত উপায়ে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে;

খ) সর্বোচ্চ পুষ্টিসংবেদনশীল বিনিয়োগ প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য ও পুষ্টি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে প্রাধান্য প্রদান;

গ) অধিকতর কার্যকারিতার লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যাবলীর মধ্যে সংহতি স্থাপন ও সমন্বয় সাধন;

---

১. [১] বিশ্ব খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জাতিসংঘের টাস্কফোর্স কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ।

২. [২] আইসিএন ২ (২০১৫) সম্মেলনের সচিবালয় থেকে এফএও/ ডব্লিউএইচও এর যৌথ প্রতিবেদন।

ঘ) প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ সঞ্চালন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদসহ অর্থায়নের সকল উৎসকে একটি একক উদ্ভাবনী-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অথচ অন্তর্ভুক্তিমূলক বিনিয়োগ পরিকল্পনার আওতায় সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যা একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণে দ্বৈততা পরিহার করে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচিতে বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সম্পদ চাহিদা নিরূপণ ও অর্থায়ন কৌশল: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত'[৩] প্রকাশনায় একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা পরিবেশন করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিশ্চিতকল্পে গৃহীতব্য সকল কার্যক্রম বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ অনুসারে ২০১৫-১৬ ভিত্তি-বছরের স্থির মূল্যে ২০১৭-২০৩০ সময়ে সমন্বিত জিডিপি ৪৯৮,৯০০ বিলিয়ন টাকা[৪] ধরা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত কৌশলপত্রে প্রদর্শিত সম্পদ ঘাটতির চিত্রে পুষ্টিসংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে গৃহীতব্য বিনিয়োগ কর্মসূচি ও নীতি অন্তর্বর্তিতার ক্ষেত্রে পুষ্টিসংবেদনশীল বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সি.আই.পি-২ বাস্তবায়নে নীতি-নির্দেশিকা

সি.আই.পি-২ বাস্তবায়ন একগুচ্ছ নীতি-নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত হবে, যেগুলো সি.আই.পি-২ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী এবং সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন - ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, ভোক্তা সংগঠন, গবেষকবৃন্দকে একযোগে কাজ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যূথবদ্ধভাবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রাপ্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে নিম্নরূপভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সম্পদ বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করবে।

ক) নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সামঞ্জস্য: অভিন্ন উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অংশীজনরা যাতে সম্পৃক্ত হতে পারে এরূপ একটি স্পষ্ট কাঠামো সি.আই.পি-২ এ প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি দেশে বিদ্যমান নীতিমালার ভিত্তিতেই প্রণীত হয়েছে, যা অন্যান্য নীতিগত কাঠামো, কর্মসূচি ও পরিবীক্ষণ উপকরণের সাথে সঙ্গতিবিধান ও সমন্বয় সাধনের ওপর স্থাপিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে । জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সি.আই.পি-২ এর কর্মতৎপরতার সংযুক্তি নিশ্চিত করতেও প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এছাড়া সকল পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করে পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য পদ্ধতি উন্নয়নকল্পে মন্ত্রি-পরিষদ পর্যায়ের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দায়িত্ব পালনরত 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি' ও সাম্প্রতিককালে পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ'-এর নিকট থেকেও সহযোগিতামূলক নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

খ) সম্পদ সন্নিবেশন: সি.আই.পি-২ এ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা খাতে পরিকল্পিত সরকারি বিনিয়োগ ছাড়াও সরকার-বহির্ভূত সকল খাতের অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করতে অংশীজন কর্তৃক সুপারিশকৃত দেশের জন্য সবচেয়ে জরুরী যূথবদ্ধ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে তহবিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এতে করে সি.আই.পি-২ এ প্রস্তাবিত 'পুষ্টিসংবেদনশীল খাদ্য পদ্ধতি' উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সব ধরণের উদ্যোগের মধ্যে দ্বৈততা পরিহার করে কার্যকর উপায়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে একটি সময়াবদ্ধ বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে আশানুরূপ ফলাফল প্রাপ্তি সম্ভব হবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিনিয়োগ পরিকল্পনার (পুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন, ইত্যাদি) অনস্বীকার্য ভূমিকাকে সি.আই.পি-২ এ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০১৬-২১) ও জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সাথে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নের সার্বিক উদ্যোগ করা হবে।

---

৩. [৩] সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৭), 'এসডিজি চাহিদা নিরুপণ ও অর্থায়ন কৌশল; প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'

৪. [৪] ৫,০০৪.৯৯ মার্কিন ডলার

গ) একটি 'প্রাণবন্ত দলিল' প্রণয়নের সামুদয়িকতা, অংশগ্রহণ ও আলোচনা: সি.আই.পি-১ এর ধারাবাহিকতায় সি.আই.পি-২ কে শুরু থেকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ পর্যন্ত একটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সি.আই.পি-এর বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের আলোকে অংশীজনের পরামর্শক্রমে উন্নয়নকে আরও সংহত এবং বিরাজমান ও বিকাশমান পরিস্থিতির উপযোগী করা সম্ভব হবে এবং এই প্রক্রিয়াতে সি.আই.পি একটি 'প্রাণবন্ত দলিল' হয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি প্রক্রিয়া-অবহিতকরণ থেকে ফলাফল-অবহিতকরণ পর্যন্ত চলমান সকল বিষয়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ফলে প্রতি অর্থ-বছরের শেষে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা সরকারের বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ) টেকসহিতা: সি.আই.পি-১ এর ধারাবাহিকতা ও লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সি.আই.পি-২ এর রূপরেখা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এটি এমনভাবে বাস্তবায়িত হবে যে, তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশল, মান ও প্রভাব বিশ্লেষণের সাথে শুধুমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণই হবেনা, বরং সেইসাথে টেকসইও হবে। প্রতিটি বিনিয়োগ প্রকল্পকে পরিবেশগতভাবে অবশ্যই টেকসই হতে হবে, শুধু তাই নয়, সেগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানোর উপযোগী হতে হবে। টেকসহিতার বিষয়টি যেমন কৃষি কার্যক্রমের সাথে, তেমনি ভোগ কাঠামোর সাথেও সম্পর্কিত। এতদসংক্রান্ত বিশ্লেষণভিত্তিক ফলাফল ও তথ্যাদি সি.আই.পি-২ এ পরিবেশন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পরে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিদ্যমান থাকে সি.আই.পি-২ এর আওতায় গৃহীত গবেষণায় বিশ্লেষণ করার মাধ্যমেও প্রকল্পের ফলাফলের টেকসহিতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন সম্ভবপর হবে।

ঙ) নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্ব আরোপ: কৃষি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যখাতের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা। সামগ্রিক খাদ্য মূল্যশৃঙ্খল ও পরিবারের পুষ্টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি কোন্ ফসল ও শস্যের জাত চাষ করা হবে, বাড়িতে খাওয়া হবে না কি বিক্রি করা হবে, সে সম্পর্কেও তাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। চাষাবাদের পূর্ব ও পরবর্তী প্রক্রিয়ার (উদাহরণস্বরূপ: বীজ বপন ও চারা রোপণ, সেচকার্য, ফসল কর্তন, মাড়াই ইত্যাদি ছাড়াও বীজ মজুত, বীজতলা ব্যবস্থাপনা, সবজি চাষ, উদ্যান বাগান, জৈব ও কম্পোস্ট সার প্রস্তুত, ইত্যাদি) শ্রমিক হিসেবে তাঁরা ক্রমবর্ধমানভাবে সক্রিয় হচ্ছেন। কৃষি ব্যবস্থা ক্রমাগত নারীসম্পৃক্ত হওয়ার ফলে, কৃষাণীদের জমি ও উপকরণ ইত্যাদি সম্পদে অধিক অভিগম্যতা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও নারীবান্ধব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গৃহস্থালি খাদ্য প্রস্তুত, আহার ও বিপণনে নারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে, ফলে তাঁরা পুষ্টি-নির্দিষ্ট ও পুষ্টি-সংবেদনশীল কর্মসূচিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের, বিশেষকরে শিশুদের, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিতে সমর্থ হতে পারেন। শিশুদের প্রতিপালক হিসেবে, তাঁরা শিশুদেরকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করছেন কিনা তার ওপর শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান থেকে শুরু করে শিশুকালে মস্তিষ্কের বিকাশ, সুস্থ বৃদ্ধি ও শক্তিশালী হজমশক্তি গড়ে ওঠা বহুলাংশে নির্ভর করে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হচ্ছে নারীদের উৎপাদন ও প্রজনন ক্ষমতা এবং এই দ্বৈত ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ করা। উৎপাদনমূলক (কৃষি) কাজে তারা অধিক সময় ব্যয় করলে সন্তান প্রতিপালনে কম সময় দিতে হয় যা শিশুদের পুষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কৃষিসহ অন্যান্য উৎপাদনমূলক কাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সত্ত্বেও নারীরা সম্পদে অভিগম্যতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। সি.আই.পি-২ কে অবশ্যই তাঁদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে হবে, যাতে করে তাঁরা তাঁদের সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

চ) সর্বাধিক অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অভীষ্টে আনা: কার্যকর লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় দেশের জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক অরক্ষিত অংশকে প্রাধান্য প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে নারী ও শিশুদের অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে, এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। বিশেষত, দেশের দক্ষিণাঞ্চল সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে অধিক আক্রান্ত হয়, উপকূলীয় অঞ্চল লবণাক্ততায় আক্রান্ত। উত্তরাঞ্চলে চরমভাবাপন্ন তাপমাত্রা ও খরা হচ্ছে একটি উদীয়মান সমস্যা। নদী ভাঙনের ফলে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে ফলে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় জীবন যাপন করছে। তাদের বিশুদ্ধ পানির অভাব রয়েছে, ফলে তারা মারাত্মকভাবে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে।

ছ) সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) উপর গুরুত্বসহ বর্ধিত অংশীদারিত্ব: সি.আই.পি-২ এর কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অংশীজনদের মধ্যে অংশীদারিত্বকে আরও উৎসাহিত করা হবে। তথ্য ও জ্ঞান বিনিময় ছাড়াও ব্যক্তিখাত ও সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থাপিত হতে পারে। ১৯৯০ সাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় পথিকৃৎ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চলমান রয়েছে। সি.আই.পি-২ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনার আওতায় এর সেবা বিতরণে কার্যকর এই প্রক্রিয়াটি আরও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও, সরকার একটি সহায়ক আইনগত কাঠামো[৫] প্রণয়ন করেছে এবং বড় আকারের অবকাঠামো বিনির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য অন্য দেশ বা সরকারের সাথে পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। যেহেতু পিপিপি'র[৬] সার্বিক বাজেট সি.আই.পি-তে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়, তবুও ধারণাপত্র, নীতিমালা, নকশা প্রণয়ন, কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম ও সাধারণভাবে সুবিধা উন্নয়নে ও পিপিপি'র প্রবর্ধনে চলমান প্রকল্পসমূহকে কর্মতৎপর করে তোলা হবে। আন্তঃখাতীয় অংশীদারিত্ব কর্মকাণ্ড তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে; উদাহরণস্বরূপঃ পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম আন্দোলনে বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য এবং সম্পৃক্ততার জন্য কাঠামো ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করে সকল অংশীদারের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অপুষ্টি দূর করার কার্যক্রমে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করতে হলে এটি অত্যন্ত জরুরি। সফল অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনামূলক আয়োজনে তুলনামূলক বেশি সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক উদ্যোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে দারিদ্র্য হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বেড়েছে, পক্ষান্তরে দরিদ্রদের জন্য ইনক্লুসিভ মার্কেট এপ্রোচ (আইএমডি) তৈরি হয়েছে।

জ) উদ্ভাবন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ও প্রবর্ধন: খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কার্যকর নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির বিকাশকে সি.আই.পি-২ এ উৎসাহিত করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রবর্ধনে অব্যাহত প্রচেষ্টার সাথে একে যুক্ত করা হবে এবং ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা- জি.আই.এস প্রযুক্তির সাহায্যে জমির ম্যাপিং-এর মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধা ব্যবহার করা হবে। এই জি.আই.এস ম্যাপিং-এ মাটির উপযোগিতা, জমির জোনিং, পুষ্টিগত অবস্থান, সার, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য টেলি-কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের সরবরাহ করা হবে। কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সরকারি খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ সরকারের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণকে, বিশেষভাবে সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করবে। সাফল্যজনক উদ্ভাবনকে সম্প্রসারিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সি.আই.পি-২ এর মেয়াদকালে আঞ্চলিক পর্যায়ের কৃষক সংগঠনের সকল পর্যায়ের আলোচনায় অংশগ্রহণসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা, পরিচালন ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, একইসাথে দেশব্যাপী এর পদ্ধতির ধারাবাহিকতা তৈরি হয়েছে। এ ধরনের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ সি.আই.পি-২ বাস্তবায়নে নিজস্ব সম্পদ সঞ্চালনে অন্যান্য ব্যক্তি ও বেসরকারি সংস্থাকে উৎসাহিত করতে পারে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে গৃহীত বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও কর্মসূচিসমূহ

সি.আই.পি-১ এর সাফল্যের পরে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের আওতায় ২০১৬/১৭ থেকে ২০১৯/২০ অর্থবছরের জন্য সি.আই.পি-২ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। জাতীয় খাদ্য নীতি'র তিনটি উদ্দেশ্যের (খাদ্যের সহজলভ্যতা, অভিগম্যতা ও ব্যবহার) ভিত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণের পরিবর্তে 'খাদ্য শৃঙ্খল (উৎপাদন থেকে থালা পর্যায় পর্যন্ত)'-খাদ্য ব্যবস্থার ভিত্তিতে সকল বিষয়কে পুষ্টিসংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থার আলোকে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ঈপ্সিত উন্নয়ন ব্যাপ্ত করার জন্য পাঁচটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্র-ভিত্তিক স্তম্ভ ও স্তম্ভগুলোর আওতায় ১৩টি কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।

৫. [৫] বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন ২০১৫, যা রূপকল্প ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে, এর মাধ্যমে আর্থিকভাবে টেকসই উপায়ে, উন্নত মানের সরকারি বড় অবকাঠামো নির্মাণ করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৬. [৬] বাংলাদেশ সরকারের সাথে অন্য সরকারের (জি২জি) এর মাধ্যমে পিপিপি বাস্তবায়নে নীতিগত কাঠামো, ২০১৭।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনকল্পে পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে পরিকল্পিত বিনিয়োগের ক্ষেত্র-ভিত্তিক পাঁচটি স্তম্ভ

ক. সুষম খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ;

খ. উৎপাদনোত্তর রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ;

গ. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও ব্যবহার;

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও উন্নত স্থিতিশীলতা;

ঙ. আন্তঃখাতীয় বিষয়াবলীসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে পরিকল্পিত বিনিয়োগের স্তম্ভভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ

ক. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

ক.১. শস্য ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই বর্ধন ও বৈচিত্র্য

ক.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, মান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

ক.৩. প্রাণিজ উৎস থেকে খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন

খ. দক্ষ ও পুষ্টিসংবেদনশীল উৎপাদনোত্তর রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ;

খ.১. ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদনোত্তর মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ

খ.২. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা

গ. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার

গ.১. পুষ্টি বিষয়ক সমৃদ্ধ জ্ঞান ও উত্তম চর্চার বিস্তার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ

গ.২. নিরাপদ পানি, উন্নত পরিচ্ছন্নতাবিধি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও বর্ধিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

ঘ.১. কার্যকর দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং সময়ানুগ খাদ্য বিতরণ ও কৃষি পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সুসংহতকরণ

ঘ.২. অসমর্থ ও উদ্বাস্তু অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর গোটা জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ

ঙ. আন্তঃখাতীয় বিষয়াবলীসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

ঙ.১. উন্নত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা, খাদ্য মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চয়তা, নিরাপদ খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধি সম্পর্কিত সচেতনতা

ঙ.২. খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাসকরণ

ঙ.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত

ঙ.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালন সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব উন্নয়ন

বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনায় সম্পদ সঞ্চালন

একটি ফলাফলমুখি কাঠামোতে বাংলাদেশে পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রমের মধ্যে দ্বৈততা পরিহারক্রমে বিনিয়োগসমূহের সম্মিলন ঘটিয়ে পুষ্টি উন্নয়নে উন্নততর ফলাফল লাভের একীভূত কৌশলগত উপায় হচ্ছে সি.আই.পি-২। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের সম্পদ-চাহিদা মেটাতে আর্থিক সম্পদ সঞ্চালন করতে সহায়তা করবে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনকল্পে সি.আই.পি-২ নিম্নোলিখিত পদ্ধতিতে সম্পদ যৌক্তিকিকরণ ও সঞ্চালনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে:

- সম্পদ সঞ্চালন ও ব্যবহারের বিষয়ে এফ.পি.এম.ইউ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং সি.আই.পি-২ বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ;
- ছাড়কৃত, লভ্য ও প্রতিশ্রুত আর্থিক সম্পদের মানসম্মত পরিবীক্ষণ এবং ফলাফল কার্যকরভাবে প্রকাশ;
- ব্যক্তি-খাত, কৃষক সংগঠন, সিএসও-সমূহ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বনিক সমিতি/ চেম্বার অব কমার্সসহ অন্যান্যদের বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার নিয়মিত সুযোগ সৃষ্টি।

বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক ঘাটতি পূরণ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রমে অর্থায়নের বিষয়ে সি.আই.পি-২ এ আলোকপাত করা হয়েছে। পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা নিরসনের উদ্দেশ্যে যে সকল সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন ও সি.এস.ও-সমূহের দ্বারা সমধর্মী প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোতে প্রয়োজনানুসারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকারি সংস্থাসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি ও দাতাগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে প্রয়োজনীয়তা বা অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একই স্থানে একই ধরনের উদ্যোগ বা কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। এরূপ দ্বৈততা পরিহার করার সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সি.আই.পি-২) এর মতো অন্যান্য সকল কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রচিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা দলিলের সার্বিক ধারনার দ্বারা সমর্থিত হয়ে ও উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিত করে বিনিয়োগের গতি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষত যে সকল চুক্তিভিত্তিক উদ্যোগ (চুক্তিভিত্তিক খামার ও সরবরাহ শৃঙ্খল) রয়েছে, পিপিপি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সেগুলোতেও বিনিয়োগের গতি সঞ্চারণ করতে হবে।

৩.২. জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য -১ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ফলাফল (NFP Objective 1: Outcomes)

জাতীয় খাদ্য নীতির প্রথম লক্ষ্য হল নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের পর্যাপ্ত এবং স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করা । নিচের সারণী ৩-এ জাতীয় খাদ্য নীতির ৪টি নির্দেশক-এর গতিধারা বর্ণনা করা হয়েছে, জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য-১ এর ফলাফল নির্দেশ করে। কৃষিজ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সংশ্লিষ্ট নির্দেশকটি শস্য, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য-সম্পদের উৎপাদনের আর্থিক মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করে। চালের আমদানি নির্ভরশীলতা সংশ্লিষ্ট নির্দেশকটি অভ্যন্তরীণ প্রাপ্যতা ও আমদানির উপর কতটা নির্ভরশীল তা পরিমাপ করে। চালের উৎপাদনে স্থিতিহীনতা নির্দেশকটি সরলরৈখিক গতিধারা (linear trend)-এর ভিত্তিতে বর্তমান সময়ের সাথে বিগত দশ বছরের চাল উৎপাদন তুলনা করে পরিমাপ করা হয়। মোট খাদ্যশস্যের মূল্য সংযোজনে চালের মূল্য সংযোজনের অবদান দ্বারা উৎপাদন বহুমুখীতা পরিমাপিত হয়।

৩.২.১. মূল্যায়ন

সারণী-৩: এনএফপি'র লক্ষ্য-১: নির্বাচিত নির্দেশকসমূহের ফলাফল

সিআইপি/ এনএফপি-পিওএ আউটপুট প্রক্সি নির্দেশক	২০০৭-০৮	২০০৯-১০	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	লক্ষ্য	উৎস
স্থির মূল্যে কৃষিজ-জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০০৫-০৬)	২.৯৪%	৭.১৩%	৩.১২ %	২.৫০%	২.৬৫%	৪.৩০% 🟡	বিবিএস
চাল আমদানি নির্ভরশীলতা[২০]	৪.২০%	৩.৩১%	১.৯৯ %	২.২০%	২.০০%	০% 🟡	বিবিএস/এফপিএমইউ/ এমআইএস
চাল উৎপাদনে স্থিতিহীনতা[২১]	৪.০৯%	৪.০৭%	৩.১০%	৩.০৪%	৩.০৫%	০% 🟡	বিবিএস
চলতি মূল্যে মোট খাদ্য-শস্যে মূল্য সংযোজনে চালের হিস্যা	৩৭.৯৭%	৩৯.৬৫%	৩৪.২৬%	৩৩.৮৩%	৩৮.৬৯%	ক্রম হ্রাসমান 🟢	বিবিএস

রঙিন সূচকগুলো অর্জনের অগ্রগতি নির্দেশ করে

🟢 *লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত* 🟡 *লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পথে* 🔴 *লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি*

কৃষি বহুমুখীকরণ অব্যাহত

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষিজ জিডিপি-র প্রবৃদ্ধির হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ২.৫০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬৫% হয়েছে (সারণী-৩)। সার্বিক কৃষি খাতের মধ্যে শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য উপ-খাতের খাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১.০০%, ৩.৩৩% ও ৬.২০%। সার্বিক কৃষি-খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাত-দ্বয় যৌথভাবে প্রায় ৪০% মূল্য সংযোজন করে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩৬% ছিল। এটি নির্দেশ করে যে, কৃষিজ জিডিপি-এর গঠন শস্য-নির্ভর কৃষি থেকে শস্য-বহির্ভূত খাতের দিকে ধাবিত হলেও এ প্রক্রিয়া বেশ মন্থর। প্রাণি-জাত দ্রব্যের বর্ধিত-চাহিদা এবং সুসংগঠিত ও বাজারমুখী মৎস্য-চাষ পদ্ধতিই বৈচিত্র্যময় খাদ্য উৎপাদনের মূল চালিকা হতে পারে। আঞ্চলিক কৃষি-পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে খাদ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ সাম্প্রতিককালের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি-তে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান (বনজ-খাত ব্যতীত) দাঁড়ায় ১৩.০৭%, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৯% কম। গত ২০০৭-০৮ অর্থবছরে থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে সার্বিক কৃষি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রেও একই ধারা লক্ষ্য করা গেছে । যার ফলে শস্য উপ-খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি-র অংশ হ্রাস পায় এবং প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য উপ-খাতে তা বৃদ্ধি পায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সার্বিক কৃষিজ জিডিপি-তে শস্য উপ-খাতের অবদান ০.৯৯% হ্রাস পেয়েছে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাত-দ্বয়ের অবদান যথাক্রমে ০.৯০% ও ০.০৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। শস্য উপ-খাত ও নির্দিষ্ট খাত-ভিত্তিক কৃষিজ জিডিপি-এর গতিধারা নির্দেশ করে যে, কৃষির বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি সাম্প্রতিককালে ধীর গতিতে হলেও চলমান আছে।

চাল আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে

পরিবীক্ষণকালে (২০০৭-০৮ থেকে ২০১৬-১৭) তিন বছরের চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে চাল আমদানি নির্ভরশীলতার নির্দেশকটি প্রায় অর্ধেকেরও বেশি হ্রাস পেয়ে ৪.২% থেকে ২.০% -এ নেমে এসেছে। তবে এনএফপি-পিওএ এর ভিত্তিবছর (২০০৭-০৮)-এর তুলনায় ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে চাল আমদানির নির্ভরশীলতার নির্দেশকটি ১%-এ নেমে আসে কিন্তু ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ১৪.৯ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির ফলে আমদানি নির্ভরশীলতার নির্দেশকটি ২%-এ উঠে যায়। এজন্য মূলত: ভারতীয় চালের আমদানি-সমতা মূল্যের পরিবর্তনই দায়ী।

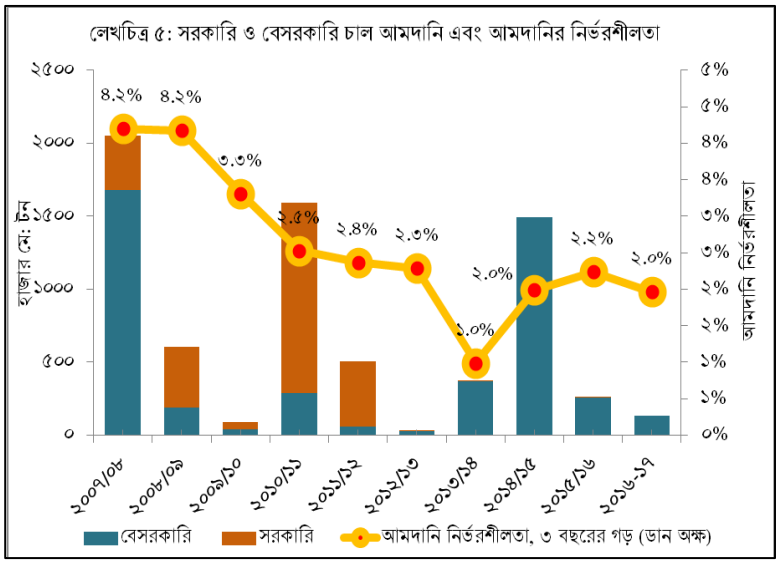

চাল আমদানির উপর ২৮% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মাত্র ১.৩৩ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়, যা পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৪৮% কম। এর ফলে তিন বছরের চলমান গড়-ভিত্তিক আমদানি নির্ভরশীলতা ২.০%-এ উন্নীত হয় (লেখচিত্র–৫)। উল্লেখ্য যে, গত পাঁচ বছরে(২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭) সরকারি নিজস্ব অর্থে কোন চাল আমদানি করা হয়নি।

চাল উৎপাদনে স্থিতিহীনতায় পরিবর্তন সামান্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরে চাল উৎপাদনে স্থিতিহীনতা[২৩] ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এর তুলনায় ০.০১% হ্রাস পেয়ে ৩.০৫% হয়েছে। বিগত ২০০০-০১ অর্থবছরের চাল উৎপাদন স্থিতিহীনতা ৮.০২%-এর তুলনায় দ্রুত হ্রাস পেয়ে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রায় ৪%-এ দাঁড়ায় এবং কিছুটা হ্রাস/বৃদ্ধি বজায় রেখে ২০১১-১২ অর্থবছর নাগাদ সর্বনিম্ন প্রায় ৩%-এ নেমে এর কাছাকাছি বিরাজমান থাকে (লেখচিত্র-৬)। চালের উৎপাদন স্থিতিহীনতা হ্রাস পাবার অন্যতম কারণ হল, ১৯৯০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বোরোর উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি, যা আমন ও আউশের উৎপাদন স্থিতিহীনতাকে অনেকাংশে পুষিয়ে দেয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সার্বিকভাবে ধান ফসলের জন্য আবাদাধীন জমির পরিমাণ প্রায় ০.৩৩% হ্রাস পেয়েছে এবং ধানের উৎপাদন ২.৪% হ্রাস পেয়েছে। জুলাই ২০১৭-এর হিসাব অনুসারে বোরো, আমন ও আউশ মোট চাল উৎপাদনের যথাক্রমে ৫৩%, ৪১% ও ৬% (লেখচিত্র-৬)।

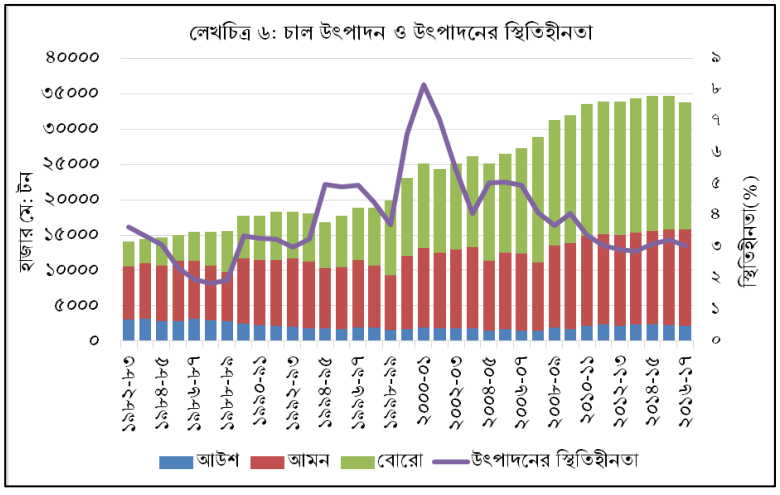

চালের মূল্য সংযোজনের গতিধারা অব্যাহত

বর্তমান মূল্যে সার্বিকভাবে খাদ্যে মোট মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে চালের হিস্যা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হয়েছে ৩৮.৭% এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ৪০.৪%, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে শুরু করে এ যাবৎ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই ক্রমাগত হ্রাসের ধারায় প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য উৎপাদনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বহুমুখীকরণ অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমহ্রাসমান

ডলার ও ইউরো-এর অবমূল্যায়নসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে রপ্তানি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সার্বিক রপ্তানি ব্যয় ঘাটতি ১৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। একই সময়ে পণ্য খাতে রপ্তানি ব্যয় ঘাটতি ১৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোক্তা পণ্যের মান উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ ও পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজনের মাধ্যমে সীমিত পণ্যের উপর রপ্তানি নির্ভরশীলতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করছে। এ লক্ষ্যে সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে 'এক জেলা এক পণ্য' কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সত্তর দশকের প্রথম দিকে রপ্তানিযোগ্য প্রধান কৃষি পণ্য ছিল কাঁচা পাট, চা ও চামড়া। সময়ের সাথে সাথে এটি পরিবর্তিত হয়েছে। বিগত দুই দশকে (অর্থবছর ১৯৯৬-২০১৫) প্রাথমিক ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের রপ্তানির মূল্য তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ০.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির পরিমাণ ৮১% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত এক বছরে মোট বাণিজ্য ঘাটতি[২৫]-তে পণ্য-বাণিজ্য ঘাটতির হিস্যা ৯৮.৬% থেকে বেড়ে ৯৯.৭% এ উন্নীত হয়েছে। স্বাভাবিক বছরগুলোতে গম, ডাল, ভোজ্য তেল, মসলা, দুধ ও দুগ্ধজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্যশস্য আমদানির একটা বড় অংশ বেসরকারি খাত করে থাকে। কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে দেশ (২০১৪-১৫ থেকে ২০১৫-১৬) মোট লভ্যতার ৭১.৬% গম, ৫৫.১% ডাল ও ২৪.৩% আমদানি নির্ভরশীল। এই খাদ্য বাণিজ্য ঘাটতি মূলত: আয় বৃদ্ধি ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। এই ঘাটতি নিরসনে অভ্যন্তরিণভাবে ফল, সবজি, মাংস ও প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্য উৎপাদনের বর্ধিত চাহিদা যোগানের ক্ষেত্রে ধীরগতি সম্পন্ন ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সুযোগ নির্দেশ করে।

লেখচিত্র ৭- খাদ্যশস্যের কারণে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ

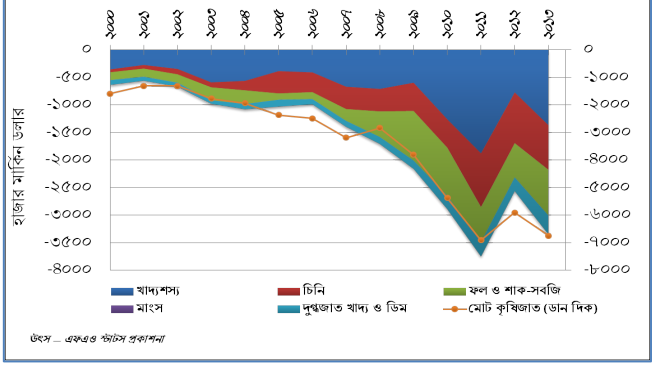

উৎস – এফএও স্টাটস প্রকাশনা

খাদ্যশস্যের মূল্যধারা উর্ধ্বমুখী

২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) প্রকৃত মূল্য (real price)-এর উর্ধ্বমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। জুন ২০১৭ মাসে চাল ও গমের প্রকৃত পাইকারি মূল্য পূর্বের বছরের একই মাসের তুলনায় যথাক্রমে ৬৩% ও ৭% বৃদ্ধি পায়। এপ্রিলে/১৬ শেষে এবং মে/১৬ মাসের প্রথম দিকে হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যার ফলে বোরো ধানের উৎপাদন হ্রাস পায়, যার ফলশ্রুতিতে চালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় (লেখচিত্র-৮)। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য কিছুটা অস্থিতিশীল থাকলেও গমের মূল্য স্থিতিশীল পর্যায়ে ছিল।

লেখচিত্র ৮: প্রকৃত মূল্য (চাল ও গম)

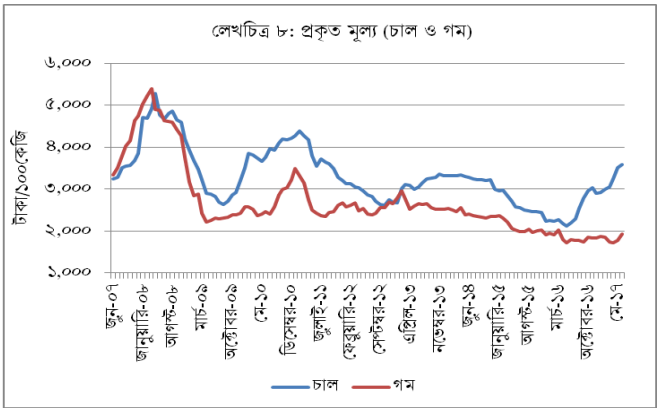

৩.২.২ : ইস্যু ও নীতি চ্যালেঞ্জসমূহ

শস্য বহুমুখীকরণে গতিশীলতা ও ধানের উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধি

চাল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১.৩% প্রায়) এবং ক্রমবর্ধমান আয় বৃদ্ধি এবং বহুমুখী খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি ইঙ্গিত করে যে, টেকসইভাবে শস্য-বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিতকরণ ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনে মুখ্য চ্যালেঞ্জ হবে । অবশ্য চাল উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি এখনও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জমিতে ধানের উৎপাদন ১.৫% এর বেশী হারে বৃদ্ধি পেলে চালের স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ব্যাহত না করে ডাল, আলু, তৈলবীজ, শাকসবজি, ফল ও মসলা উৎপাদনে জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়। অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং কৃষি উপকরণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'সংরক্ষণ ও উৎপাদন বাড়ানো' (Save and Grow) নীতি অনুসরণ গুরুত্বপূর্ণ । আশা করা যায় যে 'সংরক্ষণ ও উৎপাদন বাড়ানোর নীতি' উৎপাদনে নিবিড়তা আনবে এবং টেকসই উৎপাদন ও সম্পদের গুণগত মান রক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস, প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি এবং ইকো সিস্টেমের প্রবাহ বৃদ্ধি করবে[২৬]। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ উদ্যান ফসল, ডাল, তৈলবীজ এবং অর্থকরী ফসল সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 'আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ ২০১৬'-এর অন্যতম মূল বার্তা হচ্ছে, ডালের বিভিন্ন পুষ্টি সুবিধাসমূহ প্রচার। সাধারণ খাদ্যশস্যে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, ডালে তার দ্বিগুণ পাওয়া যায়। শিশুদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য ডাল একটি উৎকৃষ্ট পরিপূরক খাবার, যখন তা শস্য এবং সবজির সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অপর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামো (যেমন - ফসল উত্তোলন পরবর্তী সুবিধা, বাজার অবকাঠামোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন) দূরীকরণ এবং আর্থিক সেবার (যেমন - বীমা, ঋণ সুবিধা) অভাব পূরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক শস্য বহুমুখীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র চাষিদের বাজারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন টেকসইকরণ

অবিরাম কৃষি বাণিজ্য-ঘাটতি সরকারি বাজেটের জন্য উদ্বেগজনক এবং বোঝাস্বরূপ যদিও ২০১১ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে এর কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল (লেখচিত্র-৭)। এমতাবস্থায়, কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও মূল্য সংযোজনে সহায়তা কৃষি বহুমুখীকরণের একমাত্র উপায় নয়, বরং মৌসুমি ফল ও শাকসবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের যে তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে কৃষি আমদানি কমিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা যেতে পারে । রপ্তানি না করেও অভ্যন্তরীণ বাজার হতেও আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগতমান এবং প্রমাণপত্র (সার্টিফিকেশন) একটি বড় বাধা, এর পাশাপাশি পরিবহন খরচের ঝামেলাও রয়েছে। আমদানির বিকল্প কৃষি পণ্য যেমন; ডাল, তৈলবীজ, মসলা, শস্যসমূহের সরবরাহ ব্যবস্থা (supply chain) উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (শ্রমিক, মাটির জৈবিক-পদার্থ, পানি ইত্যাদি) রক্ষার জন্য ন্যূনতম বা শূন্য আবাদ, শস্যের অবশিষ্টাংশ সংযোজন, শস্য-চক্র অনুসরণ করে কৃষি সংরক্ষণের ধারণাসমূহকে কার্যকর করা যেতে পারে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বচ্ছ এবং অনুমান-ভিত্তিক বাণিজ্য নীতি কার্যকর করে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার, যেন আমদানির বিকল্প দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা যায়।

প্রতিযোগিতামূলক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

প্রান্তিক কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করতে আরও বেশী প্রতিযোগিতামূলক সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যেখানে সাধারণত কৃষি বাজারের সরবরাহ ব্যবস্থায় উৎপাদক ও খুচরা বিক্রেতার মধ্যে একটি সমন্বয় থাকে, তবে আধুনিক কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটি উলম্ব সমন্বয় (vertical coordination) প্রয়োজন। কৃষি-ভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (যেমন; কৌটাজাতকরণ শিল্প) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের শস্য, যেমন; ফল, সবজি, মসলা, মাছ (বিশেষ করে চিংড়ি) এবং প্রাণি-জাত দ্রব্যের জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি করে খামার-ভিত্তিক কার্যক্রম চাঙ্গা করা যেতে পারে।। তদুপরি এই কার্যক্রম খাতওয়ারী মূল্য-সংযোজন এবং আয় বৃদ্ধিরও সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অভ্যন্তরীণ বাজার ও রপ্তানি খাতে সরবরাহ ব্যবস্থা (value chain)-এর সুযোগ সম্পূর্ণরূপে পেতে সংশ্লিষ্ট এজেন্টদের সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক ও বাজেট সংস্থানের প্রতিশ্রুতি ঠিক রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া, শিল্প কারখানা ও অবকাঠামোতে আরও বেশী বিনিয়োগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়ক সেবা (ঋণ সুবিধা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট পরিকল্পনা) সহজতর করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরাপদ কৃষি পণ্যের বিষয়টি দেশব্যাপী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিরাপদ কৃষি পণ্য নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ অবস্থা মোকাবেলায় শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরেও একটি দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদন ও পুষ্টি সংবেদনশীল মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আওতায় তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন পুষ্টি সংবেদনশীল উৎপাদনের ক্ষেত্রে, যেমন- বীজ উৎপাদন, মৌমাছি পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গুদামজাতকরণ, চিংড়ি উৎপাদনে নারীদের ভূমিকার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। প্রামাণিক তথ্য থেকে প্রতীয়মান যে, নারী কৃষক ও উদ্যোক্তারা সরবরাহ ব্যবস্থায় বা শৃঙ্খলে প্রবেশের ক্ষেত্রে বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়[২৭]। তাই কৃষি উদ্যোগ হতে আয় ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে হলে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ-সমতা আনয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যেন নারীদের পক্ষে কৃষি উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভবপর হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের সব-থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম[২৮]। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও নীতি নির্ধারকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ (যেমন-বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, ঘূর্ণি-ঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র) এবং আর্থিক সম্পদ সংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে[২৯]। তাৎক্ষণিকভাবে, মে ২০১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (BCCRF) এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয় যা বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্যাট্রেজি ও অ্যাকশন প্ল্যান (BCCSAP, ২০০৯) এর আলোকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকার একটি জলবায়ু অর্থ কাঠামো (Climate Fiscal Framework) গঠন করতে চায় যাতে করে জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত খরচ, আর্থিক চাহিদা এবং রাজস্ব, জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা যায়[৩০]। এ লক্ষ্যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সাহায্য সংস্থা (USAID) এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাগুলির জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প (২০১৩-১৬) বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন ও বনায়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সমন্বয়, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ। এই প্রকল্প বর্তমান বিনিয়োগের সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ চাহিদার ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) প্রণয়ন করেছে। উক্ত পরিবেশ CIP (২০১৬-২১)-এর উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ও দক্ষ ব্যবহার, প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের অভিযোজন নিয়ন্ত্রণ।

পরিবেশ রক্ষার্থে বনজ সম্পদের মজুদ গণনায় সহায়তা

বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও গ্রামীণ জনগণের জীবিকায় জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করে এবং বিকল্প জীবিকার উৎস হিসাবে কাজ করে। পাশাপাশি টেকসই কৃষি অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাণি-সম্পদের আশ্রয়, পশুখাদ্য, মাটির স্থিতিশীলতা এবং পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের মানুষ বনজ সম্পদ ব্যবহার করে খাদ্য, আশ্রয় এবং জ্বালানীর প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে। ২০১৪ সালের হিসাবমতে ৪০% মানুষ রান্নার কাজে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করে, যা মোট জ্বালানী শক্তি সরবরাহের ২৩%[৩১]। বনজ উপ-খাত রক্ষার্থে বন-উজাড় বন্ধকরণ এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনের ঘনত্ব বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক বনায়ন, বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এযাবৎ মাত্র ২২% বনায়ন লক্ষ্যমাত্রা (৩০২,০০০ হেক্টর) অর্জিত হয়েছে, এর বিপরীতে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট আয়তনের ২০% বনাঞ্চলের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি[৩২]। বাংলাদেশে বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ হেক্টর, যা মোট আয়তনের ৬০%। বনজ খাতে বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বনজ ভূমির জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ এবং অননুমোদিত অবৈধ দখল প্রতিহতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে, ইউএসএআইডি এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তায় বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ''জাতীয় বনজ সম্পদ পরিমাপ'' এবং REDD+ বাংলাদেশের এর সমর্থনে দেশে স্যাটেলাইট ভূমি পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ'' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে (২০১৪-২০১৮)। বনজ সম্পদের পরিমাপ নির্ধারণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, তার সাথে রিমোট সেন্সিং এর সম্পৃক্ততা, উপগ্রহ (স্যাটেলাইট)-ভিত্তিক ভূমি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন এবং দ্রব্য ও সেবার হিসাবে বনজ পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থার মূল্য নির্ধারণ করবে। এই প্রকল্পের ফলে কৃষকদের টেকসই জীবিকা (যেমন: বৃক্ষরোপণ) নিশ্চিত করতে পুরস্কার ব্যবস্থা (Reward System) গ্রহণ সহায়ক হবে।

৩.৩. জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য-২: ফলাফল (NFP Objective 2: Outcomes)

জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা-এর উদ্দেশ্য-২ হল, ক্রয়ক্ষমতা ও খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যটি তিনটি বড় কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা করে: স্বল্প-কালীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অভীষ্ট (targeted) জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি পরিচালন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পরিমাপের জন্য অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হল: (১) দুর্যোগ মোকাবেলা ও লাঘবের উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যবস্থা; (২) বাজার ও সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্য সরবরাহ মজুদ বৃদ্ধি; (৩) কর্মসংস্থান সৃষ্টি কলাকৌশলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি; (৪) শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন; (৫) পল্লী অঞ্চলে শিল্প বিকাশে সহায়তা; এবং (৬) নারী ও প্রতিবন্ধীদের জীবিকা সঞ্চালক কার্যক্রমে বিশেষ সহায়তা প্রদান।

৩.৩.১. মূল্যায়ন

সারণী - ৪ : জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর নির্দিষ্ট কিছু পারঙ্গমতার নির্দেশকসমূহ

সিআইপি/এনএফপি আউটপুট প্রক্সি নির্দেশক	২০০৭-০৮	২০০৯-১০	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	লক্ষ্য	উৎস
মোটা চালের ভিত্তিতে জাতীয় মজুরীর পরিবর্তন (৩ বছরের চলমান গড়)	-৮.১১%	৫.৭১%	১১.৩০%	১২.৮৯%	৮.৫০%	৫.৩%	বিবিএস(ওয়েজ) ডিএএম মূল্য
দারিদ্র্যের হেড কাউন্ট সূচক (সিবিএন আপার পভার্টি লাইন)	৪০% (২০০৫)	৩১.৫% (২০১০)	তথ্য নেই	তথ্য নেই	২৪.৩% (২০১৬)	২৯% (এমডিজি-১)	এইচআইইএস রিপোর্ট বিবিএস
অতি-দারিদ্র্য-সীমার হার (সিবিএন লোয়ার পভার্টি লাইন)	২৫.১% (২০০৫)	১৭.৬% (২০১০)	তথ্য নেই	তথ্য নেই	১২.৯% (২০১৬)	তথ্য নেই	এইচআইইএস রিপোর্ট, বিবিএস
দারিদ্র্যের ব্যবধান (সিবিএন আপার পভার্টি লাইন)	৯.০% (২০০৫)	৬.৫% (২০১০)	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৫% (২০১৬)	৮% (এমডিজি-১)	এইচআইইএস রিপোর্ট,বিবিএস
খাদ্য ও সাধারণ মূল্যস্ফীতির মধ্যে ব্যবধান (৩ বছরের চলমান গড়)	১.২৮%	১.৩৬%	০.০৫%	-০.২৭%	০.০৬%	সর্বোচ্চ ০%	জাতীয় হিসাব রিপোর্ট, বিবিএস

রঙিন নির্দেশক অর্জিত অগ্রগতি নির্দেশ করে; লক্ষ্য অর্জিত অগ্রগতি চলমান

চালের ভিত্তিতে মজুরী বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস

গত তিন বছরের গড়ের ওপর ভিত্তি করে চাল ক্রয়ের ক্ষমতার হিসাবে সকল খাতের গড় দৈনিক মজুরী কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১১.৩০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২.৮৯% হলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৮.৫০% এ দাঁড়িয়েছে । এর কারণ, গত ৩ বছরের চলমান গড়ে সাধারণ শ্রম মজুরী-সূচকের তুলনামূলক বৃদ্ধি জাতীয়ভাবে পাইকারি চালের মূল্যের সূচকের তুলনায় বেশি (সারণী-৪)। বিগত ২০০৭-০৮ অর্থবছরে চালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে চালের মূল্যের ভিত্তিতে শ্রম মজুরীর ওপর ঋণাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত চালের মজুরী ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির ধারা বজায় ছিল। গত ছয় বছরে অন্যান্য ক্ষেত্রের মজুরী তুলনায় চালের ভিত্তিতে মজুরীর মধ্যে বড় কোন পার্থক্য ছিল না (লেখচিত্র-৯)। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধি ছিল ৪১.০%, অন্যদিকে নির্মাণ খাত, উৎপাদন ও সেবা খাতে মজুরী বৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩৭.৪%, ৪৬.০% এবং ৪৪.৯%। গত কয়েক বছরে আন্তঃ-খাত ভিত্তিক মজুরী সূচকে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। ২০১১-১২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ মজুরী বৃদ্ধি ছিল নির্মাণ খাতে, বিগত বছরগুলোতে উৎপাদন খাত ও সেবা খাতের মজুরী বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। বিগত বছরের ন্যায় অন্যান্য খাতের তুলনায় উৎপাদন খাতে মজুরী বৃদ্ধি বেশী ছিল।

লেখচিত্র ৯: মজুরি সূচকে পরিবর্তন

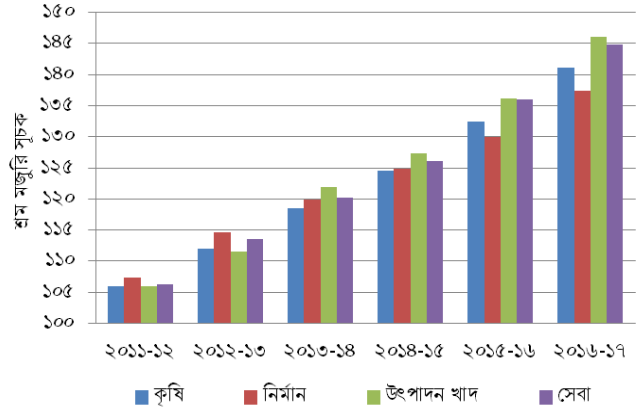

বিগত ২০০২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে বর্তমান হিসাবে কৃষি ক্ষেত্রে নামীয় (nominal) মজুরী বৃদ্ধি ধারাবাহিক-ভাবে বজায় ছিল, যা ২০১০ সালে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। গত দশকের তুলনায় কৃষি ক্ষেত্রে নামীয় (nominal) মজুরী বিগত ২০০৪-০৫ অর্থবছরের দৈনিক ৭৯ টাকা থেকে প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দৈনিক গড় ৩১২ টাকা হয়েছে। কৃষি খাতে নামীয় মজুরী গত অর্থবছরের তুলনায় ৬.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিশ্বব্যাপী খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে চাল-ভিত্তিক মজুরী হ্রাস পেয়েছিল এবং ওই সময় ছাড়া বাকি সময়ে এই মজুরী বেশ বৃদ্ধি পায় (লেখচিত্র-১০)। ডিসেম্বর ২০০৮ থেকে জুন ২০০৯ মাসের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে চাল-ভিত্তিক মজুরী বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ডিসেম্বর ২০০৫ থেকে জুন ২০১৬ মাসের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে চাল-ভিত্তিক মজুরী দুই ধাপে বেশ বৃদ্ধি পায়; প্রথম ধাপ ছিল ডিসেম্বর, ২০১২ (১১.৩ কেজি চাল) মাসে এবং দ্বিতীয় ধাপ ছিল মে-জুন, ২০১৬ (গড় ১২.৯ কেজি চাল) মাসে। ‘ ‘

লেখচিত্র ১০: কৃষি শ্রমের ক্ষেত্রে চাল-ভিত্তিক মজুরী
(মজুরী/চালের মূল্যঃ জাতীয় গড়)

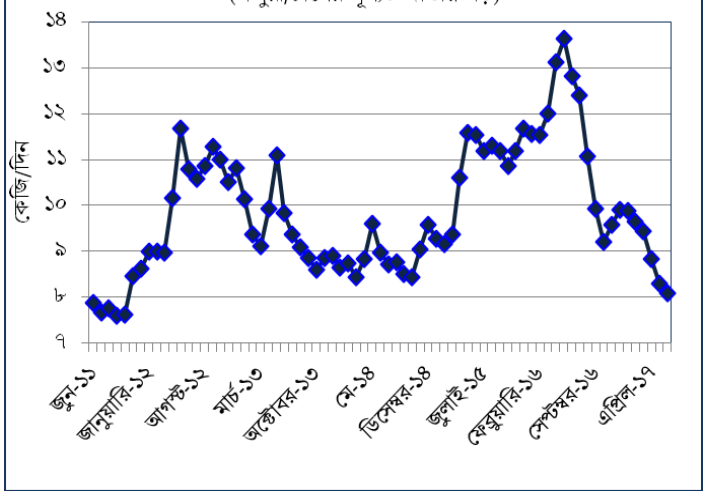

চালের ভিত্তিতে মজুরীর উচ্চ মাত্রা একটি মিশ্রিত আশীর্বাদ, কারণ চালের কম বাজারদর চাল উৎপাদনকারীদের কম লাভ দেয় এবং চাল উৎপাদনে ঋণাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। কৃষি ক্ষেত্রে মজুরীর দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চ ও নামীয় মজুরী কৃষি শ্রমিকদের কৃষি কাজে নিয়োজিত রাখে; অন্যথায় তারা নগরকেন্দ্রিক কাজের জন্য গ্রাম ছেড়ে যায়।

অব্যাহতভাবে দারিদ্র্য হার হ্রাস

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার, তীব্রতা ও গভীরতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ২০০০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার অব্যাহতভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর দারিদ্র্য হ্রাসের শতকরা হার ১.৭৪ এবং ২০০৫ থেকে ২০১০ এর মধ্যে শতকরা ১.৭২ হারে কমছে। “ “ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে প্রতিবছর দারিদ্র হার ১.২ শতাংশ করে নামিয়ে আনার বিপরীতে বাংলাদেশে প্রতিবছর দারিদ্রের হার ১.৭৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত ৮.০ এর বিপরীতে ৬.৫ অর্জন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৯.৩০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও এখনো মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রগতির সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ২০১০-এর মধ্যে অর্জিত হয়। এছাড়াও, দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রগতি ২০০০-২০১০ দশকে তুলনামূলকভাবে আগের দশকের তুলনায় বেশী ছিল। ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫ শতাংশ যা ২০১৬ সালে হ্রাস পেয়ে ২৪.৩ শতাংশ হয়েছে। পক্ষান্তরে, হত দরিদ্রের সংখ্যা ২০১০ সালের ১৭.৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ১২.৯ শতাংশ হয়েছে। নগরবাসীর দারিদ্র্যের হার (২০১০-১৬) সালের মধ্যে ২১.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৮.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে, পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার একই সময়ে ৩৫.২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৬.৪ শতাংশে দাড়িয়েছে। হত দরিদ্রের হার শহরাঞ্চলে ৭.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭.৬ শতাংশে দাড়িয়েছে। পল্লী অঞ্চলে হত দরিদ্রের সংখ্যা ২১.১ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ১৪.৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

গত এক দশকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালের ৬৩ মিলিয়ন থেকে ২০০৫ সালে ৫৫ মিলিয়ন হয় এবং ২০১০ সালে এই সংখ্যা ৪৭ মিলিয়ন এবং পরবর্তীতে ২০১৫ সালে তা ৪৩.৩ মিলিয়ন এ দাঁড়ায়। অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালের ৪৪ মিলিয়ন থেকে ২০০৫ সালে ৩৪.৬ মিলিয়নে পৌঁছেছিল এবং তা আরও হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ২৬ মিলিয়ন হয়েছিল[৩৩]। দারিদ্র্যের ব্যবধান (poverty gap) সূচক, যা দারিদ্র্যের গভীরতাকে প্রতিফলিত করে, গত দশকে তা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

দারিদ্র্যর ব্যবধান ২০০৫ সালের ৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৬.৫% হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি-১ অর্জনের ৮% লক্ষ্যমাত্রা ২০১০ সালেই অর্জিত হয় (সারণী-৪)। ২০০০ এবং ২০১০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের ধরণ উল্লেখযোগ্যভাবে অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চ দারিদ্র-রেখার হিসেব অনুযায়ী ৫ বছরের ব্যবধানে (২০০০-২০০৫ সালের মধ্যে) জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্রর হার কমেছে ৮.৯ শতাংশ (৪৮.৯ থেকে ৪০.০ শতাংশ) এ সময়ে বছরে ৩.৯ শতাংশ যৌগিক হারে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্রামীণ জনপদের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র কমেছে অধিক হারে (শহরাঞ্চল ৪.২ শতাংশ, পল্লী এলাকা ৩.৫ শতাংশ)। অন্যদিকে, পরের ৫ বছরে (২০০৫-২০১০ সালের মধ্যে) আয় দারিদ্র কমেছে ৮.৫ শতাংশ (৪০.০ থেকে ৩১.৫ শতাংশ)। দারিদ্র হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ৪.৬৭ শতাংশ। এ সময়েও দারিদ্রর হার শহরের চেয়ে পল্লী এলাকায় ধীর গতিতে হ্রাস পেয়েছে (শহরাঞ্চল ৫.৫৯ শতাংশ, পল্লী এলাকা ৪.২৮ শতাংশ) ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে[৩৪]। এইচআইইএস ২০১০ প্রতিবেদনে সরাসরি ক্যালরি গ্রহণ (ডিসিআই) পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দারিদ্র্যের কোন হিসাব দেখানো হয়নি। তবে এইচআইইএস ২০১০-এর তথ্য ব্যবহার করে করা বিশ্বব্যাংকের হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, দারিদ্র্য সীমার হার (২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণ হিসাবে) ২০০৫ সালের ৪৪.৩% (এইচআইইএস, ২০০৫) থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালের ৩৮.৪% এ নেমে আসে[৩৫]। আয়-দারিদ্র্য-ভিত্তিক পরিমাপের তুলনায় সরাসরি ক্যালরি গ্রহণ (ডিসিআই) ভিত্তিক পরিমাপিত দারিদ্র্য হ্রাসের হার অনেক শ্লথ।

বক্স-১ হত-দরিদ্র পরিবারের বন্যা মোকাবেলার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে কেস স্টাডি

তেত্রিশ বছর বয়সী জনাব মোঃ আব্দুস সালাম কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার নগরকুল গ্রামের হাওর এলাকার বাসিন্দা। সে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে ছোট খড়ের বাড়ীতে বসবাস করে। তার পিতা আলাদা ঘরে বসবাস করে, কিন্তু আব্দুস সালামের পরিবারের সাথে খাবার খায়। তার বড় ছেলে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলে পড়ে। সালামের কোন আবাদি জমি নেই। সে তার পাঁচ সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য দিনমজুরের কাজ করে। বন্যা হাওড় এলাকার একটি সাধারণ ঘটনার ফলে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ঐ এলাকা প্লাবিত থাকে। এই সময়ে সহজে কোন কাজ পাওয়া যায় না। সালাম এই সময়ে সাধারণত পারবারিক খাদ্য নিরাপত্তার তাগিদে সাময়িকভাবে পার্শ্ববর্তী উজান এলাকা কিশোরগঞ্জ বা নরসিংদীতে চলে যায়। কখনো কখনো সে প্রতিবেশী এবং দোকান থেকে টাকা বা খাদ্য ধার করে। এই সময়ে প্রতিবেলার খাবারের পরিমাণ কমানো, নিম্নমানের খাদ্য ক্রয় এবং খালি পেটে ঘুমাতে যাওয়া সংকটকাল মোকাবেলার কতিপয় কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। এমনকি সে পরিবারের সদস্যদের অসুখের সময় ঔষধ কিনতে পারেনা। সালাম আরও জানায় যে, তার স্ত্রী ও সন্তানরা প্রায়ই জ্বর এবং হাঁপানিতে ভোগে, কিন্তু তাদের জন্য ঔষধ কিনতে পারেনা। তীব্র খাদ্য এবং আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সে সরকার বা অন্যান্য সংস্থা থেকে সহায়তা পাবার আশা করে।

উৎস: রহমান, এম এইচ (২০১০)।

Source: Rahman, M. H. (2010). Ultra poor households' Flood Coping Strategies. Research done under NFPCSP, FAO, Dhaka.

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্কলিত অনুশীলনে আয় দারিদ্র্যের একটি ভিন্ন ধরণের চিত্র ফুটে উঠে। ধারণা করা যায় যে, বাৎসরিক দারিদ্র্যের নিম্নগামী প্রবণতার হার ২০০০ থেকে ২০১০ এবং ২০১৫ সালের ন্যায় বিরাজমান থাকলে, ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করে আসছে (বক্স-১)।

খাদ্য এবং সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য সামান্য হ্রাস পেয়েছে

পূর্ববর্তী বছরে খাদ্য ও সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে ব্যবধান সামান্য হ্রাসের পর তিন বছরের চলমান-গড়ের হিসাবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০.০৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে -০.২৭% হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ০.০৬% এ দাঁড়িয়েছে (সারণী-৪)। জুন ২০০৯ সালে, এ দুই সূচক খুব কাছাকাছি থাকলেও খাদ্য ও সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান পরে বৃদ্ধি পায় (লেখচিত্র-১১)। এই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান সর্বোচ্চ হয় এপ্রিল ২০১১ সালে, যখন খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪.৪%, খাদ্য বহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতি ৪% হয় এবং সাধারণ মূল্যস্ফীতি তখন ১০.৭% ছিল, ২০১১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের দিকে সকল মুদ্রাস্ফীতি প্রায় এক বিন্দুতে মিলিত হয়। অতপর প্রথমবারের মত খাদ্যের মূল্যস্ফীতি (১০.৪%) সাধারণ এবং খাদ্য-বহির্ভূত অন্যান্য মূল্যস্ফীতির তুলনায় নীচে নেমে আসে। ২০১২ সালে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি তুলনামূলকভাবে খাদ্য-বহির্ভূত এবং সাধারণ মূল্যস্ফীতির তুলনায় কম থাকলেও ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে সকল মূল্যস্ফীতি পুনরায় সমান হয়। পরবর্তীতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাধারণ মূল্যস্ফীতির উপরে থাকে এবং ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে উভয় মূল্যস্ফীতি পুনরায় সমান হয় এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত খাদ্য, খাদ্য বহির্ভূত এবং সাধারণ মূল্যস্ফীতি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল পর্যায়ে ছিল। এসব মূল্যস্ফীতি ৬% এর কিছুটা উপরে ছিল, যা সাধারণ ভোক্তার কাছে সহনীয় পর্যায়ে ছিল। পরবর্তীতে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করে জুন/১৬ তে তা ৪.২৩%-এ পৌঁছায়। একই সময়ে জুন/১৭ তে খাদ্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫১% এ দাঁড়ায়। কিন্তু খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে ৩.৬৭% দাঁড়ায়, অর্থাৎ খাদ্যের মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পায়।

লেখচিত্র ১১: পয়েন্ট টু পয়েন্ট সাধারণ, খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতি

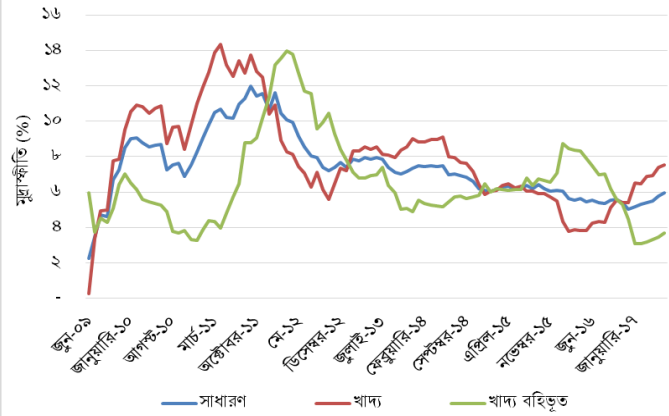

৩.৩.২ ইস্যু এবং নীতির চ্যালেঞ্জসমূহ

মানুষের খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সূচকের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে খাদ্যদ্রব্যের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে গত এক বছর সাধারণ মূল্যস্ফীতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। বিশ্বব্যাপী তেলের দাম কমায় এমন হতে পারে। দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও দেশে আরও ৪০ মিলিয়ন মানুষ এখনো দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়ে গেছে। এছাড়া আয় বৈষম্য হ্রাসে সামান্য অগ্রগতি হয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল তারা ভোগ করতে পারছে না। খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বাড়াতে, বিশেষ করে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য এমন কিছু বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা জরুরী যা নিচের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করা হল:

আয় বৈষম্য হ্রাসকরণ

দেশে মাথাপিছু আয়ের স্থির অগ্রগতি এবং সন্তোষজনকভাবে দারিদ্র্যের হার হ্রাস আয়-বৈষম্য হ্রাসে দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রভাব রাখেনি। সামগ্রিকভাবে গিনি সহগ (gini coefficient) সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালের ০.৪৫১ হতে ২০০৫ সালে ০.৪৬৭ পর্যন্ত বেড়ে ২০১০ সালে আবারও প্রান্তিকভাবে হ্রাস পেয়ে ০.৪৫৮ হয় । “ “ কার্যত: এই দশকে কোন উন্নতির প্রতিফলন ঘটেনি। শহরের তুলনায় গ্রামীণ এলাকার গিনি সহগ কম হলেও আয় বণ্টনের দিক থেকে গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞতা খারাপ, যে কারণে গিনি সহগ ২০০০ সালে ০.৩৯ থেকে ২০১০ সালে বেড়ে ০.৪৩ হয়। শহর অঞ্চলে আয়-সমতা কিছুটা উন্নত হওয়ায় ২০০০ সালে ০.৫৩ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ০.৪৫ হয়। আয়-বণ্টনের এই এলোমেলো অবস্থা আয়-বৈষম্যের অসন্তোষজনক পরিস্থিতি চিত্র প্রকাশ করে। এইচআইইএস-২০১০ সালের ফলাফলের ভিত্তিতে আয়ের দিক দিয়ে সব-থেকে ধনী ৫% পরিবারের আয় সর্বমোট আয়ের ২৪.৪%, আর সব-থেকে দরিদ্র ৫% পরিবারের আয় সর্বমোট আয়ের মাত্র ০.৭৮% (HIES)। ব্যয়ের দিক থেকে এইচআইইইএস ২০১০ সালের ফলাফলের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দৈনিক মাথাপিছু

খাবারের ব্যয়ের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, খাবারের ব্যয়ের দিক দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ ধনী জনগোষ্ঠীর তুলনায় ৪০% কম ছিল, তবে সামগ্রিক ব্যয় বৈষম্য, আয় বৈষম্যর তুলনায় অনেক কম ছিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ২০১০ সালে ব্যয়ের এর গিনি সহগ ছিল ০.৩২, যা ২০০৫ সালের (০.৩৩) থেকে কম ছিল[৩৭]। যদিও সামগ্রিকভাবে উচ্চ আয় বৈষম্য যথেষ্ট দুশ্চিন্তার ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে নীতি প্রণয়নে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আয় বৈষম্যের পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ, তাই বিশেষ দরিদ্র-বান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক।

গ্রামীণ কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে পল্লী অঞ্চলের আয়ের ৪২% ছিল কৃষি-বহির্ভূত খাতের আয় (rural nonfarm income) যা ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭% হয়েছে[৩৮]। এইচআইইএস এবং শ্রমশক্তি জরিপ (LFS)-এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৬ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে কৃষি এবং গ্রামীণ কৃষি-বহির্ভূত কার্যক্রমের কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৮% এবং ২৫.৫%। কৃষি আয়ের অংশ ২০০০ সালের ৪৯.৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৪৭.৮% হয়, অথচ একই সময় কৃষি-বহির্ভূত আয় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫০.১% থেকে ৫২.২% হয়[৩৯]। কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের উন্নয়নে যথাযথ নীতি সহায়তার প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ পরিবহন অবকাঠামোর বিস্তার, বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলি-যোগাযোগ সুবিধা অপরিহার্য। এছাড়া সহজ শর্তে ঋণের সংস্থানসহ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রসার করা গেলে গ্রামাঞ্চলে কৃষি-বহির্ভূত কার্যক্রমের দ্রুত বিস্তার সহজতর হবে। কৃষি-বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য নীতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নারী শ্রমিকদের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার, যারা সাধারণত শারীরিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিবন্ধকতায় থাকলেও শস্য কৃষি কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করছে ।

জনসাধারণের জন্য খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

খাদ্যের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় মানবাধিকার দলিলের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ অনুযায়ী (IESRC) এটা স্বীকৃত যে, সবারই পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার রয়েছে এবং ক্ষুধা থেকে মুক্ত হওয়া সবার মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে খাদ্যের অধিকার বিষয়টি একটি চমৎকার আনুষঙ্গিক আইনি ও নীতি কাঠামোর অধীনে স্বীকৃত। জাতীয় সংবিধানের ১৫ (ক) ধারায় দেশের জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা-সেবার অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নীতিতে এই বিধান অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সংবিধানের ৩২নং ধারার অধীনে মৌলিক অধিকার ব্যাখ্যায় জীবনের অধিকারসহ এটি ব্যবহার করা হয়[৪০]। খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ সরকার কতিপয় আইনি বিধান এবং প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। এই সম্পর্কিত প্রণীত আইনের মধ্যে রয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ভোজ্য তৈল আইন ২০১৩, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫। খাদ্যের অধিকার নিশ্চিতকল্পে কতিপয় বিধি সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যেমন কৃষিজাত পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪, বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (পরিদর্শন এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩, 'আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৯' এবং 'মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩।

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম একটি প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সকল সময়ে সকলের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬, খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫) এবং কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সি.আই.পি-২০১১-২০১৫) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সেক্টর-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের জন্য একটি প্রয়োজনীয় নীতি অবকাঠামো এবং কৌশলগত নির্দেশনা তৈরি করছে। অভিযোজিত নীতি বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ সকলের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের সামাজিক, শারীরিক এবং অর্থনৈতিক প্রবেশাধিকারকেই নির্দেশ করে। ভিশন-২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করে খাদ্য নীতির তিনটি দিকেই (Food Availability, Food Access, Food Utilization) টেকসইভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং পুষ্টি উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সফলভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে, যা বিশেষ করে জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করতে সহায়ক হবে। বাংলাদেশ

সরকার দেশে খাদ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ইতিবাচক মনোভাব বজায় রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তাঁর সরকার দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের জনগণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ আইনি কাঠামো বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে[৪২]। সুতরাং আশা করা যায় যে, দেশের মানুষের খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও এডভোকেসি কাজের মাধ্যমে উপযুক্ত আইনি-কাঠামো শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মৌসুমি ও জরুরী প্রয়োজন মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম সম্প্রসারণ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার জন্য সরকার ধারাবাহিকভাবে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ও সুবিধাভোগীদের ভাতা বৃদ্ধি করছে। জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৬৭.১ বিলিয়ন টাকা থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৫৯.৭ বিলিয়ন টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪০৮.৬ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ হিসাবে জাতীয় বাজেট ও জিডিপি-এর অনুপাতে এই খাতে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে (কর্মসূচি-৯)। খাদ্য কর্মসূচি প্রণয়নে বিশেষ করে দুর্যোগকালীন সময়ে সঠিকভাবে উপযুক্ত সরবরাহ পরিবহন অবকাঠামোর মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছানোর গুরুত্ব বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন[৪৩]। ঘন ঘন বন্যা এবং নদী ভাঙ্গন এবং ঘূর্ণিঝড়ের ফলে কোন কোন এলাকায় খাদ্য প্রাপ্তিতে অসুবিধা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জোয়ার-ভাটার কারণে দক্ষিণাঞ্চলের কিছু এলাকা বেশ কিছু সময়ের জন্য জলমগ্ন থাকে। এই ধরণের প্রতিকূল ঘটনা মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন এবং স্বল্পমেয়াদী নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বা উভয় ধরণের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ

সরকার একটি সর্বাঙ্গীণ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)[৪৪] প্রণয়ন করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার নিমিত্ত কর্মসংস্থান নীতি এবং সামাজিক বীমাকে অন্তর্ভুক্ত করে সংকীর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে বৃহত্তর সামাজিক নিরাপত্তা সম্ভাবনা গঠনের লক্ষ্যে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতীয় বাজেটে বর্তমানে ১৪৫টি কার্যক্রম রয়েছে যা সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় অর্থায়ন হয়। গ্রাম ও শহরে সমাজের মাঝে বিরাজমান আয় বৈষম্য হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ তথা ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে হত-দরিদ্রদের জন্য "খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি" চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০ লাখ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারকে বছরে কর্মাভাবকালীন দুই প্রান্তিকে যথা: সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল মোট ০৫ (পাঁচ) মাসব্যাপী প্রতি-কেজি চাল ১০/- টাকায় প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। দারিদ্র সূচকের ভিত্তিতে উপজেলা-ওয়ারী চিহ্নিত অতি-দরিদ্র পরিবারগুলোকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিছু কার্যক্রমে সুবিধা-গ্রহীতার সংখ্যা এবং কার্যক্রমের ব্যাপ্তি যথেষ্ট সীমিত।

অগ্রাধিকার-ভিত্তিক ক্ষুদ্র কর্মসূচিগুলোকে পুনর্গঠিত ও জীবনমুখী করার মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল শক্তিশালী হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি ধীরে ধীরে অবশ্যই অর্জিত হবে এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণ করার মাধ্যমে গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সরকার অধিকাংশ খাদ্য-নির্ভর কর্মসূচিসমূহকে অর্থ-নির্ভর কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হবে। তবে, দুর্যোগ-কালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে 'সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় সরকারি খাদ্য হস্তান্তর' এবং চলমান 'খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস)' কর্মসূচিতে সরকারি খাদ্য বিতরণ অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জরুরী মুহূর্তের চাহিদা পূরণে বৃহৎ ও টেকসই খাদ্যের মজুদ গড়ে তোলার জন্য সরকার বৃহৎ সাইলো নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্য নিরাপত্তাসহ সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) নেয়া হয়েছিল, এজন্য সামগ্রিক নির্ভরশীল খাদ্য ভিত্তিক কার্যক্রমের বাইরেও অতি-সতর্ক কৌশল নিতে হবে । খাদ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য সংকট মোকাবেলায় ওএমএস কার্যক্রম এবং খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং এ কার্যক্রমকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে।

৩.৪. জাতীয় খাদ্য নীতি উদ্দেশ্য-৩: ফলাফল (NFP Objective III: Outcomes)

জাতীয় খাদ্য নীতির তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম তথা তৃতীয় উদ্দেশ্য হল 'সকলের, বিশেষ করে নারী ও শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা'। এই উদ্দেশ্যের অগ্রগতি 'খাদ্যশস্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি (ক্যালরি) সরবরাহ ও গ্রহণ', 'মহিলাদের মাঝে দীর্ঘমেয়াদী খাদ্যশক্তির ঘাটতি', 'ন্যূনতম খাদ্য গ্রহণকারী শিশুদের অনুপাত' এবং 'আয়োডিন ও আয়রনসহ অণুপুষ্টির অবস্থার উন্নতি' প্রভৃতি সূচকসমূহ থেকে নির্ধারণ করা যায় (সারণী-৫)। পুষ্টি সংক্রান্ত অন্যান্য সূচকের অবস্থা এই প্রতিবেদনের অন্য অংশে লিপিবদ্ধ আছে; বিশেষত: শিশুর ওজন স্বল্পতা ও খর্বতার হার জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য ৩.১ ও কৃশকায়তার হার বিষয়টি কর্মসূচি ১০-এ বর্ণিত হয়েছে।

৩.৪.১. মূল্যায়ন

সারণী -৫ : জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য ৩-এর নির্দিষ্ট কিছু পারঙ্গমতার সূচকসমূহ

সিআইপি/জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার ফলাফল সূচক	২০০৭-২০০৮	২০০৯-২০১০	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা	উৎস
জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্য থেকে খাদ্য-শক্তি সরবরাহের শতকরা হার (%)	৭৮.১ (২০০৫-০৭)	৭৮.৩ (২০০৭-০৯)	৭৬.৩০ (২০১১-১৩)	-	-	৬০ (অনুমোদিত) 🔴	এফএও
জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্য থেকে খাদ্য-শক্তি গ্রহণের শতকরা হার (%)	৭৩.০ (২০০৫)	৭০ (২০১০)	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৬০.৪ (২০১৬)	৬০ (অনুমোদিত) 🔴	বিবিএস, এইচআইইএস
মহিলাদের মধ্যে তীব্র খাদ্যশক্তির ঘাটতি জনিত হার (বিএমআই <১৮.৫) (%)	৩৩.০	প্রযোজ্য নয়	১৭ এসএফএসএন রিপোর্ট	১৬ এসএফএসএন রিপোর্ট	*তথ্য নেই*	২০ ২০১৫ সালের মধ্যে 🟢	বিডিএইচএস, এসএফএস এন রিপোর্ট
ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণকারী ৬ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের শতকরা হার (%)	৪২	৩৮	৩৯ এসএফএসএন রিপোর্ট	৩৩ এসএফএসএন রিপোর্ট	*তথ্য নেই*	৫২ 🔴 ২০১৬ এর মধ্যে (এইচপিএন এসডিপি-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)	বিডিএইচএস, এসএফএস এন রিপোর্ট
আয়োডিন-যুক্ত লবণ (কমপক্ষে ৫ পিপিএম) গ্রহণকারী পরিবারের শতকরা হার (%)	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৮১ (বিসিক)	৮১ (বিসিক)	৮১ (বিসিক)	১০০ 🔴	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়

রঙ্গিন নির্দেশক সূচকের অর্জনের অবস্থা নির্দেশ করে -

🟢 অর্জিত 🟡 অগ্রগতি চলমান 🔴 অগ্রগতি নাই

খাদ্যশস্য থেকে খাদ্য-শক্তির সরবরাহ হ্রাস

খাদ্যশস্য থেকে প্রাপ্ত খাদ্য-শক্তির সরবরাহ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৭৮.১% থেকে ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৭% এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭৬.৩% হয়েছে (সারণী-৫)। সাম্প্রতিক সময়ে পর্যাপ্ত খাদ্য-শক্তি ও বহুমুখী খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য-শক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে । খাদ্য বৈচিত্র্য শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নয়; টেকসই পরিবেশ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতার জন্যও সমভাবে প্রয়োজন।

খাদ্য বৈচিত্র্যের উন্নতি

খাদ্যশস্য থেকে খাদ্য-শক্তি গ্রহণের উপাত্ত এইচআইইএস-২০১৬ থেকে নেয়া হয়েছে এবং এই সূচকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখন খাদ্যশস্য থেকে খাদ্য-শক্তি গ্রহণের হার ২০১০ সনে ৭০% থেকে কমে ২০১৬ সনে ৬০.৪% হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য গ্রহণে খাদ্য বৈচিত্র্যের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সনে প্রকাশিত 'স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি এন্ড নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ (এসএফএসএন)' প্রতিবেদনে মহিলাদের খাদ্য-বৈচিত্র্য স্কোর বা মান[৪৫] বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালে এই মান ৪.৩ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৪.৪ হয়েছিল, তবে ২০১৫ সনে তা সামান্য হ্রাস

পেয়ে ৪.১ হয়েছে। সামষ্টিক-পুষ্টি উপাদান এবং অণুপুষ্টি উপাদানের গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ খাদ্য-গ্রুপ (আমিষ ও চর্বি) ছাড়াও স্বাভাবিক খাদ্য হিসেবে আঁশ ও এন্টি-অক্সিডেন্ট জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অন্যান্য উপাদানও বিবেচনায় নিতে হয়।

মহিলাদের দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য-শক্তি ঘাটতি হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি অধিক ওজনের হার বৃদ্ধি

দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য-শক্তি ঘাটতি বলতে অনেক বছর বা মাসব্যাপী প্রয়োজনীয় শক্তির তুলনায় কম খাদ্য-শক্তি গ্রহণকে বুঝায়। এসএফএসএন-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী মহিলাদের দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য-শক্তি ঘাটতির হার ২০১১ সালে ২২% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩ সনে ১৭% হয়, যা ২০১৪ সনে অপরিবর্তিত থাকে। ২০১৫ সালে তা আরও হ্রাস পেয়ে ১৬% হয়েছে। অন্যদিকে ওজনাধিক্যের হার (বিএমআই > ২৩.০) ২০১১ সালে ৩০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৩৯% হয়, যা ২০১৪ সালেও অপরিবর্তিত থাকে। ২০১৫ সালে তা আবারও বৃদ্ধি পেয়ে ৪১% এ উন্নীত হয়েছে (লেখচিত্র-১২)। বিডিএইচএস রিপোর্ট অনুযায়ী মহিলাদের স্বল্প ওজন বা দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য-শক্তি ঘাটতি (Chronic Energy Deficiency or CED)-এর হার (বিএমআই <১৮.৫) ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩৩% ছিল, যা হ্রাস পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৯% হয় এবং ২০১৪ সালেই দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য-শক্তি ঘাটতির জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় (সারণী-৫)। শিশুর জন্মের সময় ওজন স্বল্পতার হার, যা পূর্ণবয়সে অসংক্রামক রোগের কারণস্বরূপ, উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো প্রয়োজন। অপুষ্টি ও অধিক পুষ্টির সহাবস্থান অসংক্রামক রোগের ঝুঁকির কতটা কারণ হতে পারে, তা আরও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করে জমাকৃত চর্বি দেহের পরিপাক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, সে কারণে পেটের পরিধি (abdominal circumference) বা কোমর ও কটির অনুপাত (waist and hip ratio) হৃদরোগের ঝুঁকি, টাইপ-।। বহুমূত্র রোগ এবং মেটাবলিক সিন্ড্রোম নির্ণয়ে বিএমআই-এর তুলনায় বেশী সঠিক। মায়েদের ওজন স্বল্পতার হার হ্রাস পেলেও ওজনাধিক্যের হারের দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি উদ্বেগের বিষয়, যা মায়েদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। উল্লেখ্য, ওজনাধিক্যের হার ২০০৪ এর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।

লেখচিত্র ১২ - ২০০৪-২০১৫ সময়ে বিবাহিত মহিলাদের পুষ্টি চিত্র

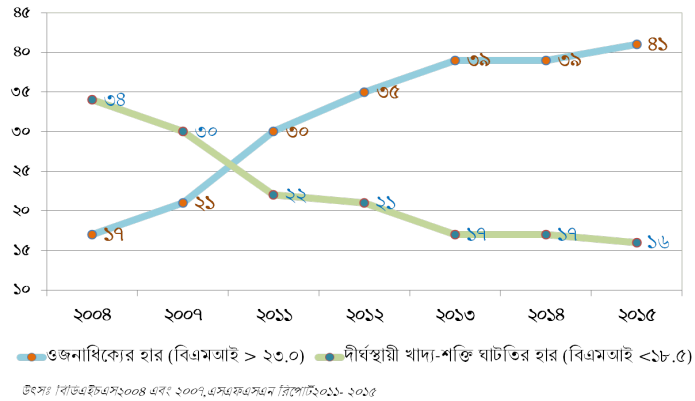

উৎস: বিডিএইচএস২০০৪ এবং ২০০৭,এসএফএসএন রিপোর্ট২০১১- ২০১৫

শিশুদের ন্যূনতম খাদ্য গ্রহণের হার সামান্য হ্রাস

শিশুদের জীবন রক্ষা, বৃদ্ধি ও বিকাশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিশুদের খাওয়ানোর বিষয়টি অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখে। শিশুদের জীবনের প্রথম দুই বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে রোগের উপসর্গ (morbidity) ও মৃত্যুহার কমায়, দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ত্বরান্বিত করে। পরিপূরক খাদ্যের বৈচিত্র্য ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি অবস্থা উন্নত করে, যদি তাদেরকে প্রতিদিন ৭টি খাদ্য গ্রুপের মধ্যে থেকে কমপক্ষে ৪ টি খাদ্য খাওয়ানো হয়, যার মধ্যে একটি প্রাণিজ উৎসের এবং অণুপুষ্টি সম্পন্ন খাদ্য যেমন; শাক-সবজি ও ফল-মূল খাওয়ানো হয়[৪৬]। এসএফএসএন প্রতিবেদন এর উপাত্ত অনুযায়ী দেশে ৬ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুর ন্যূনতম খাদ্য গ্রহণের হার ২০১৪ সালে ৩৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ৩৩% হয়েছে। ৬ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুর ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য গ্রহণের হার বিডিএইচএস ২০১১ অনুযায়ী ২১%, ইউইএসডি ২০১৩ অনুযায়ী ৩২% এবং বিডিএইচএস ২০১৪ অনুযায়ী ২৩% ছিল। বিডিএইচএস ২০১৪ অনুযায়ী এই হার ২০১১ এর তুলনায় মাত্র ২% বৃদ্ধি পায়[৪৭]। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিশু-খাদ্য গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬ সালের মধ্যে ৫২% ছিল, যা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। যদিও শিশু খাদ্যের কৌশল ও কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার এবং কমিউনিটি-পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অণুপুষ্টি উপাদানের অভাব: আয়োডিন যুক্ত লবণ গ্রহণের হারে স্থিতাবস্থা

প্রতিটি নবজাতককে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত মস্তিষ্কের ক্ষতি (damage) থেকে রক্ষার জন্য সার্বজনীন লবণ আয়োডাইজেশন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে গৃহ-পর্যায়ে আয়োডিন-যুক্ত লবণ (>=৫ পিপিএম) গ্রহণের হার বিসিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৮১% এ স্থির রয়েছে (সারণী-৫)। বিডিএইচএস এর প্রতিবেদন অনুযায়ী আয়োডিন-যুক্ত লবণ গ্রহণের হার ২০১১[৪৮] সালে ৮২% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩[৪৯] সালে ৮০% (ইউইএসডি প্রতিবেদন) হয়। এছাড়া এসএফএসএন প্রতিবেদন ২০১৫ এর উপাত্ত অনুযায়ী আয়োডিন-যুক্ত লবণ গ্রহণের হার ৭২%। পর্যাপ্ত পরিমাণে (>=১৫ পিপিএম) আয়োডিন-যুক্ত লবণ খাওয়ার পরিমাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে (>=১৫ পিপিএম) আয়োডিন-যুক্ত লবণ খাওয়ার হার ২০১৩ সালে ছিল ৫৭.৬%। বিসিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে ৩০৫টি লবণ শোধনাগারের মধ্যে ২০০টি লবণ আয়োডাইজেশন কারখানাকে উন্নত (upgrade) করা হয়েছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত ইউনিসেফের মাধ্যমে বিনামূল্যে পটাশিয়াম আয়োডেটের সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে লবণ মিল মালিকগণ ভ্যাট ব্যতীত ৪,৭০০ টাকা কেজি দরে পটাশিয়াম আয়োডাইটের সম্পূর্ণ খরচই বহন করছে। আয়োডিন-যুক্ত লবণের বিপণন কার্যক্রম এবং গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং মনিটরিং এর জন্য বর্তমানে ৩টি কমিটি রয়েছে, যেমন- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় লবণ কমিটি, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা লবণ কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা লবণ কমিটি।

রক্ত-স্বল্পতা প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ এখনো অগ্রাধিকার

ঋতুবতী মহিলাদের হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব ও আয়রনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং রক্ত-স্বল্পতা কমাতে আয়রন এবং ফলিক-এসিড সাপ্লিমেন্টেশনকে জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি সুপারিশকৃত কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে ফলিক-এসিড প্রদানের মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ শিশুদেরকে রক্ত-স্বল্পতা[৫০] ও নিউরাল টিউব ডিফেক্ট-এর মারাত্মক ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা যায়। এখানে লক্ষণীয় যে, সচেতনতার অভাব, আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেটের অপর্যাপ্ত প্রাপ্যতা এবং পরিমাণে কম খাওয়ার কারণে আয়রন-ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশনের সফলতা কম। এসএফএসএন ২০১৫ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৯% নারীদের গর্ভাবস্থার শেষাংশে আয়রন-ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট গ্রহণ করে, সব থেকে বেশি পরিমাণ (৪৯%) আয়রন-ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট গ্রহণ করে গর্ভাবস্থার দ্বিতীয়াংশে, অন্যদিকে গর্ভাবস্থার প্রথমাংশে সবথেকে কম পরিমাণে (১৫%)আয়রন-ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট গ্রহণ করে। নিরাপদ খাদ্য, স্বাস্থ্য বিধি এবং স্যানিটেশন এখনো চ্যালেঞ্জ। খাদ্য সচেতনতা ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য, স্বাস্থ্য বিধি এবং স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা (স্যানিটেশন) সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পুষ্টির উপর প্রভাব ফেলে। নিরাপদ খাদ্য ও পানি, দুর্বল স্বাস্থ্য বিধি অনুশীলন, অনিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ এবং খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণ এখনো চ্যালেঞ্জ যা মোকাবেলায় গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল এবং সাব-ক্লিনিক্যাল ব্যাপার যেমন-আন্ত্রীয় (enteric) এবং শ্বাস-জনিত সংক্রমণ এবং ম্যালেরিয়াকে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

৩.৪.২. ইস্যু এবং নীতি চ্যালেঞ্জসমূহ

জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ অনুমোদিত হওয়ার পর, বিভিন্ন খাতের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (NPAN)(২০১৬-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য চলমান উদ্যোগ যেমন- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ও এর কর্মপরিকল্পনা এবং হালনাগাদ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জসমূহকে টেকসইভাবে মোকাবেলা করতে পারে। এখানে কর্মরত মহিলাদের বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত মহিলাদের পুষ্টিগত অবস্থা বিবেচনায় নেয়ার জন্য বিশেষ নীতি প্রয়োজন। মাতৃত্ব-কালীন ছুটির আওতায় যেখানে সরকারী পর্যায়ে চাকুরীরত মহিলারা পূর্ণ বেতনে ৬ মাস মাতৃত্ব-কালীন ছুটি ভোগ করতে পারলেও তৈরি পোশাক খাতসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মহিলারা পূর্ণ বেতনে এই ছুটি ভোগ করতে পারছেন না।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী খর্বতার হার হ্রাসকরণ

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে খর্বতার হার ৪০% হ্রাস করতে হবে। ২য় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে এই হার ২৫% এ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে যে হারে খর্বতা হ্রাস পাচ্ছে সে হার অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর এই সূচকে সাফল্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজন পুষ্টি-সেবার ব্যাপ্তি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার পুষ্টি-কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমন্বিত প্রয়াস।

খাদ্য-ভিত্তিক কর্মসূচির কৌশলের মাধ্যমে অণুপুষ্টির ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ

টেকসই খাদ্য-ভিত্তিক পদ্ধতির অংশ হিসেবে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য, বিশেষ করে প্রাণিজ উৎসের খাদ্য,পত্র-বহুল শাক-সবজি এবং ফল গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা উচিত, যা কৃষি সম্প্রসারণের আওতায় পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। সঠিক খাদ্য প্রস্তুতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ কৌশলকে সম্প্রসারণ সেবার সাথে সমন্বয় করা উচিত, যা বিপণন ব্যবস্থার সাথেও যুক্ত থাকতে পারে। বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে জাতীয় অণুপুষ্টি ঘাটতি নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল ২০১৫-২০২৪ প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলের উদ্দেশ্য হল ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অণুপুষ্টি ঘাটতি নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মপন্থা ও কার্যক্রমের নির্দেশনা প্রদান করা। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য দেশব্যাপী অণুপুষ্টি ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন। টার্গেট গ্রুপের জন্য আয়রন-ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন এর কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যার সাথে অণুপুষ্টি পরিবীক্ষণ সংযোজিত হতে পারে। সার্বিকভাবে টেকসই খাদ্য-ভিত্তিক কৌশল গ্রহণ করা উচিত, যার মাধ্যমে দেশের সকল জনগণ, বিশেষ করে শহর ও গ্রামের মানুষের বৈচিত্র্যময় খাদ্য গ্রহণ ত্বরান্বিত হবে।

২য় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয় পুনর্গঠন

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এ বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কার্যকর পুনর্গঠন এবং অপারেশনাল করার উপর নির্ভর করছে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা মনিটরিং এর কাজ। এছাড়া এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থায়ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে পুষ্টি সংবেদনশীল এবং পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

পুষ্টি সংবেদনশীল কার্যক্রম এবং পুষ্টি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন

জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা-তে পুষ্টি সংবেদনশীল ও পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট উভয় ধরণের পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। খাত-ভিত্তিক নীতিসমূহ-খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন একটি কার্যকর সমন্বয় প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সাধারণ ফলাফল কাঠামোর ভিত্তিতে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নতি পরিবীক্ষণ করা সম্ভব। সমন্বিত মনিটরিং কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন পুষ্টি খাতের পুষ্টি কার্যক্রমের বা সংবেদনশীল এবং পুষ্টি সুনির্দিষ্ট সেবায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি (tool), সামগ্রী ও বার্তাসমূহের মধ্যে অভিন্নতা এবং সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। এছাড়া, পুষ্টি সংবেদনশীল এবং পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন।

খাদ্য-ভিত্তিক ব্যবস্থাতে নীতি সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক যেমন কৃষি উৎপাদন, বিপণন এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা, ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা এবং চাহিদার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। খাদ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল স্তরে সাধ্যমত পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া খাদ্য ব্যবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদনশীলতা টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে আরও শক্তিশালী প্রমাণ-ভিত্তিক গবেষণা থাকা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে এই পরিবর্তনকে পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকর-ভাবে কাজে লাগানো যায়।

খাদ্য-বৈচিত্র্য এবং পুষ্টি নিশ্চিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

বৈচিত্র্যময় খাদ্য যেমন বিভিন্ন ধরণের দানা শস্য, ডাল, শিম এবং মটর, পাতা সবজি বা শাক এবং অন্যান্য সবজি, ফল এবং প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের মাধ্যমে শক্তি ও পুষ্টি উপাদানের চাহিদা মেটানো ছাড়াও খাদ্য বৈচিত্র্যের অনেক উপকারিতা পাওয়া যায়। তাই খাদ্য বৈচিত্র্যের সাথে কৃষি বৈচিত্র্যের যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। আন্তঃ-জনসংযোগ, গ্রুপ সভা, গর্ভবতী ও প্রসূতি সেবা, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং কৃষকদের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে খাদ্য বৈচিত্র্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়াও খাদ্য বিষয়ে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে (টেলিভিশন, বেতার, সংবাদপত্র, ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, মোবাইল প্রভৃতি) এর সহায়তায় দেশব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।

শিশুদের খাদ্য সেবনসহ জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রম কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সেবা-ভিত্তিক কাজ করছে, যার মধ্যে শিশুদের তীব্র অপুষ্টি নিরাময় কর্মসূচি, ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো, কৃমিনাশক ট্যাবলেট এবং আয়রন-ফোলেট ট্যাবলেট বিতরণ, এন্টিনেটাল কেয়ার প্রদান এবং গর্ভবতী মায়েদের পরামর্শ প্রদান উল্লেখযোগ্য। তাঁরা প্রসূতি মাদেরকে শিশুদের খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তরের কর্মীবৃন্দ ও কমিউনিটি ক্লিনিক উভয়ই এই সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষিত কর্মী দ্বারা সেবা সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি সেবার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

অসংক্রামক রোগের নিবারণ এবং নিয়ন্ত্রণ

হৃদরোগ, ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট রোগ, ডায়াবেটিস প্রভৃতি অসংক্রামক রোগ বাংলাদেশে মৃত্যু হারে সব থেকে বড় ভূমিকা রাখে। ফলে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত ও সমন্বিত কর্মসূচি। অসংক্রামক রোগ মানব এবং সমাজ উন্নয়নে যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই সব রোগের কারণে অকাল মৃত্যুতে উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং জনগণ দরিদ্র হয়ে পড়ে। কার্যকর কর্মসূচির মাধ্যমে এই সকল রোগ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব যদি এসব রোগের ঝুঁকি যেমন: তামাক ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং দৈহিক নিষ্ক্রিয়তা মোকাবেলা করা যায়। এইসব রোগের প্রাদুর্ভাব এবং স্বাস্থ্য সেবার খরচ হ্রাসের জন্য অসংক্রামক রোগ নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলসমূহের উন্নতিকরণ এবং বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকলের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে এবং নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ সালে অনুমোদিত হয় এবং এই আইনের আওতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় লোকবল ও অবকাঠামো নিয়ে গঠন করা হয়। সরকার এই আইন ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর করেছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)-এর আওতায় নিরাপদ ও মান সম্মত খাদ্য নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে (কর্মসূচি ১২)। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রবিধানমালার প্রণয়ন করা হয়েছে: (১) খাদ্যের নমুনা গ্রহণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭; (২) খাদ্যের দূষক, টক্সিন ও অবশিষ্টাংশ প্রবিধানমালা, ২০১৭; (৩)খাদ্য সংযোজক দ্রব্য প্রবিধানমালা, ২০১৭; (৪) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭। এছাড়া, ১) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৭ এবং ২) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কারিগরি কমিটি) গঠন বিধিমালা, ২০১৭; ৩) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রবিধানমালা, ২০১৭ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সকল বিধিমালা ও প্রবিধানমালা চূড়ান্ত হওয়ার পর নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে বলে আশা করা যায়।

শিশু অপুষ্টি দূরীকরণে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশনকে অগ্রাধিকার প্রদান

শিশু অপুষ্টি বিশেষ করে শিশু খর্বতার অন্যতম নির্ধারক হিসেবে দুর্বল স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে গণ্য করা হয়, যার ফলে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন, যাতে সব মানুষের কাছে স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছানো যায়। নিরাপদ পানি সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানে এবং শহর এলাকায় গৃহ পর্যায়ে পাইপের সাহায্যে শোধিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ এলাকায় টিউবওয়েল থেকে নিরাপদ পানি সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, পানি বহন, শোধন এবং সংরক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য বিধি সচেতনতার ফলে মুক্ত জায়গায় মলত্যাগের অভ্যাস পরিহার করে স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা ব্যবহার এবং মহিলাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার মত বিষয় সামাজিক নিয়মে পরিণত হচ্ছে। বিসিসি কৌশলকে শক্তিশালীকরণ করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি, তথা খাদ্য-গ্রহণের পূর্বে, খাদ্য-গ্রহণ ও মলত্যাগের পরে ভালভাবে হাত ধৌতকরণ অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, যা রোগের প্রাদুর্ভাবকে অনেকাংশে হ্রাস করে।

জাতীয় পুষ্টি জরিপ পরিচালনা করে উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন

জাতীয় পুষ্টি জরিপ পরিচালনা করে বিভিন্ন বয়সের মানুষের ব্যক্তিগত খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়, যা বিবিএস-এর 'গৃহ-পর্যায়ে আয়-ব্যয় জরিপ (HIES)' থেকে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি উপাদান গ্রহণের উপাত্ত খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নীতি এবং এই সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে সঠিকভাবে খাদ্য ও পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট জাতীয় পুষ্টি জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এই জরিপ কাজ সম্পন্ন করতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

৪. খাদ্য লভ্যতা: সিআইপি ও জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার ফলাফলের অগ্রগতি

খাদ্য লভ্যতা বিষয়টি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি)- এর কর্মসূচি- ১ থেকে কর্মসূচি -৫ সমূহে আলোচিত হয়েছে। খাদ্য লভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল - টেকসই ও বহুমুখী কৃষি, উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন উপকরণ ও মাটির উর্বরতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন। এই কর্মসূচিগুলো জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার ২৬টি কার্যপরিধির মধ্যে ৭টি কার্যপরিধির (Area of Intervention -AoI) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং জাতীয় খাদ্য নীতি-এর কর্মপরিকল্পনা-ভুক্ত প্রতিটি কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে আলোচনা করা হল।

৪.১. কর্মসূচি ১ - নিবিড় গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিকে টেকসই ও বহুমুখীকরণ

রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি)-এর কর্মসূচি-১ মূলত: নিবিড় গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে শস্যের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কলাকৌশলের উপর আলোকপাত করে। এই কর্মসূচিটি জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার চারটি কার্যপরিধিকে বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে; যথা: ১.১: গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম, ১.৪: ফসলের জন্য কৃষি বহুমুখীকরণ, ১.৯: পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ২.১: কৃষি বিষয়ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ।

৪.১.১. কর্মসূচি ১-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি:

সারণী-৬: সিআইপি কর্মসূচি ১ এর অর্জনের অগ্রগতি

সিআইপি/এনএফপি-পিওএ ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী নির্দেশকসমূহ		*২০০৭-২০০৮*	*২০০৯-২০১০*	*২০১৪-২০১৫*	*২০১৫-২০১৬*	*২০১৬-২০১৭*	*উৎস*
সরকারি সংস্থাগুলো কর্তৃক অবমুক্ত-কৃত নতুন ধানের জাতের সংখ্যা		৩	৯	৯	১০	৬	(ব্রি ও বিনা)
সরকারি সংস্থাগুলো কর্তৃক অবমুক্তকৃত অন্যান্য ফসলের জাত সংখ্যা	গম	০	২	০	০	**৩**	কৃষি মন্ত্রণালয় (বিনা ও বারি)[৫১]
	ভুট্টা	২	০	২	**২**	**২**	
	আলু	৩	১৫	১০	**৬**	**৬**	
	ডাল	০	২	৬	**৫**	**৫**	
	সবজি	৫	৬	৭	**৮**	**৮**	
	তৈলবীজ*	০	৩	২	**১**	**১**	
	ফল	১	৪	১	**৫**	**৫**	
ডিএই কর্তৃক টেকসই কৃষিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা (লাখ)		১০.৪৫	১৩.৩৪	১৬.৩৬	১৫.৭৭	১৫.৪৫	ডিএই
মোট আবাদযোগ্য জমির মধ্য ধানি জমির শতকরা হার		৭৬.২%	৭৮.৫%	৭৪.৯%	৭৩.৭%	তথ্য নেই	বিবিএস
মোট ধানের জমির মধ্যে উচ্চ-ফলন শীল (হাইব্রিডসহ) জাতের ধান আবাদের পরিমাণের শতকরা হার		৭৯.৯%	৭৯.৪%	৮৪.৫%	৮৫.১%	৮৫.২%	বিবিএস
বার্ষিক শস্য উৎপাদনের পরিবর্তন (%)	ধান	৫.৯	২.১	১.০	০	-২.৬	বিবিএস
	গম	১৪.৫	৬.১	৩.৫	০	-২.৭	
	ভুট্টা	৪৯.৭	২১.৬	৭.০	৭.৭	২৩.৭	
	আলু	২৮.৭	৫০.৫	৩.৪	২.৩৮	৭.৮	
	ডাল	-২১.০	১২.৫	৭.৬	০	২.৫	
	বেগুন	১.৫	১.১	১.৪	৫.৫	৬.৫	
	কুমড়া	৪.৬	৪.৩	১৩.৬	৪.৫	১.২	
	শিম	-০.১	০.২	১০.৯	৫.৭	৬.৬	
	লাল শাক	১০.১	৬.৬	১১.০	৪.০	-০.৭	
	ভোজ্য তৈলবীজ*	১১.৪	১১.৯	৯.৭	১.৮	১.২	
	কলা	-১২.৭	-২.১	০.৯	২.৬	১.১	
	পেয়ারা	-০.৩	১৩.১	১.৯	৪.৬	৭.০	
	আম	৪.৭	১.৭	২.৬	১৪.০	১০.৯	
	আনারস	-১১.৮	২.৩	-০.৭	২.৭	৫.৪	
	কাঁঠাল	৫.৪	৩.১	৫.৬	-২.৮	১.৮	

* তিল, রাই, সরিষা, বাদাম ও সয়াবিন

ধান, আলু ও সবজির নতুন জাতের অবমুক্তি বৃদ্ধি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ছয়টি নতুন ধানের জাত অবমুক্ত হয়েছে; এর মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি) কর্তৃক পাঁচটি ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি জাত। নতুন জাতের উল্লেখযোগ্য ধরণগুলো হল; ব্রি ধান-৭৮ (লবণাক্ততা সহনশীল)), ব্রি ধান-৭৯ (জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল), ব্রি ধান-৮০ (সুগন্ধযুক্ত), ব্রি হাইব্রিড ধান-৫(ফলন ৮.৫-৯ টন/হেক্টর) ও ব্রি হাইব্রিড ধান-৬ (ফলন ৬-৬.৫ টন/হেক্টর)। ব্রি উদ্ভাবিত নতুন পাঁচটি জাতের মধ্যে একটি (ব্রি-হাইব্রিড ধান-৬) বোরো মৌসুমে অপর চারটি আমন মৌসুমে আবাদের উপযোগী। এছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিনা কর্তৃক আউশ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী নেরিকা মিউট্যান্ট একটি ধানের জাত (বিনা-ধান-১৯) অবমুক্ত হয়েছে। বিনা-ধান-১৯ জাতটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল খরা সহনশীল , পাহাড়ি এলাকায় আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর ও সরাসরি বপণযোগ্য, এ জাতের ধানের গড় ফলন ৫.১৬ টন/হেক্টর । জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত মোট ৮৫টি জাতের মধ্যে ৭৯টি ইনব্রিড ও ৬টি হাইব্রিড। মৌসুমি চাষ উপযোগিতার বিবেচনায় রোপা আমন মৌসুমের জন্য ৪১টি, বোরো মৌসুমের জন্য ৩৪টি, রোপা আউশ মৌসুমের জন্য ৪টি, বোনা আউশ মৌসুমের জন্য ৬টি, আউশ মৌসুমে বোরো-জাত আউশের ১১টি জাত রয়েছে। ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রতিকূল পরিবেশে সহিষ্ণু ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ৭৬টি ইনব্রিড[৫২] জাতের মধ্যে ১০টি লবণাক্ততা সহিষ্ণু, ৪টি জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, ২ টি ঠান্ডাসহনশীল, ৩টি খরা সহিষ্ণু, ৪টি জিংক সমৃদ্ধ, ৭টি সুগন্ধি চাল এবং ১টি সরু-বালাম ধানের জাত এবং বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৮টি নতুন ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ২৬টি খাদ্য ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে গমের ২ টি ,ভুট্টার ২টি, আলুর ৬টি, ডালের ৩টি, সবজির ৮টি এবং ফলের ৫টি নতুন জাত রয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৩টি খাদ্য ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে গমের ১ টি, ডালের ২টি এবং ভোজ্য তৈলবীজের ১ টি নতুন জাত রয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বারি ও বিনা কর্তৃক খাদ্য ফসলের জাত উদ্ভাবন পূর্বের বছরের তুলনায় ২টি হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও, জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS), ব্র্যাক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)[৫৩] নতুন জাত উদ্ভাবনে তৎপর রয়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ সেবা অব্যাহত

সম্প্রসারণ কাজে সরকারি সংস্থা ছাড়াও বেসরকারি সংস্থা, বাণিজ্যিক সংস্থা, কৃষি-পণ্য সরবরাহকারী সংস্থা কৃষকদের সহায়তা করে থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সারাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে [৫৪]। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫.৪৫ লাখ, যার মধ্যে নারী কৃষকের হার ছিল ২৫%[৫৫]। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রায় ৪৫ হাজার কৃষক বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম সম্পর্কিত মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৭.০০ লাখ কৃষক বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

লেখচিত্র ১৩: মোট ফসলী জমির মধ্যে ধানের জমি ও মোট জমির মধ্যে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের জমির হার (%)

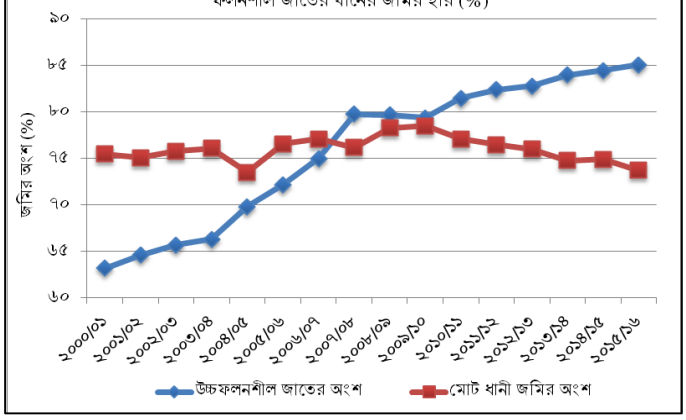

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির হস্তান্তর বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ সেবা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৮.০০ লাখ কৃষক আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণ করেছে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ১০.০০ লাখ কৃষক বিভিন্ন মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ ও প্রায় ১.২০ লাখ কৃষক "কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (এফআইএসি)" থেকে কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করেন। ।

ধানের উৎপাদন ও আবাদি জমির পরিমাণ

২০১৫-১৬ অর্থবছরে তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সার্বিকভাবে ধানের আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ৩.৩% হ্রাস পেয়েছে (লেখচিত্র-১৩)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আউশ ও বোরো ধানের আবাদাধীন জমি হ্রাসের ফলে ধানের উৎপাদন ২.৪% হ্রাস পেয়েছে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বোরো ধান আবাদী জমি ক্ষতিগ্রস্থ হবার ফলে ধানের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে । মোট ধান আবাদাধীন জমির মধ্যে উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ) ধানের আবাদের হিস্যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের (৮৫.১%) তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (৮৫.২%) কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-৬)। তবে,২০১৬-১৭ । পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উচ্চ-ফলনশীল (হাইব্রিডসহ) এবং স্থানীয় জাতের ধানের আবাদ যথাক্রমে ৩.২% ও ৩.৯% হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বোরো উচ্চ-ফলনশীল জাতের আবাদ ১.২% হ্রাস পেলেও স্থানীয় ও হাইব্রিড জাতের আবাদ যথাক্রমে ০.১% ও ১.১% বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র-১৪)। অপরদিকে, আমন স্থানীয় জাতের ধানের আবাদকৃত জমি সামান্য হ্রাস পেলেও উচ্চ ফলনশীল আমন জাতের ধানের আবাদের হার ০.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধান খাদ্য ফসলের উৎপাদন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে চাল ও গমের উৎপাদন পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

সারণী- ৭: বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন (হাজার মে. টন)

ফসল	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
চাল	২৮৯৩১	৩১৩১৭	৩২২৫৭	৩৩৮৮৯	৩৩৮৩৪	৩৪৩৫৭	৩৪৭১০	৩৪৭১০	৩৩৮০৩
গম	৮৪৪	৮৪৯	৯০১	৯৯৫	১২৫৫	১৩০৩	১৩৪৮	১৩৪৮	১৩১১
ভুট্টা	১৩৪৬	৭৩০	৮৮৭	১২৯৮	১৫৫০	২১২৪	২২৭২	২৪৪৬	৩০২৫
আলু	৬৬৪৮	৫২৬৮	৭৯৩০	৮২০৬	৮৬০৩	৮৯৫০	৯২৫৪	৯৪৭৪	১০২১৬
ডাল	২০৪	১৯৬	২২১	২৪০	২৬৬	৩৫২	৩৭৮	৩৭৮	৩৮৭
ভোজ্য তৈলবীজ	৩৫৮	৩৩৭	৩৭৭	৪০৮	৪৩৩	৪৯৫	৫৪৩	৫৫৩	৫৬০

জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পূর্ব ও উত্তরকালীন অগ্রগতি

২০০৭-০৮ অর্থবছরের খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধি-জনিত সংকটকালে গৃহীত জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরুর পরে দেশে চাল, গম, আলু, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী ফলাফল প্রদর্শন করে। একই সময়ে বেগুন, কুমড়া, শিম ও লালশাকের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও গড় প্রবৃদ্ধিতে তেমন উন্নতি হয়নি। অপরদিকে, কলা, আম, আনারস ও কাঁঠালের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হলেও আম উৎপাদন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-৮)। খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরুর পর থেকে গম, ভুট্টা, তৈলবীজ, মসলা, ডাল, আলু এবং পাট চাষের এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আখ আবাদের এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। তবে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরে তুলনায় ধানের আবাদ এলাকা হ্রাস পেলেও ফল ও সবজির আবাদ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-৯)। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরে (২০০৭-০৮ হতে ২০১৬-১৭ সময়ে) ভুট্টা ও আলুর উৎপাদন যথাক্রমে ১২৫% ও ৫৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-৮: খাদ্য ফসল উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি

ফসলের নাম	পিওএ পূর্বকালীন (২০০০-০১ - ২০০৬-০৭)	পিওএ উত্তরকালীন (২০০৭-০৮ - ২০১৬-১৭)
ধান	২%	২%
গম	-১২%	৬%
ভুট্টা	১৪৯%	১৬%
আলু	৯%	৯%
ডাল	-৫%	৫%
বেগুন	২৭%	৪%
কুমড়া	৩৩%	৫%
শিম	৮%	৫%
লাল শাক	৮%	৩%
তৈলবীজ	১%	৬%
কলা	৯%	-২%
পেয়ারা	২১%	৪%
আম	৩১%	৫%
আনারস	৮%	-১%
কাঁঠাল	৪৪%	১%

জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

প্রতি বছর কৃষির আওতাধীন জমি ০.৪৪% হ্রাস পাচ্ছে এবং ফসলি জমি হ্রাসের হার হচ্ছে ০.৭৩% (সূত্র: এসআরডিআই- ২০১৩[৫৬])। এর ফলে ফসলি জমির সম্প্রসারণের সম্ভাবনা কম এবং খাদ্য উৎপাদনের আনুভূমিক সম্প্রসারণ রুদ্ধ হয়ে পড়ায় উলম্ব সম্প্রসারণ অনিবার্য।পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে । এ লক্ষ্যে সিলেট অঞ্চলের পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে । এছাড়া জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বারি, ব্রি ও বিনা থেকে উদ্ভাবিত ধান,সরিষা,মুগ ও আলুর স্বল্পমেয়াদী জাতসমূহকে সমন্বিত করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা চার-ফসল-ভিত্তিক বেশ কয়টি ফসল ধারা (ক্রপিং প্যাটার্ন) উদ্ভাবন করেছেন যার মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা ১৯১% থেকে ৪০০% পর্যন্ত উন্নীত করা সম্ভব হতে পারে[৫৭]।

সারণী-৯: ফসলাধীন জমির গড় প্রবৃদ্ধি (%)

ফসলের নাম	পিওএ-পূর্বকালীন	পিওএ-উত্তরকালীন
	২০০০-০১ - ২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ - ২০১৬-১৭
ধান	-০.২০%	০.৪%
গম	-১০%	১%
ভুট্টা	১৫২%	১৩%
তৈলবীজ	-৩.০০%	৪%
মসলা	-০.২০%	১০%
ডাল	-৬%	২%
আলু	৬.০০%	৪%
আখ	-২%	-৫%
ফলমূল	-২.০০%	০.২%
শাকসবজি	৭.০০%	১%
পাট	১.০০%	৮%

অব্যাহতভাবে শস্য ও কৃষির বহুমুখীকরণ

'জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬'-এ খাদ্য লভ্যতার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়াও শস্য-বহির্ভুত ফসল ও ফসল-বহির্ভূত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃষিকে বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উন্নত জাত উদ্ভাবন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, উচ্চমান সম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন,কৃষি বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সরকারের সময়োপযোগী নীতি ও কৌশল গ্রহণের ফলে পূর্বের খোরপোশ কৃষি (subsistence agriculture) আজ বাণিজ্যিক কৃষির দ্বারপ্রান্তে। সবজি ও ফল উৎপাদন জনপ্রিয় হচ্ছে। ভুট্টা, তৈলবীজ, মসলা, ডাল, পাট এবং আলুর উৎপাদন সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি-তে কৃষির অবদান (বনজ-উপখাত ব্যতীত) ১৩.০৭%, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৯% কম। সার্বিক কৃষি-বহুমুখীকরণের ফলে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যবর্তী সময়ে শস্য উপ-খাত এর জিডিপি অংশ হ্রাস পাচ্ছে এবং মৎস্য-সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের অংশ বৃদ্ধি পায়। মোট কৃষির মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শস্য উপ-খাতে জিডিপি-এর অবদান ০.৯৯% হ্রাস পেয়েছে এবং মৎস্য-সম্পদ উপ-খাতে ০.৯০% ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে প্রায় ০.০৯% বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র ১৫) । শস্য উপ-খাত ও নির্দিষ্ট খাত-ভিত্তিক কৃষি জিডিপি-এর গতিধারা নির্দেশ করে যে, কৃষির বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়ার ধারা ধীর গতির কিন্তু এর অগ্রগতি চলমান আছে।

লেখচিত্র ১৫: কৃষি জিডিপির খাত ভিত্তিক গঠন

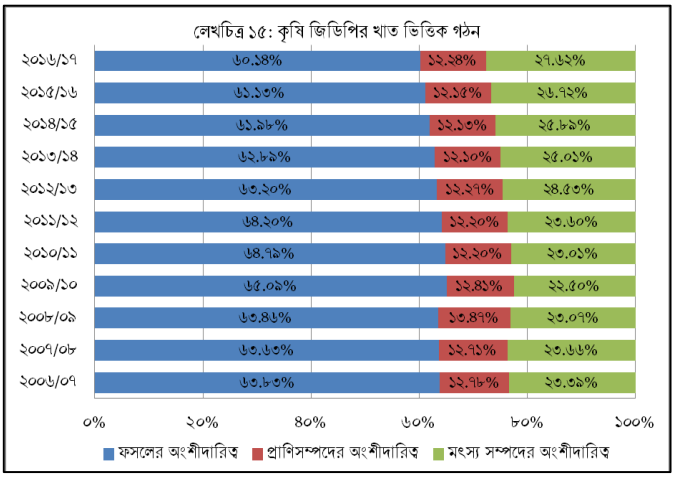

৪.১.২. নীতি গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পরবর্তী করণীয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ১-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ১৪৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ১০৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-১ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের জন্য নির্ধারিত বাজেটের ৭০% এবং সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ৬%। তিনটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ১ গঠিত, যাতে ৬৪টি বাস্তবায়িত, ৪০টি চলমান এবং ১৮টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ১.১-এর আওতাভুক্ত ৪৬টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ২৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ২০টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ৭টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ১৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ১.২-এর আওতাভুক্ত ৪৪টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৩৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ১৪টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ১০.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ৯টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ১.৩-এর আওতাভুক্ত ১৪টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৪১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৬টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৩৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ২টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। সার্বিকভাবে কর্মসূচি ১ এর আওতাভুক্ত ১০৪টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে মোট ১০৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৪০টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৩৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ১৮টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি ১-এর আওতায় মোট বাজেট ব্যয় হয়েছে ১৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ সালের ১৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৬% হ্রাস নির্দেশ করে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ১-এর আওতায় মোট ৭৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৫৩%। কর্মসূচি ১-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%। অপরদিকে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৮৬% ও ১৪%। এ ধারা গবেষণা ও সম্প্রসারণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্ব হ্রাসের প্রবনতা নির্দেশ করে।

অধিকতর টেকসই উপায়ে কৃষি গবেষণায় অর্থায়ন

জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS[৫৮])-এর আওতাভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি বাজেট বরাদ্দ (সংশোধিত) পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১৮.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ আর্থিক বিবেচনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭৩১১ মিলিয়ন টাকার প্রকৃত বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮৬৭২ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। এই বাজেট বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের মাত্র ০.২৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে ০.২৮ শতাংশ ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বারি, ব্রি, বিনা, বিজেআরআই, বিএসআরআই ও বিএআরসি-এর সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ যথাক্রমে ২০%, ৭৯%, ৩৩%, ৫৫% ৩৪% ও ২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসআরডিআই ও বিএলআরআই এর সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ যথাক্রমে ১১%, ১% হ্রাস পেয়েছে । অপরদিকে, অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ

লেখচিত্র ১৬: জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (নারস) প্রতিষ্ঠান ওয়ারী বাজেট

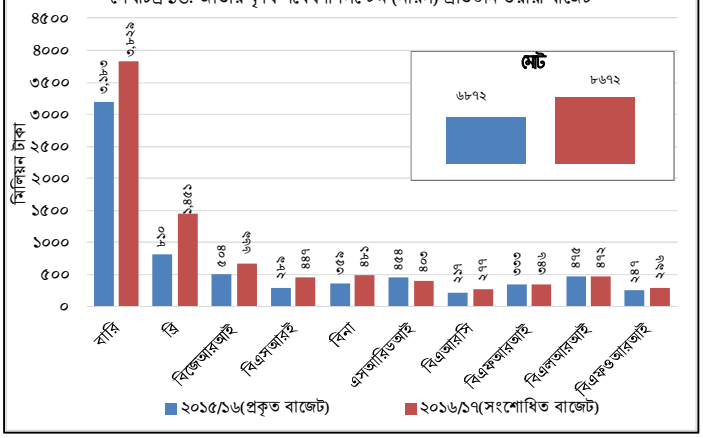

যথা- বিএফওআরআই, বারি ও বিএফআরআই-এর সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ যথাক্রমে ৪% ও ১৯% বৃদ্ধি পেয়েছে[৫৯] (লেখচিত্র-১৬)।'জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬'-এ লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রায়োগিক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত অর্থায়নে উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এর পাশাপাশি 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩'-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও চাষাবাদ প্রযুক্তির টেকসই উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা । এছাড়া, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় 'জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS)'-ভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, জেনেটিক্যালি মোডিফায়েড শস্যে উৎপাদন, অঞ্চল-ভিত্তিক কৃষি সমস্যাকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, উত্তম কৃষি পদ্ধতির বাস্তবায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করা ছাড়াও শস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নতি, কর্তন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, জৈবপ্রযুক্তি এবং জীব-বৈচিত্র্যের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর গবেষণা কার্য পরিচালনা করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ সেবাসমূহ আধুনিকায়ন

'জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬'-এ টেকসইভাবে দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন ও শস্য বহুমুখীকরণ,খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনসহ উন্নতবীজ সরবরাহ এবং মৃত্তিকার গুণগতমান সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারকে বিভিন্ন গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কৃষকের কাছে সম্প্রসারণ সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শস্য বহুমুখীকরণ ও শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ, চাষি পর্যায়ে উন্নত বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি,ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, অঞ্চল--ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ পরিবেশ-বান্ধব কর্মসূচি জনপ্রিয়করণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রসারণ সেবাসমূহ বৃদ্ধিকল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ সালের এডিপি-বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। জৈব কৃষি অনুশীলনে কাজ করে যাচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ কর্মসূচির আওতায় রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার কমিয়ে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ১৮ টি জৈব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে । ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কীটনাশকের ব্যবহার ১২,৯৬৪ মে. টন কম করা হয়েছে । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্লান্ট ডক্টরস ক্লিনিকের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৭৬০ জন কৃষককে উদ্ভিদ সংরক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ধানের অতন্দ্র জরিপ ও আইপিএম কর্মকান্ড শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ১৪ টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৫৫ জন কর্মকর্তাকে ধানের অতন্দ্র জরিপ বিষয়ে অবহিত করা হয় । কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার হিসেবে সার্ভিলেন্স এবং ফোরকাস্টিং সংশ্লিষ্ট ১৮ টা লিফলেট তৈরি করে ওয়েবসাইটে আপলোডসহ মৌসুম ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ফসলের রোগ ও পোকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ভিত্তিক ১৬ টি লিফলেট প্রস্তুতপূবর্ক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩'-তে কৃষি সম্প্রসারণকে সেবা প্রদানকারী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে কৃষককে উপযুক্ত কারিগরি ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদানসহ নতুন প্রযুক্তি,উন্নত খামার পদ্ধতি এবং কলাকৌশল বিষয়ে সহায়তা প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খামার যান্ত্রিকীকরণ, পরিবেশ-বান্ধব কৃষি কলাকৌশল অনুশীলন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র সেচ সম্প্রসারণ, উচ্চ-মূল্যের শস্য বহুমুখীকরণ,কৃষক দল-ভিত্তিক বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা চালুকরণ, ফসলের ফলন পার্থক্য হ্রাস, , ই-কৃষি ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (এফআইএসি) সম্প্রসারণ এবং গবেষণা ফলাফলকে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত অভিযোজন কার্যক্রম অব্যাহত

'জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬'-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষিকে খাপ খাইয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন অভিযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। 'জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬ এ খরা-প্রবণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে বৃষ্টি-নির্ভর চাষাবাদে ব্যবহারের জন্য বন্যা ও খরা সহনশীল জাত চিহ্নিতকরণ এবং লবণাক্ততা সীমিতকরণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, ও প্রসার সাধনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কার্যক্রম চলমান রয়েছে । পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট'-এর অর্থায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পটি দেশের ১০টি জেলায় ৪২টি উপজেলায় ৪২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৬২ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কচুরিপানা ব্যবহার করে কৃষক পর্যায়ে ১২,৯০০ টি ভাসমান বেড স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর 'চর ডেভেলপমেন্টে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪' এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষিকে খাপ খাইয়ে নিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও চর এলাকায় চাষাবাদ পদ্ধতি ও কলাকৌশল উন্নত করা, চর এলাকায় শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে শস্য বিন্যাসের উন্নতকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে লাগসই প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণের কাজ করছে । বারি, ব্রি ও বিনা উদ্ভাবিত তাপ-সহিষ্ণু গমের জাত (বারি-গম-২৬) এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত (ব্রি ধান-৪৭, ব্রি ধান-৫৫ এবং বিনা-ধান-৮ ও ১০) দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- **চাহিদা ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ**

জাতীয় ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে । প্রধান ফসলের বর্তমান উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে । প্রধান ফসলের জাত উন্নতকরণের জন্য জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, মূল্যায়ন এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের রোগ, পোকামাকড় প্রতিরোধী ও জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন জাত উদ্ভাবন এবং মিউটেশন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কার্যকরভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। দ্রুত জাত উন্নয়ন ও নব প্রকরণে এ মিউটেশন ব্রিডিং এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে । ফসল ভিত্তিক জৈব কৃষি গবেষণা গুরুত্বারোপ করতে হবে । ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সরবরাহ ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে, তাই জীন ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ী ফসলের জাত উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে । জিন সংযোজন এবং ক্রপ-মডেলিং প্রযুক্তি সহযোগে ফলনের বর্তমান সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যেতে পারে। একাধিক জৈবিক ও অজৈবিক ঘাত-সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে জিন পিরামিডিং কর্মসূচি জোরদার করা যায় । হাইব্রিড, সুপারব্রিড ও কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স গুণ সম্পন্ন ধানের জাত উদ্ভাবনে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। চাহিদা-ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ-মেয়াদী প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে ।

- **পুষ্টি উন্নয়নে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ**

খাদ্য-ভিত্তিক পুষ্টি অর্জনের অন্যতম উৎস হল কৃষি[৬০]।'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৭(খসড়া) এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি নিরাপত্তা । উৎপাদন ও পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য প্রধান ফসলের জাত উদ্ভাবনে হাইব্রিড প্রযুক্তি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে । অপ্রচলিত ও অ-মৌসুমি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফলের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। বায়ো-ফর্টিফিকেশনের মাধ্যমে ভিটামিন-এ, জিঙ্ক এবং আয়রন সমৃদ্ধ জাত উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। বসতবাড়ির আঙ্গিনা ও বাড়ির ছাদে সারা বছর সবজি চাষে নারীদের সম্পৃক্তায়নের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়ন হবে। বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক পাঠসমূহের যথাযথ অন্তর্ভুক্তি ও হালনাগাদকরণ, পাঠ্য প্রণয়নে সহায়তা প্রদান; খাদ্য-ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।

- **মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজের আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা**

কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সম্পর্ক জোরদার করণের মাধ্যমে কৃষকদের চাহিদা ভিত্তিক টৈকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা যায় । 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৭ (খসড়া) এ গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষি কারিগরি কমিটিগুলোকে (ATC, RTC, NATCC)) কার্যকর করে সম্প্রসারণ সেবাকে শক্তিশালীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমে জৈব কৃষি (Organic Agricultural) অনুশীলনের উপর জোর দিতে হবে । উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন (GAP) বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করে কৃষি পণ্যর রপ্তানি চাহিদা বৃদ্ধি করা যায় । মানুষের শখ ও পরিবেশকে বিবেচনা করে বিশেষায়িত কৃষি (যেমন- ছাদ কৃষি , হাইড্রোপনিক,স্যান্ট কালচার, সংরক্ষণ কৃষি) কাজকে জনপ্রিয় করার কাজে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে । কৃষি সম্প্রসারণ কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা যায় । মোবাইল অ্যাপস্-এর মাধ্যমে আধুনিক কৃষি তথ্য দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফসলের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের ব্যবস্থাপত্র উন্নততর ই-কৃষি সেবার মাধ্যমে প্রদান করা যায়। উপজেলা পর্যায়ে প্ল্যান্ট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত ফসলের রোগ চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- **মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন**

'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৭(খসড়া) এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা । মৃত্তিকার গুণাগুণ ভিত্তিক ফসল চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে মৃত্তিকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা যায় । জাতীয় পর্যায়ে চাহিদা, ভূমি ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, কৃষি জলবায়ু, পানির প্রাপ্যতা এবং আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শস্য-জোনিং মানচিত্র প্রণয়ন তরান্বিত করতে হবে। আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ এবং ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন কার্যক্রমের আর্বতনকাল ১২-১৫ বছরের স্থলে পাঁচ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়। মাটির জৈব পদার্থ ও অণুজীব সংরক্ষণের জন্য জৈব সার/কম্পোস্ট/ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, ও অধিক পুষ্টি-সমৃদ্ধ জৈব-সার উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন কর্ষণ পদ্ধতি অনুশীলন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। মৃত্তিকায় জৈবিক নাইট্রোজেন সংবন্ধনের (Biological Nitrogen Fixation) জন্য শস্য চক্রে লিগিউম জাতীয় শস্যর চাষাবাদ গ্রহণ করা যেতে পারে । মৃত্তিকা সম্পদের টৈকসই ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং কৃষি প্রবৃদ্ধির জন্য সমন্বিত মৃত্তিকা , পানি ও শস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে ।

- **জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত কারণে অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উন্নয়নে অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ**

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষিকে খাপ খাইয়ে নেয়া ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কলাকৌশল গ্রহণ করতে হবে । কৃষি আবহাওয়া ভিত্তিক পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Early Warning System) চালু করণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতি হ্রাস করা যায় । চরাঞ্চল, পাহাড়ি, উপকূলীয়, হাওর, বরেন্দ্র প্রভৃতি সমস্যাবহুল এলাকায় বিরূপ আবহাওয়ার কারণে ফসল উৎপাদনে সমস্যা হয়। চরাঞ্চল মৃত্তিকার গুণাগুণ বিবেচনা করে এবং উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করে শস্য নির্বাচন করতে হবে । পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাপক হারে ফল চাষের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে । হাওর অঞ্চলে আগাম জাতের ধান চাষের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতি হ্রাস করা যায় । উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর ও রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা ও কম পানির চাহিদা সম্পন্ন ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি কার্যক্রম নিবিড় কারার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে পতিত/অব্যবহৃত লবণাক্ত জমিগুলিতে ডাল - তৈল ফসল আবাদ এবং নতুন ফসলবিন্যাস- প্রবর্তন যেতে পারে।

৪.২. কর্মসূচি-২: সেচের জন্য উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো সুবিধা

কর্মসূচি ২-এর উদ্দেশ্য হল কৃষকদের চাহিদার ভিত্তিতে টেকসই এবং কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এই কর্মসূচিকে ৪টি উপ-কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে: (১) খামার পর্যায়ে, পানি ব্যবস্থাপনা ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (২) ভূ-উপরিভাগের পানির ব্যবহার (বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে) উন্নত ও টেকসই করা; (৩) দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত পানির প্রভাব কমিয়ে আনা; (৪) দক্ষিণাঞ্চলের নদীসমূহের পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা। এতদসংশ্লিষ্ট জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ১.২-এর আওতায় রয়েছে: (১) সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা, (২) সেচ কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা, (৩) ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা এবং (৪) সেচ খরচ কমানো।

৪.২.১. কর্মসূচি ২-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি:

সারণী - ১০: সিআইপি কর্মসূচি ২-এর অর্জনের অগ্রগতি

সিআইপি/এনএফপি-পিওএ ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী নির্দেশকসমূহ	২০০৭-২০০৮	২০০৯-২০১০	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	উৎস
সেচের আওতাধীন ফসলী জমির শতকরা হার	৪৪.২%	৪৫.৩%	৪৮.৬%	৪৮.২৪%	তথ্য নেই	বিবিএস (প্রধান ও অপ্রধান শস্য পরিসংখ্যান উইং)
উত্তরাঞ্চলের পানিতলের গভীরতায় গত ২০ বছরের পরিবর্তনের গড় (সেঃমিঃ/বছর)	৬.৫ (১৯৮৯-২০০৮)	১৩.৭ (১৯৯১-২০১০)	৬.৮ (১৯৯৬-২০১৫)	১০.৯৬ (১৯৯৭-২০১৬)	১৬.৪৭ (১৯৯৮-২০১৭)	পানি উন্নয়ন বোর্ড
উত্তরাঞ্চলের পানিতলের গভীরতার গত ৩ বছরের পরিবর্তনের গড় (সেঃমিঃ/বছর)	১৫.৪ (২০০৬-২০০৮)	৪৫.৯ (২০০৮-২০১০)	২০.৪ (২০১৩-২০১৫)	৪২.৬৭ (২০১৪-২০১৬)	১৯.০০ (২০১৫-২০১৭)	পানি উন্নয়ন বোর্ড
মোট সেচের আওতাধীন জমির মধ্যে ভূ-উপরিস্থ সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ	২৩.৩%	২২.০%	২১.১%	২১.১%	তথ্য নেই	বিবিএস (প্রধান ও অপ্রধান শস্য পরিসংখ্যান উইং)
বোরো ফসল উৎপাদনের মোট খরচের মধ্যে একর প্রতি সেচের খরচের শতকরা হার	১৬.৩%	১৫.০% (সংশোধিত)	১৩.১%	১২.৬৯%	১২.৫৪%	কৃষি মন্ত্রণালয়

সেচের আওতাধীন আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে

সেচের আওতায় চাষযোগ্য ফসলি জমির এলাকা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮.৬% থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৮.২৪% (সারণী-১০) হয়েছে। যা পরিবীক্ষণকালের শুরুর (২০০৭-০৮) তুলনায় প্রায় ৪% বেশি। সরকারের নানামুখী উদ্যোগ যেমন: শক্তি-চালিত পাম্প স্থাপন, সেচ-অবকাঠামো নির্মাণ, সেচ-নালা নির্মাণ, পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুষ্কীকরণ (এডব্লিউডি) কৌশল চালুকরণ, অচল হয়ে যাওয়া গভীর নলকূপ মেরামত, সেচ-খাল পুনঃ খনন, রাবার ড্যাম নির্মাণ, বিএডিসি কর্তৃক ক্ষুদ্র-সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ইত্যাদির কারণে সেচের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি বাস্তবায়িত সেচ খাল পুনঃ-খনন, রবার ড্যাম নির্মাণ, হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম নির্মাণ, ভূ-গর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণ, সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ-পাম্প স্থাপন, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটার ব্যবহার , ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ এবং ভাসমান পাম্পের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণের ফলে প্রায় ৫৮ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ[৬১]) কর্তৃক বাস্তবায়িত জলাধার পুনঃ-খনন, ক্রস ড্যাম নির্মাণ, সৌর বিদ্যুৎ সেচ-পাম্প স্থাপন, এলএলপি স্থাপন ,অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের ফলে ২০

লেখচিত্র ১৭: সেচের আওতাধীন ফসলী জমি ও ভূ-উপরিস্থ সেচের অংশ

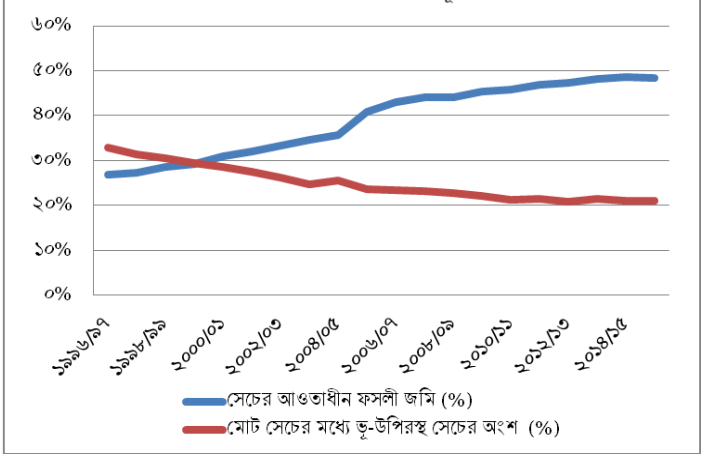

হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ[৬১]) কর্তৃক প্রায় ১৬ হাজারেরও বেশী সেচযন্ত্র সেচ-কাজে ব্যবহার করে প্রায় ৫.১৫ লাখ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ করা হয়েছে।

সেচ কার্যে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার স্থিতিশীল রয়েছে

সেচ-কাজে ভূ-উপরিভাগের পানির ব্যবহার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পূর্ববর্তী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সমান (২১.১%) রয়েছে। অবশ্য, দীর্ঘমেয়াদি যে নেতিবাচক ধারা ছিল তা ইতোমধ্যে হ্রাস পেয়েছে (লেখচিত্র ১৭)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ২৭৬.৩৩ কি.মি. সেচ খাল পুনঃ খনন খালে পানি সংরক্ষণের জন্য ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৯৭ কি.মি. সেচ খাল পুনঃ খনন, ৪১টি পুকুর পুনঃ খনন, সেচ-কার্যে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের উদ্দেশ্য ২ টি পল্টুন স্থাপন করে সেচ প্রদান, ৫৫ টি পাতকুয়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সেচ প্রদান , ২৮টি ক্রস ড্যাম নির্মাণ, নদীর পাড়ে মোট ১৭৯টি এলএলপি স্থাপন ও মৌসুম-ভিত্তিক অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে সেচ-কার্যে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

২০১৭ সালে ভূ-গর্ভস্থ পানি-তলের গভীরতার অবনতি হয়েছে

২০১৬ সালে উত্তরাঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানি-তলের গভীরতার অবনতি হয়েছে। ২০১৬ সালে ভূ-গর্ভস্থ পানি-তলের গভীরতা ছিল ৭.৩ মিটার, যা ২০১৭ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৮.৫৮ মিটার (লেখচিত্র ১৮)। দীর্ঘদিনের ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার বিপরীতে ভূ-গর্ভস্থ গভীরতার অবনতির প্রধান কারণ হল ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, উত্তরাঞ্চলের নদ-নদীসমূহে পানির প্রবাহ হ্রাস ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি। স্বল্প-মেয়াদী (৩ বছর) এবং দীর্ঘ-মেয়াদী (২০ বছর) নির্দেশকের আলোকে দেখা যায় যে, ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ভূ-গর্ভস্থ পানির গভীরতায় অবনতি হয়েছে। স্বল্প-মেয়াদে পানিতল-স্তরের গভীরতা ৪২.৬৭ সে.মি. থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯.০০ সে.মি. এবং দীর্ঘ-মেয়াদে ১০.৯৬ সে.মি. থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৪৭ সে. মি. হয়েছে[৬২] (সারণী-১০)। পানি-স্তরে নিষ্কাশিত পানির পরিমাণ হ্রাস পাবার ফলে ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ভূ-গর্ভস্থ পানি-তলের গভীরতায় অবনতি ঘটেছে।

লেখচিত্র ১৮: উত্তরাঞ্চলের পানিতলের গভীরতা

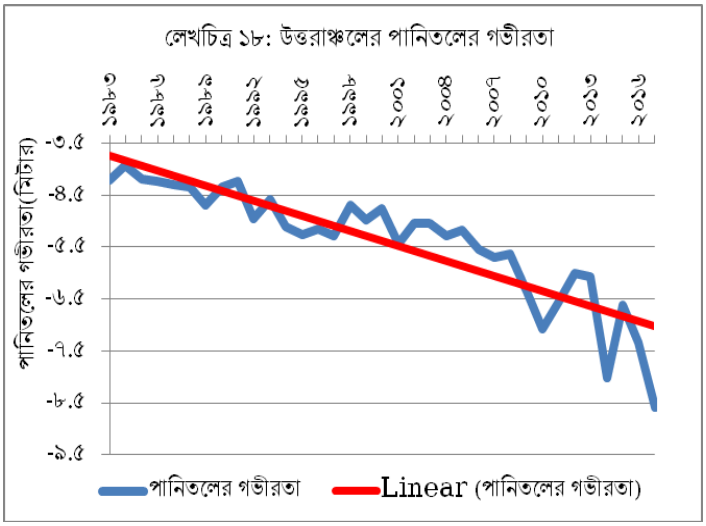

বোরো ফসল উৎপাদনে সেচ-জনিত খরচের পরিমাণ হ্রাস

বোরো ধান উৎপাদনে সেচ-জনিত খরচ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২.৬৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২.৫৪% হয়েছে (সারণী-১০)। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বোরো উৎপাদনের মোট খরচ ৬.৩% বৃদ্ধি পেলেও সেচ-জনিত খরচ হ্রাস পেয়েছে। এর অন্যতম কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে - ডিজেলের পরিবর্তে বিদ্যুৎ ও সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ পাইপের ব্যবহার, এডব্লিউডি পদ্ধতির ব্যবহার এবং জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাস, পানির অপচয় রোধে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহার, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ৪৭৩ কি.মি. খাল পুনঃ খনন[৬৩]। এক্ষেত্রে আরও বেশী বিনিয়োগ হলে ফসলের উৎপাদন ব্যয় আরও হ্রাস পেতে পারে।

৪.২.২. চলমান নীতি/কর্মসূচি উন্নয়ন এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ :

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ২-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ৩০২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ২১৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি ২ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ৭২% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ১২.২%। ৪টি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ২ গঠিত, যাতে ৩৯টি বাস্তবায়িত, ৪০টি চলমান এবং ২০টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ২.১-এর আওতাভুক্ত ২০টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৪৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ০৯ টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ১৮টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ৭৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ২.২-এর আওতাভুক্ত ৪৫টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৭৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ২২টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ২টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ২.৩-এর আওতাভুক্ত ৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ২৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। উপ-কর্মসূচি ২.৪-এর আওতাভুক্ত ১১টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৭৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৭টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ২৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। সার্বিকভাবে কর্মসূচি ২ এর আওতাভুক্ত ৮৯ টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে মোট ২১৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৪০টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৫৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ২০টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ৮৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি ২-এর আওতায় মোট বাজেট ব্যয় হয়েছে ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ সালের ২৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১৪% বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ২-এর আওতায় মোট ১৪৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৬৭%। কর্মসূচি ২-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৭৫% ও ২৫%। অপরদিকে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৯৪% ও ৬%। এ ধারা কর্মসূচি ২-এর কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্ব কিছুটা হ্রাসের প্রবণতা নির্দেশ করে।

এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম:

- **কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা**

  কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিভিন্ন নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন: পানির প্রাপ্যতা, উৎসস্থল থেকে পানির সহজলভ্য সরবরাহ, সেচ পানির গুণাগুণ,সেচ পানির ব্যবহার দক্ষতা, ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি, উপযুক্ত শস্য নির্বাচন ইত্যাদি । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও এখনও মোট চাষের আওতাধীন জমির প্রায় ৫২% সেচ সুবিধাহীন[৬৫]। ফলে ফসলের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বিধায় পানির প্রবাহ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নদী ভাঙ্গন রোধে ড্রেজিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে নদীর তীর রক্ষা পায় এবং নদীর পানির প্রবাহ ঠিক থাকে । কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতায় ২৭৬.৩৩ কিলোমিটার খাল/নালা পুন:খনন/সংস্কার করা হয়েছে। সেচের আওতাধীন জমির সম্প্রসারণের জন্য সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, খাল পুনঃ-খনন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, পানির পরিমিত ব্যবহার-কল্পে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহার, সোলার প্যানেল স্থাপন, রাবার ড্যাম ও ক্রস-ড্যাম স্থাপন, খালে পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে ।

- **সেচ কার্যে ভূ- উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ**

মোট সেচের আওতাধীন জমির ৭৯% ভূগর্ভস্থ সেচের আওতাধীন এবং প্রায় ২১% ভূ-উপরিস্থ সেচের আওতাধীন[৬৬] । ফলে নিবিড় সেচাধীন এলাকায় পানিতল স্তর নিম্নমুখী হয়েছে এবং ভূগর্ভস্থ পানির গুণগত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এখনই যদি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবার ফলে পানির স্তর আরও নিচে নেমে আসবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে; ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী খরা দেখা দেবে। এ কারণে টেকসই পানি ব্যবহারে আরও মনোযোগী হতে হবে। এছাড়াও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যেমন কর্ষণ হ্রাস, ভাসমান বেডে রোপণ, পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুষ্কীকরণ (এডব্লিউডি) কৌশল অবলম্বন ইত্যাদি। সেচ কার্যে ভূ-উপরি পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলে ১৯৭ কি.মি. খাল খনন করা হয়েছে । পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প আওতায় ৯.৫৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে । এই ধরনের উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন । অঞ্চল-ভিত্তিক শস্য-বিন্যাসকে বিবেচনা করে বরেন্দ্র অঞ্চলে কম পানির চাহিদা-সম্পন্ন শস্য নির্বাচন করতে হবে এবং শুষ্ক-ঋতুতে অপরিকল্পিতভাবে বোরো ধানের আবাদ নিয়ন্ত্রণ করা বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল হতে পারে। তাই পানির সহজলভ্যতা ও পানির স্তরকে বিবেচনায় রেখে শস্য বিন্যাসে বোরোর বিকল্প শস্যের চাষ বাড়ানো যেতে পারে।

- **উপকূলীয় অঞ্চলের পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা**

উপকূলীয় অঞ্চল বাংলাদেশের সব-থেকে সমস্যাবহুল এলাকা। এখানকার মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন), উপকূলীয় বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়। দেশের প্রায় ৩০% আবাদযোগ্য জমি এই এলাকায় অবস্থিত এবং দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ এই এলাকায় বাস করে, এবং তাদের অধিকাংশ দরিদ্র । এই অঞ্চল বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২৭.৬২ কি: মি: পূর্ণ ও ১৫৩.২৬ কি: মি: আংশিক উপকূলীয় বাঁধ নির্মিত হয়েছে । উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সকল দিক বিবেচনা করে সরকার উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ প্রণয়ন করেছে। এই নীতিতে উপকূলীয় অঞ্চলের জলজ সম্পদ ও মানুষের জীবিকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। খুলনা বিভাগের সুন্দরবন ও অন্যান্য এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূর করা যায় ।

- **জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেজ হালনাগাদ (এনডব্লিউআরডি) অব্যাহত রাখা**

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর, বন্যা, নিষ্কাশন, লবণাক্ততা, শুষ্ক ও আর্দ্র ঋতুতে আর্সেনিকের স্তর পরিবীক্ষণের জন্য বাংলাদেশে পানি সম্পদ ডাটাবেজ হালনাগাদ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এনডব্লিউআরডি এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম হালনাগাদকরণ এবং উন্নতকরণের কাজ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। সারা দেশের ৫০ টি সংস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ভ্যালু-এ্যাড ও গুণগতমান যাচাইপূবর্ক উপাত্ত ভান্ডারে এনডব্লিউআরডি ফরম্যাটে আর্কাইভ করা হয়েছে । এ পর্যন্ত এনডব্লিউআরডি-তে ৫৪৩টি ও আইসিআরডি-তে ৫৫৯টি জিআইএস, টাইম-সিরিজ ও টেব্যুলার উপাত্ত স্তরের ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি উপাত্ত স্তরের জন্য মেটাডাটা টুলস ও বান্ডিল তথ্য প্রস্তুত করা হয়েছে । যে কোন প্রকল্প তৈরি এবং পানি সম্পদ গবেষণা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ তথ্য সূত্র ব্যবহার করতে হবে ।

- **নদীর গতিপথ ও পানি-প্রবাহ অব্যাহত রাখা**

নদী ভাঙ্গন রোধ এবং কৃষি জমি পুনরুদ্ধারে প্রধান প্রধান নদীর গতিপথ ও প্রবাহ সংক্রান্ত পূর্বানুমানে বিস্তারিত জরিপ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। পরিবেশগত এবং ভৌগোলিক তথ্য-সেবা কেন্দ্রে'র মাধ্যমে দূর-অনুধাবন প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রধান প্রধান নদী যেমন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং যমুনার গতিপথ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ২০১৬-১৭অর্থবছরে পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩৭.৫৫ কি:মি পূর্ণ ও ২৬.৭০ কি:মি: আংশিক নদী ড্রেজিং করে নদী থেকে পলি অপসারণ করেছে । পানি

উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৮ টি নদী তীর ও শহর রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১১৫ কি:মি দৈর্ঘ্যের নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নদী ভাঙ্গন রোধ এবং কৃষি জমি পুনরুদ্ধার এবং প্রধান প্রধান নদীর গতিপথ ও প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য এ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

- **হাওর এবং জলাভূমির সার্বিক ও টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখা**

বাংলাদেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোনাকিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ সাতটি জেলার দুই কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হাওর পরিকল্পনার ১৭টি সেক্টরের ক্ষেত্রে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হাওর এবং জলাভূমির এলাকার মানুষের সমন্বিত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে[৬৭]। এর আওতায় যে ছয়টি ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা হল, উন্নত পানি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষি উন্নয়ন, জীব বৈচিত্র্য উন্নীতকরণ এবং জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং উন্নত মানের জীবন যাপন, উন্নত ভৌত অবকাঠামো এবং শিল্প উদ্যোগ ও প্রযুক্তি উন্নয়ন। উক্ত এলাকার পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন হঠাৎ বন্যা, ভাঙ্গন নিষ্কাশন বাধা, শুষ্ক ঋতুতে পানি সেচের অভাব, ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণের এই কৌশলপত্র অবলম্বন করা হয়েছে।

৪.৩. কর্মসূচি ৩: উপকরণ ও মাটির উর্বরতা উন্নয়ন

কর্মসূচি ৩-এর লক্ষ্য হল গুণগত মানের কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা এবং মাটির উর্বরতার উন্নতি সাধন। নিম্নলিখিত চারটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি-৩ গঠিত: (১) মান উন্নয়নের জন্য পরীক্ষিত এবং প্রত্যায়িত কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতার বৃদ্ধি; (২) সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উন্নয়ন; (৩) মাটির উর্বরতা ব্যবস্থাপনার বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন; এবং (৪) ক্ষুদ্র কৃষক এবং দরিদ্রদের জন্য ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক সেবার সুযোগ সুবিধা প্রণয়ন। এই কর্মসূচিটি কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি ঋণ এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল কৃষি উপকরণের টেকসই ব্যবহার সম্পর্কিত।

৪.৩.১. কর্মসূচি ৩-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি:

সারণী-১১: সিআইপি কর্মসূচি ৩-এর অর্জনের অগ্রগতি

সিআইপি/এনএফপি-পিওএ ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী নির্দেশকসমূহ		২০০৭-২০০৮	২০০৯-২০১০	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	উৎস
ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজ উৎপাদনে বার্ষিক পরিবর্তন %		৬.৪%	৬.৩	১৪.৬	-০.৩	১৫.৬	কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি তাত্ত্বিক (এগ্রোনমিক) চাহিদার বিপরীতে উন্নত বীজ সরবরাহের হার (বিএডিসি, ডিএই, এবং প্রাইভেট কোম্পানি % হিসাবে)	ধান	৩৪.৯	৪৬.৫	৪১.৬	৪১.৫	৫৭.২	কৃষি মন্ত্রণালয়
	গম	৫৫.৪	৪৯.১	৫৫.৪	৫৮.২	৩৭.৫	
	ভুট্টা	৯৯.৪	৫৯.৪	৪৮.৮	২৭.১	৯২.২	
	আলু	৫.৬	১২.৮	৭.৯	৭.৭	১১.৮	
	ডাল	১৩.১	৯.৩	৬.১	১০.৯	৬.৫	
	শাক সবজি	৩৫.৮	৩১.৯	৬২.৪	৫০.৭	৮৩.১	
	তৈল বীজ	১০.২	৯.২	৭.৮	১৩.৪	১৫.৬	
চাহিদার বিপরীতে ইউরিয়া সরবরাহের হার		৯৮.০	৮১.৭	৯৭.৭	৯১.৬	৯৪.৬	সার পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়
চাহিদার বিপরীতে টিএসপি সরবরাহের হার		৮২.১	৬২.৭	৯৯.৬	৯৭.৩	৯৮.৭	
চাহিদার বিপরীতে এমওপি সরবরাহের হার		৬৫.৫	৫২.৯	৯১.৪	৯০.৮	৯৭.৬	
ফলনের পরিবর্তন (পূর্ববর্তী ৩ বছরের চলমান গড় %)	ধান	৪.১	২.৯	১.১	১.০	০.৬	বিবিএস বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ এবং কৃষি উইং, বিবিএস
	গম	৮.৭	৯.৬	৩.৬	০.২	১.৪	
	ভুট্টা	৪.৩	-০.৭	২.০	৩.৩	৪.৫	
	আলু	৩.৯	৯.৩	১.০	১.০	১.৮	
	ডাল	৩.১	৩.৭	৬.৭	৩.৬	-২.৫	
	বেগুন	৬.৫	০.৮	৫.২	৫.৪	১.৭	
	মিষ্টি কুমড়া	৪.৪	১.৬	৬.৪	৮.৩	২.৭	
	শিম	৪.৭	-০.২	৩.৭	৫.৪	২.৯	
	লাল শাক	১.২	২.৭	১.৮	২.১	১.২	
	তৈল বীজ	৫.৫	২.৩	৪.৭	৪.৪	০.০৪	
	কলা	-০.৪	-৩.৯	৩.২	১.৬	-০.০৬	
	পেয়ারা	১.৫	১০.৮	১৪.০	১৫.৩	২৪১.৭	
	আম	-১.২	০.০৩	১১.৬	৩.২	৬.০	
	আনারস	১.৮	১.৬	৩.৯	৩.৮	০.৪	
	কাঁঠাল	৮.৪	২.৩	-৫.৬	-০.৪	-১০.৮	
কৃষি ঋণ বিতরণ	বিলিয়ন টাকা	৮৫.৮১	১১১.১৭	১৫৯.৭৮	১৭৬.৪৬	২০৯.৯৯	বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন
	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	১০৩.০%	৯৭.০%	১০৩.০%	১০৮.০%	১১৯.৬৫%	

খাদ্যশস্য বীজ উৎপাদন ও সরবরাহে উন্নতি

খাদ্যশস্যের উন্নত বীজ (ধান, গম, ভুট্টা) খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উন্নত বীজের লভ্যতা পূর্ববর্তী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উন্নত বীজের লভ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ক্ষতি পুষিয়ে বীজ উৎপাদনের হার প্রায় ৪০.৬৫% বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৪.৬% হয়েছিল, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পুনরায় হ্রাস পেয়ে ০.৩% হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫.৯% উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়ে ১৫.৬% হয়েছে।

কৃষিতে প্রয়োজনীয় ধান, ভুট্টা, আলু, শাকসবজি ও তৈল বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি

খাদ্যশস্যের উন্নত বীজ সরবরাহের প্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি-তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তায় নিজস্ব অংশ বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। খাদ্যশস্যের উন্নত বীজের উৎপাদন ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও তা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনেকাংশে বেড়েছে। কৃষি-তাত্ত্বিক চাহিদার নিরিখে উন্নত বীজ সরবরাহের হার ধানের ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৪১.৫% থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭.২% হয়েছে। অপরদিকে, একই সময়কালে চাহিদার নিরিখে উন্নত বীজ সরবরাহের হার ভুট্টার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে ২৭.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯২.২% হয়েছে। গমের ক্ষেত্রে ৫৮.২% থেকে কমে ৩৭.৫% হয়েছে। অপরদিকে, কৃষি-তাত্ত্বিক চাহিদার নিরিখে উন্নত বীজ সরবরাহের হার দানাদার শস্য বহির্ভূত অন্যান্য খাদ্যশস্য; যেমন- আলু, শাক সবজি ও ভোজ্য তৈলবীজের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৭.৭%, ৫০.৭% ও ১৩.৪% এর স্থলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১১.৮%, ৮৩.১% ও ১৫.৬%-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, শাক সবজির ক্ষেত্রে ৩২.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষি-তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে উন্নত বীজ সরবরাহের হারে উন্নতি এবং এর প্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে । একই সময়ে ডাল-বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে কৃষি-তাত্ত্বিক চাহিদার নিরিখে উন্নত বীজ সরবরাহের হার যথাক্রমে পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১০.৯% এর স্থলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.৫% এ নেমে এসেছে (সারণী-১১)।

প্রাক্কলিত চাহিদা পূরণে ইউরিয়া ,এমওপি ও টিএসপি সরবরাহ আশানুরূপ উন্নতি

সাম্প্রতিককালে অজৈব সারের সরবরাহ প্রাক্কলিত চাহিদার খুব কাছাকাছি পর্যায়ে বিরাজমান রয়েছে। ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত চাহিদার তুলনায় সরবরাহ পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের যথাক্রমে ৯১.৬%, ৯৭.৩% ও ৯০.৮%-এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৪.৬%, ৯৮.৭% ও ৯৭.৬% হয়েছে। অপরদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি-এর প্রাক্কলিত চাহিদার তুলনায় সরবরাহ পরিবীক্ষণ সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে আসে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাক্কলিত চাহিদার তুলনায় ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি'র পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ৩.২%, ১.৪৪% এবং ৭.৭৯% বেশী (সারণী-১১)।

ফসল উৎপাদনের পরিবর্তনে মিশ্র প্রবণতা

২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ধান, গম এবং আলুর ফলন পরিবর্তনে মিশ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উক্ত সময়কালে চালের ক্ষেত্রে তিন বছরের চলমান গড় (three year moving average)-এর ভিত্তিতে ফলন পরিবর্তনের হার ০.৯৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ০.৫৮% হয়েছে। তিন বছরের চলমান গড়ের ভিত্তিতে ফলন পরিবর্তনের হার গমের ক্ষেত্রে ০.২১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩৯% এবং আলুর ক্ষেত্রে ০.৯৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮৩% হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সবজির ফলন হ্রাস পায়; বেগুনের ফলন ৩.৭ ভাগ, মিষ্টি কুমড়ার ফলন ৫.৬ ভাগ, সিমের ২.৫ ভাগ এবং লালশাকের ০.৯ ভাগ হ্রাস পায়। অপরদিকে, একই অর্থবছরে ফলের ফলনে শুধুমাত্র আমের ফলন প্রায় দ্বিগুন হয়েছে অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৮ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পেয়ে ৩.২% হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.০% হয়েছে। অন্যান্য ফলের ফলন হ্রাস পেয়েছে। কলা, পেয়ারা আনারস ও কাঁঠালের ক্ষেত্রে ফলন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ১.৭ ভাগ, ১৮.৭ ভাগ, ৩.৪ ভাগ ও শতকরা ১১.২ ভাগ (সারণী-১১)।

কৃষিঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণ হয়েছে ২০৯.৯৯ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ৩৩.৫৩ বিলিয়ন টাকা বেশী। বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ ২০০৯-১০ অর্থবছর ছাড়া অন্যান্য অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশী ছিল। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩%, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮% এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৯.৬৫% বেশী ছিল। ঋণ

বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অন্যান্য অর্থবছরের তুলনায় অধিক ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ-নীতির ফলে ঋণের সহজলভ্যতা উল্লেখিত সময়ে কৃষি-ঋণ বিতরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। কৃষি-ঋণ বিতরণে বিভিন্ন ব্যাংক এবং ব্যাংকের নতুন শাখা, নারী ও বর্গা-চাষির জন্য ঋণ বিতরণ এবং কৃষি-ঋণ বিতরণ নীতিমালার গুণগত পরিবর্তনের ফলে কৃষি-ঋণ বিতরণ নতুন মাত্রা লাভ করেছে, যা কৃষি-ঋণ বিতরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। গ্রামাঞ্চলে এখনও বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষ করে বিদেশি ব্যাংকগুলোর লেনদেন ও অন্যান্য কার্যক্রম অপর্যাপ্ত। কৃষি ঋণ বিতরণ এবং লেনদেনের পরিমাণ সমভাবে উন্নতি ও ক্রমশ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪.৩.২. নীতি গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পরবর্তী করণীয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ৩-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ১১৫০.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ৯৭৩.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-৩ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ৮৪.৫৮ % এবং সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ৫.৪৩%। তিনটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ৩ গঠিত, যাতে ২৭টি বাস্তবায়িত, ১০টি চলমান এবং ৩টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ৩.১-এর আওতাভুক্ত ২৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৮৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৭টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৮৬.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ৩টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৩.২-এর আওতাভুক্ত ৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৭২.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ২টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ২.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৩.৩-এর আওতাভুক্ত ৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ২৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ১টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ০.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। সার্বিকভাবে কর্মসূচি ৩ এর আওতাভুক্ত ৩৯টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে মোট ৯৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ১০ টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৮৯.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ৩টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি ৩-এর আওতায় মোট বাজেট ব্যয় হয়েছে ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ সালের ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৫৭.৬৯% হ্রাস নির্দেশ করে। চলমান প্রকল্পের বাজেট হ্রাস ও নতুন প্রকল্প চালু না হবার ফলে আগের বছরের তুলনায় কর্মসূচি ৩-এর বাজেট সংস্থান হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ৩-এর আওতায় মোট ৯৬০.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৯৬.৯৮%। কর্মসূচি ৩-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৭২% ও ২৮%। অপরদিকে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৫৭.৩২% ও ৪২.৬৮%। এ ধারা উপকরণের গুণগতমান ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে সরকারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

সারে ভর্তুকি ব্যয় হ্রাস অব্যাহত আছে

সারের ভর্তুকি সরকারি বাজেটে একটি বোঝাস্বরূপ। বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে সারের ভর্তুকি জাতীয় বাজেটের ৫.৩% পর্যন্ত বৃদ্ধির পর তা ক্রমশ হ্রাসমান ধারায় ফিরে এসেছে। সারের ভর্তুকি বিগত ২০১৩-১৪ সালে ছিল ৩.৯% যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৩.২% হয় এবং হ্রাসমান এ ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৭% এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে

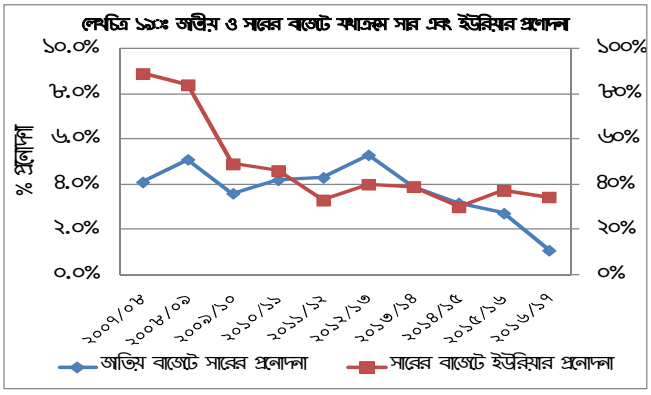

১.১% হয়েছে। উল্লেখ্য যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সারের ভর্তুকি জাতীয় বাজেটের বাজেটের ৪.১% ছিল (লেখচিত্র-১৯)। সারের মোট বাজেটে ইউরিয়া সারের ভর্তুকির অংশ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৮৯% থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৯%-এ দাঁড়ায়, এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইউরিয়া সারের ভর্তুকির অংশ ৩৭%-এ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৩৪% হয়। প্রকৃত টাকার হিসাবে ইউরিয়া সারের ভর্তুকির পরিমাণ ১১.৫৫ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। অপরদিকে, নন-ইউরিয়া সারের ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৩.৮ বিলিয়ন টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭১ বিলিয়ন টাকা হয়, তবে পরবর্তী অর্থবছর থেকে নন-ইউরিয়া সারের ভর্তুকির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসমান ধারা বজায় রেখে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫২.৪ বিলিয়ন টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪২.২ বিলিয়ন টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৯.৩ বিলিয়ন টাকা এবং সর্বশেষ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২.৫৯ বিলিয়ন টাকায় নেমে আসে। উল্লেখ্য যে বিগত ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরসমূহে নন-ইউরিয়া সারের ভর্তুকির পরিমাণ ইউরিয়া সারের তুলনায় কম ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ইউরিয়া সারের তুলনায় নন-ইউরিয়া সারের ভর্তুকির পরিমাণ টাকার অংকে অধিক পর্যায়ে অব্যাহত রয়েছে (সারণী-১২)।

সারণী - ১২: ২০০৭-০৮ সাল থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের ভর্তুকির পরিমাণ

সাল	*ভর্তুকির পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)*			*আগের অর্থ বছরের তুলনায় পরিবর্তন*			*বাজেটে সারের ভর্তুকির পরিমাণ (%)*	*ইউরিয়া সারের ভর্তুকির পরিমাণ (%)*
	ইউরিয়া	*নন-ইউরিয়া*	*মোট*	*ইউরিয়া*	*নন-ইউরিয়া*	*মোট*		
২০০৭-০৮	*৩১.৫৫*	*৩.৭৯*	*৩৫.৩৪*	-	-	-	*৪.১%*	*৮৯%*
২০০৮-০৯	*৪২.৭৩*	*৮.০১*	*৫০.৭৪*	*৩৫.৪%*	*১১১.৩%*	*৪৩.৬%*	*৫.১%*	*৮৪%*
২০০৯-১০	*১৯.৭৯*	*২০.৯৯*	*৪০.৭৮*	*-৫৩.৭%*	*১৬২.০%*	-	*৩.৬%*	*৪৯%*
২০১০-১১	*২৫.৭১*	*২৯.৭১*	*৫৫.৪২*	*২৯.৯%*	*৪১.৫%*	*৩৫.৯%*	*৪.২%*	*৪৬%*
২০১১-১২	*২৩.২৮*	*৪৬.২৪*	*৬৯.৫২*	*-৯.৫%*	*৫৫.৬%*	*২৫.৪%*	*৪.৩%*	*৩৩%*
২০১২-১৩	*৪৮.২৪*	*৭১.০০*	*১১৯.০০*	*১০৭.২%*	*৫৩.৫%*	*৭১.২%*	*৫.৩%*	*৪০%*
২০১৩-১৪	*৩৪.০২*	*৫২.৪১*	*৮৬.৪৩*	*-২৯.৪৮%*	*-২৬.২২*	*-২৭.৪৮*	*৩.৯%*	*৩৯%*
২০১৪-১৫	*২৭.০৭*	*৪২.২৩*	*৬৯.৩০*	*-২০.৪৩*	*-১৯.৪২*	*-১৯.৮২*	*৩.২%*	*৩০%*
২০১৫-১৬	*২৩.৩৭*	*৩৯.২৯*	*৬২.৬৬*	*-১৩.৭%*	*-৭.০%*	*-৯.৬%*	*২.৭%*	*৩৭%*
২০১৬-১৭	*১১.৮২*	*২২.৫৯*	*৩৪.৪১*	*-৪৯.৪%*	*-৪২.৫%*	*-৪৫.১%*	*১.১%*	*৩৪%*

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়

সারের দাম প্রায় অপরিবর্তিত, তবে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে

ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সারের মূল্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সমপর্যায়ে ছিল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও একই ছিল (সারণী -১৩)। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিএপি সারের মূল্য কেজি-প্রতি ২৭ টাকা থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে কেজি-প্রতি ২৫ টাকা হয়, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অপরিবর্তিত থাকে। কৃষকদের জন্য এই মূল্য সহনীয় পর্যায়ে হওয়ায় সারের বিক্রয় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সারের বিক্রয় যথাক্রমে ১.১%, ১৩.৫৯% ও ১০.২২% বৃদ্ধি পায়, তবে এ সময়ে ইউরিয়া সারের বিক্রয় ১৩.১৫% হ্রাস পায় (সারণী-১৩)। আকারের দিক থেকে ইউরিয়া বিক্রয়ের পরিমাণ টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি-এর সম্মিলিত বিক্রয়ের তুলনায় বেশী। যেহেতু ডিএপি-তে ১৮% নাইট্রোজেন আছে, তাই ধারণা করা হয়েছিল যে ডিএপি-এর মূল্য হ্রাসের ফলে ইউরিয়ার চাহিদা হ্রাস পাবে ।

সারণী - ১৩: ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সারের মূল্য এবং বিক্রয়

সময়কাল	*বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)*				*বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার মেট্রিক টনে)*			
	ইউরিয়া	*টিএসপি*	*এমওপি*	*ডিএপি*	*ইউরিয়া*	*টিএসপি*	*এমওপি*	*ডিএপি*
২০০৮-০৯	*৬*	*২৮*	*২৬৭*	*৩৬*	*২৫৩৩*	*১৬৫*	*৮২*	*১৬*
২০০৯-১০	*১২*	*৮০*	*৭০*	*৯০*	*২৪০৯*	*৪২০*	*২৬৩*	*১৩৬*
২০১০-১১	*১২*	*২২*	*১৫*	*২৭*	*২৬৫৫*	*৫৯১*	*৫০৭*	*৩৫৩*
২০১১-১২	*২০*	*২২*	*১৬*	*২৭*	*২২৯৬*	*৬৪১*	*৬০৩*	*৪০৩*
২০১২-১৩	*২০*	*২২*	*১৫*	*২৭*	*২২৪৭*	*৬৫৪*	*৫৭১*	*৪৩৪*
২০১৩-১৪	*১৬*	*২২*	*১৫*	*২৭*	*২৪৬২*	*৬৮৫*	*৫৭৬*	*৫৪৩*
২০১৪-১৫	*১৬*	*২২*	*১৫*	*২৫*	*২৬৩৮*	*৭২২*	*৬৪০*	*৫৯৭*
২০১৫-১৬	*১৬*	*২২*	*১৫*	*২৫*	*২২৯১*	*৭৩০*	*৭২৭*	*৬৫৮*
২০১৬-১৭	*১৬*	*২২*	*১৫*	*২৫*	*২৩৬৬*	*৭৪০*	*৭৮১*	*৬০৯*

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়

বিভিন্ন ফসলের বীজ ও সরবরাহে পরিবর্তন

সরকারিভাবে বীজ বিতরণ কার্যক্রমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গম ৩৩.৯%, ডাল ১২.২%, তৈলবীজ ৪.৪%, সবজি ৪৫.৪% ও পাট ৩২.৮% বিতরণ হ্রাস পেয়েছে এবং আলু ০.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মত ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও ভুট্টা বীজ বিতরণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে (সারণী-১৪)। বেসরকারি খাতের বীজ বিতরণের ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরকে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ভুট্টা ও আলু বীজ বিতরণ যথাক্রমে ১৫৬.৪% এবং ২১৩.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, একই সময়ে বেসরকারিভাবে গম বীজের সরবরাহ উল্লেখযোগ্য নয়। ডাল এবং তৈলবীজ বিতরণ হয়নি। পাট ও সবজি বীজের ক্ষেত্রে সরবরাহ যথাক্রমে ৭১০.৮% ও ৯৩.৩% হ্রাস পেয়েছে (সারণী-১৪)। উল্লেখ্য যে, এ বছর বেসরকারিভাবে পাট বীজ বিতরণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে ও আলু-বীজ বিতরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী- ১৪: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চাল ছাড়া বিভিন্ন শস্য বীজের সরবরাহে বিভিন্ন খাতের অবদান

ফসল	বীজের চাহিদা (মেট্রিক টন)	২০১৬-১৭ বীজ বিতরণ (মেট্রিক টন)				বীজের মোট চাহিদা ও যোগানে বিভিন্ন উৎসের অবদান				
		সরকারি	বে-সরকারি	২০১৫-১৬ থেকে পরিবর্তন (%)		বীজের মোট চাহিদা (%)			বাজারের মাধ্যমে যোগানে অবদান (%)	
				সরকারি	বে-সরকারি	সরকারি	বে-সরকারি	নিজস্ব উৎস	সরকারি	বে-সরকারি
গম	৫৩৬০০	১৯৯৭৫	১৩৫	-৩৩.৯%	০.০%	৩৭.২৭%	০.২৫%	৬২.৫%	৯৯%	১%
ভুট্টা	৬৫০৭	০	৬০০০	-১০০.০%	১৫৬.৪%	০.০০%	৯২.২১%	৭.৮%	০%	১০০%
ডাল	৪৩১৩৬	২৭৯৪	০	-১২.২%	-১০০.০%	৬.৪৮%	০.০০%	৯৩.৫%	১০০%	০%
তৈলবীজ	১৫৩১৯	২৩৮৩	০	-৪.৪%	-১০০.০%	১৫.৫৬%	০.০০%	৮৪.৪%	১০০%	০%
সবজি	২২৬৬	৮৩	১৮০০	-৪৫.৪%	-৯৩.৩%	৩.৬৬%	৭৯.৪৪%	১৬.৯%	৪%	৯৬%
আলু	৯২৪৫২৫	২৬৪৫৪	৮২২০০	০.২%	২১৩.৯%	২.৮৬%	৮.৮৯%	৮৮.২%	২৪%	৭৬%
পাট	৭৩৮০	৭৮০	৪৫০০	-৩২.৮%	-৭১০.৮%	১০.৫৭%	৬০.৯৮%	২৮.৫%	১৫%	৮৫%

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়

সামগ্রিকভাবে, সরকারি খাত ক্রমবর্ধমানভাবে গম বীজ (৩৭.২৭%) বিতরণে নিয়োজিত ছিল এবং বেসরকারি খাত ভুট্টা (৯২.২১%), সবজি (৭৯.৪৪%) এবং পাট (৬০.৯৮%) বীজ বিতরণে সক্রিয় ছিল। সিংহভাগ বীজের প্রয়োজনীয়তা কৃষকরা তাদের নিজেদের উৎস থেকে মিটিয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় কৃষকদের নিজস্ব উৎসের সরবরাহ বিশেষত: ডাল-বীজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, যেখানে আলু, তৈলবীজ, গম এবং পাট বীজের সরবরাহও যথেষ্ট ছিল।

এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরবর্তী করণীয়ের মধ্যে রয়েছে:

- **খামার পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি**

  ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। ভাল বীজ একক ভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের উপর সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ছিল। বর্তমানে বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং কৃষকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সাপেক্ষে কৃষকরা বীজের ঘাটতি কমাতে এবং সংরক্ষণজনিত ক্ষতি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অবশ্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান খুব সীমিত। কৃষকদের নিজেদের উৎপাদিত বীজ বিশুদ্ধতা এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, জীবনীশক্তি, রোগ এবং ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ প্রতিরোধের ক্ষমতার দিক দিয়ে সাধারণত নিম্ন মানের হয়ে থাকে। সুতরাং, ভাল বীজ উৎপাদন এবং তার সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও বীজ উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে পারে। এজন্য কৃষকগণ তাদের বীজ চাহিদা পূরণে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি বীজ উৎপাদন এবং বিপণনের সাথে জড়িত (যেমন ব্র্যাক, লাল তীর, সিনজেনটা, এসিআই) তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

  বাংলাদেশের কৃষিতে ২৩% মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করা হয় এবং প্রায় ২০% বীজ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষাপূর্বক প্যাকেটজাত করে কৃষকদের নিকট বিক্রি করা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট ৮০% বীজ পরীক্ষাবিহীনভাবে খোলা অবস্থায় বিক্রি করা হয়। বীজের একটা বিশাল অংশ (৮০%) মান সম্পন্ন নয় বলে উক্ত অংশের বীজ মানসম্পন্ন করা সম্ভব হলে অধিক

পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো। সময়মত ন্যায্য মূল্যে মানসম্পন্ন বীজ চাষিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারলে ফসল উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

- **ফসলে গুটি ইউরিয়ার (ইউএসজি) ব্যবহার বৃদ্ধি করা**

ইউরিয়া বাংলাদেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত নাইট্রোজেন সার। ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগ (broadcast application)-এর ফলে অপচয় হয়। এছাড়াও নাইট্রোজেন সার পরিবেশের বেশ ক্ষতি করে। অপচয় এড়ানোর জন্য গুটি ইউরিয়ার আবির্ভাব হয়েছে, যা বিশেষ করে ধান উৎপাদনে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। দানাদার ইউরিয়ার তুলনায় গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে ধানের ফলন বেশী হয়। শুষ্ক এবং বর্ষা মৌসুমে দানাদার ইউরিয়া ব্যবহার করে ধানের উৎপাদনে যথাক্রমে হেক্টর-প্রতি ৫.৭ টন এবং হেক্টর-প্রতি ৪.০ টন হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, একই মৌসুমে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারে ধানের উৎপাদন যথাক্রমে হেক্টর-প্রতি ৬.২ টন (শুষ্ক মৌসুমে) এবং হেক্টর-প্রতি ৫.১ টন (বর্ষা মৌসুমে)[৮৯] পাওয়া যায়। গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার একইভাবে আলুর ক্ষেত্রেও উচ্চ-ফলন পাওয়া যায়[৯০]। সনাতন পদ্ধতিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের তুলনায় দেশীয় উদ্ভাবন এপ্লিকেটরের মাধ্যমে প্রয়োগ করলে তিনগুণ বেশী ফল পাওয়া যায়[৯১] এবং পীঠের ব্যথাও এড়ানো যায়। গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর ব্যবহার করে একজন কৃষক একবারে ৬০টি গুটি ইউরিয়া ব্রিকেট (briquette) এবং ঘণ্টায় ১০ শতাংশ ধানক্ষেতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে পারেন[৯২]। ফলে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। ইউরিয়া, এমওপি, টিএসপি, ডিএপি সারে প্রদত্ত ভর্তুকি অব্যাহত রাখা এবং কৃষকদের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে আমদানিকৃত টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সার সরবরাহে জোরদারকরণ প্রয়োজন।

- **আইপিএম (IPM) এর মাধ্যমে শস্যের রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ**

আইপিএম-এর উপর কৃষক মাঠ-স্কুল (এফএফএস)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের কারণে কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে আইপিএম বাংলাদেশে ফসলের রোগ ব্যবস্থাপনায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (BRRI) এর মতে, আইপিএম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধান চাষিরা তাদের কীটনাশক ব্যবহার মাত্রা ৯০% ভাগ কমিয়ে শতকরা ১০% ভাগ বেশী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BARI) এর মতে, ৭৫%ভাগ কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আইপিএম প্রশিক্ষিত সবজি (বেগুন) চাষিরা ১২% ভাগ বেশী সবজি উৎপাদন করতে পারে । ফলশ্রুতিতে, কৃষক-মাঠ-স্কুল থেকে আইপিএম-এ প্রশিক্ষিত কৃষকদের মুনাফা সাধারণ কৃষকদের মুনাফার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আইপিএম কীটনাশক প্রয়োগ হ্রাসের মাধ্যমে পানি ও মাটির দূষণ হ্রাস এবং টেকসই জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করছে। একটি মাঠ গবেষণার ফলাফলে জানা যায় যে, ৮% কৃষক আইপিএম ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন[৯৩]। জৈব ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের সাথে সাথে আইপিএম-এর ব্যবহার সম্পৃক্ত করে এর পরিধি সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। আইপিএম-এর উপর কৃষকদের বিভিন্ন গণমাধ্যমে (টিভি, রেডিও) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকদের মাঠ-স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান আরও জোরদার করতে হবে।

- **যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ**

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সম্প্রসারণ তথা কৃষি কাজের গতি বৃদ্ধি, যান্ত্রিকশক্তি ব্যবহারের প্রসার, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সেচ অবকাঠামো প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিক ও বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলা এবং ফসল সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানোর প্রচেষ্টাসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রেখে আসছে । 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩' এবং '৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' উভয় দলিলেই কৃষিতে অধিকতর যান্ত্রিকীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ জনপ্রিয় করার জন্য আর্থিক প্রণোদনা যেমন: করমুক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়, নগদ প্রণোদনা, বেসরকারি খাতের (দৃষ্টান্তস্বরূপ- সাব-কন্ট্রাকটিং-এর মাধ্যমে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ক্রয়-পরবর্তী সেবা ইত্যাদি) উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যক্তিখাতে তথা বাণিজ্যিকভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনে আগ্রহীদেরকে স্বল্প-সুদে ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। অধিকন্তু, প্রান্তিক কৃষকদের উদ্দেশ্য করে এসব পদক্ষেপ বাড়ানো উচিত। ঐতিহ্যগত যন্ত্রের আদলে যান্ত্রিকীকরণ আর্থিক দিক দিয়ে সাশ্রয়ী এবং গ্রহণযোগ্য বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে।

- **কৃষি বিনিয়োগের জন্য ঋণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ**

বাজার-ভিত্তিক পরিবর্তন ও কৃষি বহুমুখীকরণ টিকিয়ে রাখতে ঋণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঋণের অপর্যাপ্ততা এখনও কৃষক এবং বর্গাচাষিদের উৎপাদনশীলতা ও আয় অর্জনের ক্ষমতাকে (বিশেষ করে বিনিয়োগ) ক্ষতিগ্রস্ত করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৬০ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৭৬.৪৬ বিলিয়ন টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০৯.৯৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে[৯৪]। কৃষিকার্য পরিচালনায় অতি প্রয়োজনীয় কিছু ব্যয় খাত যেমন- সেচ ব্যয়, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় প্রভৃতি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ সহায়তা দেয়া প্রয়োজন। কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিখাতে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, শস্য বহুমুখীকরণ, রবি মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উদ্ভাবন ও প্রতিকুল আবহাওয়া সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন ও পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন কৃষি ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৭.৫ বিলিয়ন টাকার ''ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য আর্থিক খাতের প্রকল্প''(২০১৪-২১)[৯৫] শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকারক খাতে বিনিয়োগ সহায়তার সুযোগ করে দিয়েছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল টেকসই উৎপাদনশীল বিনিয়োগের মাধ্যমে দুই ধাপে ঋণ এবং কারিগরি সহায়তা দিয়ে কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়ন।

- **উচ্চ-ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ**

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত এবং নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ধানের আধুনিক জাতগুলোর কৌলি-তাত্ত্বিক বা জেনেটিক অর্জন ত্বরান্বিতকরণ। এসআরডিআই-২০১৩ তথ্য মতে জানা যায় যে, দেশে ফসলি জমি হ্রাসের হার বার্ষিক ০.৭৩% পর্যন্ত বেড়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় য, কৃষি জমি সম্প্রসারণের সুযোগ ইতোমধ্যেই বেশ সীমিত হয়ে গেছে। দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশ-বান্ধব কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুতরাং ফসল খাতে স্থান-ভিত্তিক পুষ্টিমান সম্পন্ন, প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও তার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসলের মান উন্নয়নের জন্য কিছু বিলুপ্ত প্রায় ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রজনন কাজে ব্যবহার করাও প্রয়োজন। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি (খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, অধিক তাপমাত্রা ইত্যাদি) মোকাবেলায় গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং কৃষিতে জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও উচ্চ তাপ ইত্যাদি সহিষ্ণু ফসলের জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়া আরও করণীয়ের মধ্যে আছে:

- **উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে:**
  - মিউটেশন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন,
  - সাশ্রয়ী এবং বৈরী পরিবেশ বান্ধব হাইব্রিড ও ইনব্রিড জাতের উদ্ভাবনের জন্য স্থানীয় সক্ষমতা বাড়ানো,
  - উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা ও তাপ-সহিষ্ণু এবং স্বল্প পানি লাগে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবন,
  - স্বল্প মেয়াদী ও আগাম ফসলের জাত উদ্ভাবন,
  - অধিক শুষ্ক পদার্থ ও সংরক্ষণযোগ্যতা সম্পন্ন কন্দাল ফসলের জাত উদ্ভাবন।

- **উচ্চ ফলনশীল জাত সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে:**
  - যে এলাকায় সম্ভব সেখানে ফসলের স্থানীয় জাতের পরিবর্তে এলাকা উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ফসলের চাষ সম্প্রসারণ করা,
  - আধুনিক জাতসমূহের প্রজনন, ভিত্তি ও সার্টিফাইড বীজ উৎপাদন ও ভর্তুকি মূল্যে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা,
  - টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের বীজের সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।
  - মাঠ পর্যায়ে জৈব সার ব্যবহারের ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত প্রদর্শনী প্লট স্থাপন;
  - গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ আঞ্চলিক কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষক দিবসের আয়োজন করা;
  - খরা ও লবণাক্ততা থেকে শস্য রক্ষার জন্য উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা;
  - আধুনিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্প্রসারণ সময় কমিয়ে আনা;
  - উন্নত জাতের ফলের চারা কলম উৎপাদন ও কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে বিতরণ করা;
- **মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে:**
  - চর ও পাহাড়ি অঞ্চলের পতিত জমি চাষের আওতায় আনাতে ফসল উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশলের প্রদর্শনী স্থাপন;
  - চাষি পর্যায়ে এলাকা উপযোগী বিভিন্ন ফসলের প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন বীজ বর্ধন ও যথাসময়ে যোগান নিশ্চিত করা;
  - আকস্মিক বন্যা দুর্গত এলাকায় ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ভাসমান বেদে ধানের চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ;
  - রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে কেঁচো সারের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিত করা যেতে পারে।

কর্মসূচি ৪ - মৎস্য উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি ও মৎস্য চাষের উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে কর্মসূচি ৪-এর উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচিটি চারটি উপ-কর্মসূচি সমন্বয়ে গঠিত; (১) মানসম্পন্ন উপকরণ, পরামর্শ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে মৎস্য চাষের উন্নয়ন; (২) মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; (৩) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অবকাঠামোগত ও সেবা-খাতের উন্নয়ন; এবং (৪) দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাসমূহে চিংড়ি চাষের টেকসই উন্নয়ন ও এলাকাভিত্তিক জলাভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি । কর্মসূচি ৪ জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার কার্যপরিধি ১.৪-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, যার উদ্দেশ্য মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষির বহুমুখীকরণ।

৪.৪.১. কর্মসূচি ৪-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি:

সারণী -১৫ : সিআইপি কর্মসূচি ৪-এর অর্জনের অগ্রগতি

সিআইপি/এনএফপি-পিওএ ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী নির্দেশকসমূহ		২০০৭-২০০৮	২০০৯-২০১০	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	উৎস
স্থিরমূল্যে কৃষিজ জিডিপি-তে (বনজ সম্পদ উপ-খাত ব্যতীত) মৎস্য উপ-খাতের অবদান (%)		২৩.৬%	২২.৫%	২৫.৮%	২৬.৭৮%	২৭.৪৯%	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন		৫.০%	৭.৩%	৩.৮%	৫.২%	৬.৭%	মৎস্য অধিদপ্তর
বার্ষিক পোনা উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন		-৮.৬%	-৩.৬%	১২.২%	১২.১৭%	৯.৭৮%	মৎস্য অধিদপ্তর
নতুন মৎস্য জাত উৎপাদনের সংখ্যা		০	৩ (২০০৮-০৯)	০	০	০	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট
মৎস্য রপ্তানি	রপ্তানিতে মৎস্য উপ-খাতের অবদান (%)	৪.০%	২.৭%	১.৯%	১.৯৭%	১.৫১%	মৎস্য অধিদপ্তর
	মৎস্য রপ্তানিতে চিংড়ির অবদান	৮৪.৩%	৮৪.৭%	৮৪.৫%	৮৪.০৩%	৮৫.৮৮%	মৎস্য অধিদপ্তর

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে কৃষিজ জিডিপি-তে মৎস্যের অবদান উর্ধ্বমুখী

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষিজ জিডিপি-তে (বনজ-সম্পদ ব্যতীত) মৎস্য উপ-খাতের অবদান ছিল ২৭.৪৯%, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অবদানের তুলনায় ০.৭১% বেশী। লক্ষণীয় যে, বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে এই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে (সারণী-১৫)। এ অগ্রগতি সমাজ-ভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস-জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল-নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য-অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃ-খনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য-খাতে কাঠামোগত এবং অভ্যন্তরীণ আহরণ থেকে অভ্যন্তরীণ চাষে পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় গত ৩০ বছরে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫-গুন বেড়েছে। তবে বিভিন্ন কারণে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে তেমন উন্নতি দেখা যায়নি। কারণগুলো হল- আর্থিক সংস্থানের অভাব, উপকরণ-সরঞ্জাম স্বল্পতা, জ্ঞান ও কৌশল স্বল্পতা, কম লাভজনক ঐতিহ্যগত মাছ ধরার কৌশল, অপর্যাপ্ত পোতাশ্রয় এবং অবতরণ সুবিধার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি। মুক্ত-জলাশয় ও সামুদ্রিক-জলাশয়ের তুলনায় বদ্ধ-জলাশয়ের সুবিধাগুলো হল: উচ্চ উৎপাদনশীল প্রযুক্তি, মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য সুবিধা (spill over effects) এবং ধান-ক্ষেতে ধানের ইকো-সিস্টেম সেবার (rice eco-system services) সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য চাষের সম্প্রসারণ।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত

বাংলাদেশে বিগত ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মৎস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সার্বিকভাবে মৎস্য উৎপাদন ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১৬ লাখ মে: টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৪১.৩৭ লাখ মে: টনে উন্নীত হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদনের মধ্যে চাষ থেকে মৎস্য আহরণ ৩৯% থেকে বেড়ে ৫৬%-এ উন্নীত হয়েছে। মোট মৎস্য উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ আহরণ

লেখচিত্র ২০: মৎস্য উৎপাদনের গতিধারা

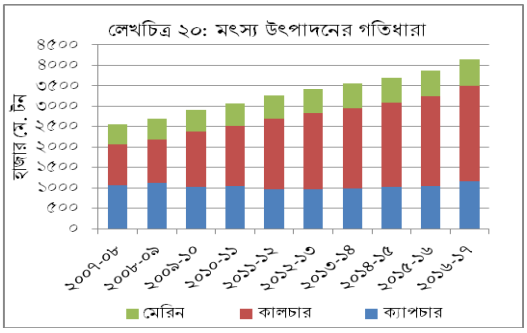

(চাষ ব্যতীত) এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বিশেষ অবদান রাখেনি। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সার্বিক মৎস্য উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ আহরণ ও সামুদ্রিক আহরণ যথাক্রমে ৪১% ও ২৭% থেকে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২৮% ও ১৫% হয়েছে। যা মূলত অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের অবদানকেই নির্দেশ করে (লেখচিত্র-২০)।

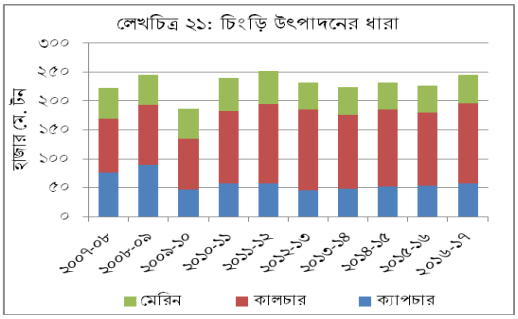

চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে

গত কয়েক বছর ধরে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চিংড়ির মোট উৎপাদন হয় ২৪৫ হাজার মে. টন, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরর তুলনায় ১১ হাজার মে.টন বেশী। অভ্যন্তরীণ চাষে চিংড়ির উৎপাদন ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৪৭% বৃদ্ধি পেয়েছে । একই সময়ে অভ্যন্তরীণ আহরণ এবং সামুদ্রিক জলাশয়ে চিংড়ির আহরণ আশাব্যঞ্জক নয় ।

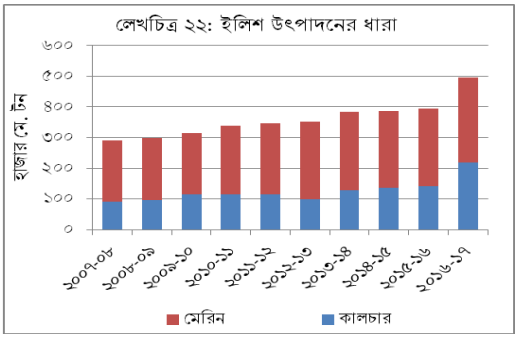

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত

ইলিশ উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদন ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ৭৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বিতরণ এবং ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম সহায়তা করেছে। এ বছর বাজারে ইলিশের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইলিশ মাছের মূল্য সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে ছিল। তবে বিভিন্ন নৃ-তাত্বিক তৎপরতা, অবকাঠামোগত পরিবর্তন (বাঁধ, ব্যারেজ ইত্যাদি), পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব; যেমন: নদীর অববাহিকায় পলি জমে নদীর অববাহিকা সংকীর্ণ হওয়ায় ইলিশ চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং ইলিশের বংশ-বৃদ্ধিতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে[৯৯] (লেখচিত্র-২২)।

মাছের পোনা উৎপাদন উর্ধ্বমুখী

২০০৭-০৮ অর্থবছর পরবর্তী সময়ের মাছের পোনা উৎপাদনের নিম্নমুখীতা কাটিয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে পোনা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০০৭-০৮, ২০০৯-১০ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছর-সমূহের বার্ষিক পরিবর্তন ছিল যথাক্রমে -৮.৬%,-৩.৬% ও -১৯.৬%। পরবর্তী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ষিক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি ঘটে ০.২% হয়, ফলে মোট উৎপাদন ১৯.৮% বৃদ্ধি পায়। ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক পরিবর্তন ছিল যথাক্রমে ১২.২% এবং ১২.১৭%। কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক পরিবর্তন পুনরায় হ্রাস পেয়ে ৯.৭৮% হয়েছে । ২০১৪ সাল থেকে 'ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পে'র মাধ্যমে ব্রুড মাছ ও রেণু পোনা উৎপাদন এবং ব্রুড মাছ আমদানি কার্যক্রম চলছে ।

মাছের নতুন জাত উদ্ভাবন

২০০৮-০৯ অর্থবছরে তিন প্রকার মাছের নতুন জাত উদ্ভাবন করার পর এ যাবত কোন মাছের নতুন জাত উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হয়নি (সারণী-১৫)। তবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই) গবেষণার মাধ্যমে চার ধরণের উচ্চ-ফলনশীল মাছের পোনার জাতের উন্নয়ন করেছে, যেগুলো হল দেশীয় উন্নত রুইমাছ, সুপার-গিফট তেলাপিয়া (Genetically Improved Farmed Tilapia), রাজ-পুঁটি ও কই মাছ । এ প্রতিষ্ঠানের আরও কিছু সাফল্য হলঃ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের কুঁচিয়া পোনা উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন[১০০]। মাছের নতুন জাত উদ্ভাবন না হওয়ার অন্যতম কারণ হল বিদেশ থেকে নতুন প্রজাতির হাইব্রিড মাছ আমদানি; যেমন: ভিয়েতনাম থেকে কই, ফিলিপাইন থেকে হাইব্রিড তেলাপিয়া[১০১]।

মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ ও আয়

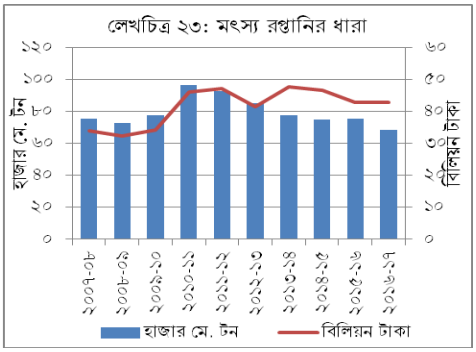

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬৮.৩০ হাজার মে. টন মৎস্য ও মৎস্য-পণ্য রপ্তানি করে ৪২৮৮ কোটি টাকা আয় করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ , যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান , রাশিয়া, সৌদিআরব, সিংগাপুর চীনসহ বিশ্বের ৫০টির অধিক দেশে মৎস্য ও মৎস্য-পণ্য রপ্তানি করা হয়। গত কয়েক বছরের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট মৎস্য রপ্তানি আয় ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র-২৩)। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে মোট রপ্তানির অংশ হিসাবে মাছ রপ্তানির অংশ ৪% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২% হয়। গত কয়েক বছরের পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট মৎস্য রপ্তানিতে চিংড়ির অবদান ছিল ৮৬%, যা সর্বোচ্চ। পরবর্তীতে মোট মৎস্য রপ্তানিতে চিংড়ির অবদান কমতে শুরু করে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাড়ায় ৮৫.৮৮%। বাংলাদেশ হতে গলদা, বাগদা ও হরিণা চিংড়ি, কোরাল, ডাটিনা, কামিলা, লাক্ষা, পোয়া, রুই, কাতলা, পাবদা, চাপিলা, আইর, পাঙ্গাশ, কই, শোল মাছ রপ্তানি হয়ে থাকে । চিংড়ির উৎপাদন ও সরবরাহ হ্রাস পাওয়া, অর্থনৈতিক মন্দা এবং আমদানিকারক দেশ বিশেষ করে ইউরোপ অঞ্চলে[১০২] ইউরোর বিনিময় হারে অস্থিতিশীলতার কারণে চিংড়ি রপ্তানি কম হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

৪.৪.২. নীতির উন্নয়ন/চলমান কর্মসূচি এবং পরবর্তী করণীয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ৪-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ৪৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-৪ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ১৬% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ০.৪৩%। চারটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ৪ গঠিত, যাতে ২৭টি বাস্তবায়িত, ২২টি চলমান এবং ১টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ৪.১-এর আওতাভুক্ত ১৪টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৬টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৭৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৪.২-এর আওতাভুক্ত ৩২টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৩৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ১৪টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ২৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ১টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ১৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৪.৩-এ কোন প্রকল্প নেই । উপ-কর্মসূচি ৪.৪-এর আওতাভুক্ত ৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ২টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও এই উপ কর্মসূচির আওতায় কোন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প নেই । সার্বিকভাবে কর্মসূচি ৪ এর আওতাভুক্ত ৪৯টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে মোট ৪৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ২২টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ২৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ১টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ১৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি ৪-এর আওতায় মোট বাজেট ব্যয় হয়েছে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৮০% বৃদ্ধি নির্দেশ করে। চলমান প্রকল্পের বাজেট বৃদ্ধি ও নতুন প্রকল্প চালু হবার ফলে আগের বছরের তুলনায় কর্মসূচি ৪-এর বাজেট সংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ৪-এর আওতায় মোট ২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৫৫%। কর্মসূচি ৪-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%। অপরদিকে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৭০% ও ৩০%। এ ধারা মৎস্য উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি ও মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

সামুদ্রিক মৎস্যের উন্নয়নে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটার সমুদ্র সৈকত এবং ১,৬৪,০০০ বর্গকিলোমিটারের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমুদ্র অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইতোমধ্যে "ব্লু গ্রোথ ইকোনমি" নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে বাংলাদেশ পাইলট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা,২০১৫ ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। এর লক্ষ্য হল সামুদ্রিক মৎস্যের উন্নয়ন, জীব-বৈচিত্র্য এবং সামুদ্রিক অঞ্চল সংরক্ষণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং অভ্যন্তরীণ ভোক্তাদের জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ। বাংলাদেশের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাছের ডিম ছাড়ার সময় সব ধরনের মাছ এবং কবচা (crustaceans) ধরা এবং মাছ ধরার জাহাজ চলাচল ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বলবৎ করা হয়েছে[১০৪]। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মাছ ধরার ব্যবসার সমর্থনে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন: সামুদ্রিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাছের প্রজাতি ও সংখ্যা নিরূপণে দ্রুত মূল্যায়ন, সামুদ্রিক মাছ এবং সি উইড (sea weed) উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, এবং দূরবর্তী অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ (২০০ মাইলের বেশী দূরত্বে, যা সামুদ্রিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে) আহরণে সহায়তা প্রদান।

সহনীয় মূল্যের ও গুণগত মানের মৎস্য খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো

বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য চাষিদের মাঝে উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক জ্ঞান ও কারিগরি কৌশল এমন ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যেন কম খরচে গুণগত মানের প্রোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ মাছের খাবার উৎপাদন করা সম্ভব হয়। মৎস্য খাদ্য হিসাবে ঘরে তৈরি সরিষার খৈল এবং চালের কুড়া তুলনামূলক ভাবে সস্তা, তবে তা সাধারণ মানের মাছের খাবার; অন্যদিকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার দামী এবং তা যোগাড় করা সময়সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (USAID) কর্তৃক উপার্জন ও পুষ্টির জন্য মৎস্য চাষ (একুয়াকালচার ফর-ইনকাম এন্ড নিউট্রিশন) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য মৎস্য চাষের ওপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গৃহস্থালির আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করা [১০৫]। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে এই প্রকল্প ৬২টি পশু খাদ্য-কারখানা (feed mill) প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ৪৩০ জন চাষিকে পশু/মৎস্য খাদ্যের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IFPRI), ওয়ার্ল্ড ফিস সেন্টার এবং সেভ দ্যা চিলড্রেনের যৌথ গবেষণায় মলা মাছের উৎপাদনের মাধ্যমে ভিটামিন এ এর চাহিদা পূরণসহ বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে[১০৬]।

'বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড'-এর কার্যক্রম অব্যাহত

আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে মৎস্য মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ তিনটি মৎস্য মান-নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি "বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড" কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। ঢাকার ল্যাবরেটরিটি একটি অত্যাধুনিক রেফারেন্স হিসাবে সাভারে কার্যক্রম শুরু করেছে । মৎস্য ও মৎস্য-পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর সর্বশেষ অডিট রিপোর্টে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পরীক্ষার মানকে ইউরোপের মানের সমতুল্য উল্লেখ করে প্রতিটি কনসাইনমেন্টের সঙ্গে পরীক্ষার সনদপত্র সংযুক্ত-করণের শর্ত প্রত্যাহার করেছে ।

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৬১টি নদী আছে। মরা নদীর সংখ্যা ১৯০টি এবং নদীর গভীরতা ৯৯% হ্রাস পেয়েছে। শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো নদীতেই পানির স্রোত আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়। নদীতে পানির স্রোত সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসায় শতকরা ৯৭ ভাগ নদীতে মাছের প্রজাতির সংখ্যা ও শতকরা ৮৮ ভাগ নদীতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে । আগামী ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বর্ধিত জনসাধারণের জন্য প্রক্ষেপিত মৎস্য চাহিদা ৪৫.২৮ লাখ মে. টন, যা অর্জনের জন্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে ।

জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান

একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবী-জেলেদের নিবন্ধন ও ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলের মাঝে পরিচয় বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে । তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) এবং জলদস্যুর আক্রমণ, বাঘের থাবা, কুমির ও

সাপের কামড়ের কারণে মৃত্যবরণকারী জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে । প্রকল্প মেয়াদকালে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৫৮৭টি জেলে পরিবারকে মোট প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তিতে জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম চালু রাখার সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহের জন্য রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন নামে রাজস্ব খাতে ১টি নতুন অর্থনৈতিক কোড অনুমোদিত হয়েছে ।

মৎস্য সেক্টরে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন

প্রায় ১৫ লক্ষ নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্যখাতে জড়িত । মহিলারা স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় কাজ করছে । স্থায়ীভাবে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৪৬.৭০% মহিলা যাদের বেতন প্রতি মাসে ন্যুনতম ৫০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫০০০ পর্যন্ত । জেলে পরিবারগুলোকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে ইলিশ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জেলে পরিবারের মহিলাদের সমন্বয়ে কমিউনিটি সঞ্চয়ী গ্রুপ গঠন করা হয়েছে । অভয়াশ্রম এলাকার গ্রামসমূহে মে ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩,০৬৯ জন মহিলাদের নিয়ে ১০০টি কমিউনিটি সঞ্চয়ী গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যেখানে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের পক্ষ থেকে ২৯টি কমিউনিটি সঞ্চয়ী গ্রুপকে ২৫০০০ টাকা করে মোট ৭,২৫০০০ টাকা ম্যাচিং ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। সঞ্চয়ী গ্রুপগুলো ম্যাচিং ফান্ড এবং সঞ্চয় থেকে সদস্যদের বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কাজের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে । এ সহায়তার মাধ্যমে মহাজন/ দাদনদারদের ওপর জেলেদের নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে ।

এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম

- বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয় করে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ-মাত্রা নির্ধারণের জন্য পেলাজিক, ডিমারসেল ও ল্যান্ডবেইজড জরিপ পরিচালনা করতে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি জোরদারকরণের লক্ষ্যে উক্ত জাহাজে স্যাটেলাইট প্রযুক্তিনির্ভর vessel tracking system স্থাপনের কাজ চলছে;
- রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.২৮ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জলাশয় সংস্কার, খনন ও পুন:খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পতিত ও অবক্ষয়িত জলাশয়গুলো মাছ চাষের উপযোগী করা হচ্ছে; এবং
- মৎস্যের মান নিয়ন্ত্রণ-কল্পে মৎস্যে রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ রোধে সরকার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে ।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৬টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে । অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্ত প্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ একঠোট, টেরিপুটি, মেনি, রাণী, গোড়া গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, বাইম ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৫৫৮.৩ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ১২৫১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে ।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১৭ জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২,৩৮,৬৭৩টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মোট ৩৮,১৮৮ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে । জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ-কালীন সময় ছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ-কালীন ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে মোট ৩,৫৬,৭২৩ টি পরিবারকে মোট ৭,১৩৪ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ।

এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরবর্তী কার্যক্রম:

- **প্রধান প্রধান মাছের উন্নত জাতের পোনা সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ**

  মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির স্থায়িত্ব ধরে রাখার জন্য পোনা উৎপাদনের অস্থিতিশীলতা দূর করা এবং ভাল মানের পোনা সহজলভ্য করা প্রয়োজন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পোনা উৎপাদন ভাল হয়েছে, যার স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখা প্রয়োজন। আয় ও পুষ্টির জন্য মৎস্য চাষ প্রকল্প তেলাপিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে; এই প্রকল্পের ভিত্তিতে সরকারি এবং বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের শুধুমাত্র তেলাপিয়া নয়, সেই সাথে অন্যান্য প্রধান মৎস্য প্রজাতির উপরও প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। উন্নত মানের প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছের খাবার কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভালো অনুশীলন টেকসই করা জরুরী। এই অগ্রগতি যদি স্থায়িত্ব পায়, তাহলে বাংলাদেশের মৎস্য খাত আরও সমৃদ্ধ হবে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

- **খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভিটামিন-এ ঘাটতি পূরণ**

  গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ পুষ্টি পরিস্থিতির অগ্রগতি হলেও ভিটামিন-এ, আয়রন ও জিংক সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ এখনও অপর্যাপ্ত রয়েছে । বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধ-দানকারী মহিলাদের ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ছোট মাছ, যেমন- মলা ও ঢেলা মাছ সরবরাহ করা গেলে 'ভিটামিন-এ'-এর ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। বাড়ির পুকুরে অন্যান্য মাছের সাথে মলা মাছ চাষ করলে সার্বিক মাছ উৎপাদনে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনা । মলা-মাছ পুষ্টি সমৃদ্ধ[১০৮] হওয়ায় এর চাহিদা বেড়েছে । বিশেষ করে নগর এলাকায় মলা মাছের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে[১০৯]। ফলে অন্য মাছের সাথে মলা মাছ চাষ করে বাজারে সরবরাহ মাধ্যমে খামারিদের আয়-বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে ।

- **সামুদ্রিক মাছের সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন**

  যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সাথে সাথে মধ্য-স্বত্বভোগীদের নিকট তুলনামূলক কম দামে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। 'বাংলাদেশ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানি সংস্থা'র মতে উন্নত কারিগরি প্রযুক্তির অভাবে মাছকে দীর্ঘক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যায়না এবং হিমায়িত সুবিধারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর ফলে বছরে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার মেট্রিক টন মাছ নষ্ট হয়ে যায়। 'খরচ অংশীদারিত্ব প্রকল্প'-এর আওতায় মৎস্য-সংগ্রহ কেন্দ্র ও সংগ্রহ-পয়েন্টের মাধ্যমে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন করত: জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে। একইভাবে স্বল্প খরচের মাছের সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে।

- **উচ্চমূল্যের সামুদ্রিক মৎস্যের উপর গবেষণা জোরদারকরণ**

  উচ্চমূল্যের সামুদ্রিক মৎস্য, বিশেষ করে ভেটকি-জাতীয় ও রূপচাঁদা-জাতীয় মাছসমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে, যা মোট মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

- **প্রজননের মাধ্যমে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ**

  অনেক দেশীয় মাছের জাত রয়েছে যেগুলোকে প্রজননের মাধ্যমে রক্ষা এবং নতুন দেশীয় মাছের জাত উৎপাদন করার গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। এটা একদিকে দেশে বিদেশী মাছের জাতের বাছ-বিচারহীন প্রবর্তন কমাতে সাহায্য করবে, অপরদিকে, দেশীয় প্রজাতি এবং জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে সাহায্য করবে এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের আয় বৃদ্ধি করে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করবে। চিংড়ির পর কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির সম্ভাবনা উজ্জ্বল । বর্তমানে সারাদেশে ২.৫-৩.০ লাখ লোক কাঁকড়া আহরণ ও বিপণন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কুচিয়া ও কাঁকড়ার বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

- **মাছের অভয়ারণ্য বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র্য সুরক্ষা**

  বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ, মূল্যবান ও বৈচিত্র্যময় জীবন্ত জলজ সম্পদে ভরপুর অভ্যন্তরীণ ইকো-সিস্টেম বিরাজমান। অবশ্য প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে জীব-বৈচিত্র্য, বিশেষ করে মাছের জাত এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির খোলা পানিতে বিচরণ বহুলাংশে হ্রাস পাচ্ছে। জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাছের অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশী জাতের মাছকে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার পাশাপাশি সংরক্ষণ করা যাবে এবং দেশী জাতের বৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা গেলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। 'ওয়ার্ল্ড

ফিশ সেন্টার' কর্তৃক কমিউনিটি-ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় ১০০টি জলাশয়ে ১৫০টি মাছের অভয়ারণ্য[১১০] স্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মাছ উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। নদী এবং প্লাবন ভূমিতে স্থায়ী অভয়ারণ্য স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সহায়তায় স্থানীয় জাতের মাছের প্রবর্তন, প্রজনন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।

- **মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি**

  অসময়ে বন্যা, অসময়ে অতিবৃষ্টি, ঘন ঘন সাইক্লোন, টর্নেডো, জলোচ্ছাস এর মত দুর্যোগ বৃদ্ধি ও নদীতে লবণাক্ত পানির পরিমাণ বৃদ্ধিতে মাছের উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । মৎস্যজীবীদের জন্য বীমা পলিসি গ্রহণ করা যেতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন দক্ষতায় এবং পরোক্ষভাবে মাছের বাজার মূল্য এবং উৎপাদন খরচে প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়াতে দেশের বিভিন্ন এলাকার মৎস্য চাষের পদ্ধতি, মৎস্য চাষের দক্ষতা বৃদ্ধি, ইকো-সিস্টেমের প্রভাব, সম্পর্কে মৎস্য চাষিদেরকে সম্যক ধারণা দিতে হবে।

- **মৎস্য-চাষে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ**

  মৎস্যচাষে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে একদিকে যেমন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে ক্ষুধা- ও দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান সহজ হবে। গ্রামীণ মহিলাদের মৎস্য উৎপাদনের জন্য পুকুর তৈরি , সহজশর্তে অর্থায়ন ,কারিগরি সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। মহিলাদের আধুনিক যন্ত্রপাতিবিষয়ে প্রশিক্ষণ দান প্রযুক্তি , করতে হবে

- **অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ**

  - মৎস্য-চাষ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম-এর ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে;
  - মৎস্য চাষিদের জন্য "মৎস্য ইনস্যুরেন্স"-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ;
  - খোলা জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে ;
  - মৎস্য চাষিদের বিশেষ প্রণোদনা ও নির্বাচিত ক্ষেত্রে চাষের উপকরণে ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে ; এবং
  - চিংড়ি ও চিংড়ির পোনা উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান এরূপ উপকূলীয় এলাকায় প্রকৃতিগতভাবে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে চিংড়ি উৎপাদনে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৪.৫. কর্মসূচি ৫ - প্রাণিসম্পদ, বিশেষ করে পোল্ট্রি এবং দুগ্ধ-খামারের উন্নয়ন

কর্মসূচি ৫-এর আওতায় উন্নত-প্রযুক্তি গ্রহণ, প্রাণি-স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং উপযোগী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাণি-সম্পদের উৎপাদন টেকসইভাবে বৃদ্ধি করার জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র ১.৪-এ কৃষি বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে প্রাণি-সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কৃষি বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে প্রাণি-সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে- (১) প্রাণি স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের এবং নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদকে রোগমুক্ত রাখতে হবে; (২) কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নত জ্ঞান এবং পরামর্শ সেবার মাধ্যমে পারিবারিক পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; (৩) সরকারি এবং বেসরকারি সহযোগিতায় গুণগত মানের উপকরণ ছড়িয়ে দিতে হবে; এবং (৪) প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

৪.৫.১. কর্মসূচি ৫-এর লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি

সারণী - ১৬ : সিআইপি কর্মসূচি ৫-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি

সিআইপি/এনএফপি-পিওএ ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী নির্দেশকসমূহ		২০০৭-২০০৮	২০০৯-২০১০	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	উৎস
স্থির মূল্যে কৃষিজ জিডিপি-তে (বনজ সম্পদ উপ-খাত ব্যতীত) প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের শতকরা অবদান		১২.৭%	১২.৪%	১২.১%	১৪.২১%	১২.২৪%	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
মোট উৎপাদন	ডিম (মিলিয়ন)	৫৬৫৩	৫৭৪২	১০৯৯৫	১১৯১২	১৪৯৩৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
	দুগ্ধ (মিলিয়ন মে টন)	২.৬৫	২.৩৭	৬.৯৭	৭.২৭	৯.২৮	
	মাংস (মিলিয়ন মে টন)	১.০৪	১.২৮	৫.৮৬	৬.১৫	৭.১৫	
কৃত্রিম প্রজননের বার্ষিক পরিবর্তন		১.৫৬%	১৫.২৫%	৯.২৮%	৬.২৭%	৬.২০%	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত মুরগীর সংখ্যায় বার্ষিক পরিবর্তন		৩৩৩%	২৭৪%	-৬৬.৭%	কোন মুরগী মারা যায়নি	কোন মুরগী মারা যায়নি	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সার্বিক কৃষিজ জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদের অবদান স্থিতিশীল

২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষিজ জিডিপি-তে প্রাণি-সম্পদের অবদান স্থিতিশীল ছিল। বিগত ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কৃষিজ জিডিপি-তে প্রাণি-সম্পদের অবদান ছিল ১২.৭%, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেড়ে ১২.২৪% হয়, যা পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ০.০৭% বেশী (সারণী-১৬)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতে ৩.৩১% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়; অন্যদিকে ফসলের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ছিল ১.৯৬% ও মৎস্যের ক্ষেত্রে ছিল ৬.২৩% ।

মাংস, দুগ্ধ এবং ডিমের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশে ১.০৪ মিলিয়ন মে. টন মাংস উৎপাদিত হয় এবং পরবর্তী নয় বছর সময়কালে মাংস উৎপাদন ৬.১১ মিলিয়ন মে. টন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.১৫ মিলিয়ন মে. টনে দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাংসের উৎপাদন পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ১৬% বৃদ্ধি পায় (লেখচিত্র-২৪)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে দুগ্ধ উৎপাদন ৯.২৮ মিলিয়ন মে: টন হয়, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২৭.৬৪% বেশী, এক্ষেত্রে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২.৬ মিলিয়ন টন দুগ্ধ উৎপাদন হয়েছিল (লেখচিত্র-২৪)। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ডিমের উৎপাদন ৬ মিলিয়ন থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৪.৭ মিলিয়ন হয়, তবে পরবর্তী ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক গড়ে ১১% হারে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে ডিমের উৎপাদন ছিল ১৫ মিলিয়ন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১২ মিলিয়ন এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা ছিল ৬ মিলিয়ন (সারণী ১৬)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনপ্রতি দুগ্ধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা ছিল যথাক্রমে দৈনিক ১৫৭.৯৭ মিলি-লিটার, দৈনিক ১২১.৭৪ গ্রাম ও বার্ষিক ৯২.৭৫ টি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫

শতাংশ মানুষের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণের নিমিত্ত দুগ্ধ, মাংস ও ডিমের জনপ্রতি প্রাপ্যতা যথাক্রমে দৈনিক ১৫০ মিলিলিটার, দৈনিক ১১০ গ্রাম ও বার্ষিক ১০৪ টি-তে উন্নীত হতে পারে ।

কৃত্রিম প্রজনন এবং পশুর জাত উন্নয়ন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রাণি-সম্পদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজননের বার্ষিক পরিবর্তনের হার ছিল ১.৫৬%, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেড়ে ৬.২% হয়েছে। কৃত্রিম প্রজননে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বার্ষিক পরিবর্তনের হার ছিল ১৫.৩%, যা এই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে কৃত্রিম প্রজননে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হার ছিল মাত্র ২.৯%; (সারণী ১৬)। প্রোজেনি পরীক্ষার মাধ্যমে জাত-উন্নয়ন (ব্রিড আপ-গ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনি টেস্ট) প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ বিভাগ উন্নতমানের উচ্চ উৎপাদনশীল ষাঁড় উৎপাদন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ বিভাগ (ডিএলএস) ১১ লক্ষ ৮০ হাজার ৮০ ডোজ তরল ও ৩০ লক্ষ ৩ হাজার ৮৫৫ ডোজ গভীর হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয় ।একই সময়ে ২ হাজার ৪৪১টি ছাগীকে প্রাকৃতিক প্রজনন সেবা দেয়া হয়েছে এবং ১২ লক্ষ৩৭ হাজার ৯৫টি সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে ।

পোল্ট্রি মৃত্যুর হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে

২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে পোল্ট্রি মৃত্যু-হার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে পোল্ট্রি মৃত্যু-হারের পরিবর্তন ছিল ৩৩৩%, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯৫%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯৮% এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬৭% ছিল । ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে দেশে কোন পোল্ট্রির মৃত্যু ঘটেনি। এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ বিভিন্ন ধরনের পোল্ট্রির রোগের নজরদারির জন্য 'জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা'-এর সহায়তায় 'যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (USAID)'-এর অর্থায়নে দেশের ২৬০টি উপজেলায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। অতিরিক্ত প্রাণি-চিকিৎসক এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা পোল্ট্রি রোগ ও মৃত্যু নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ক্ষুদে-বার্তা (SMS) ও সেবা-কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পোল্ট্রি রোগের নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে রোগ বিশ্লেষণের ফলাফল পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রাণি-চিকিৎসকের নিকট পাঠানো হয়। ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সাথে সাথে তথ্য আদান-প্রদানের ফলে অতি দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা নেয়ায় এভিয়েন ফ্লুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে[১১২] যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়, যা দেশে এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করেছে।

লেখচিত্র ২৪: দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন

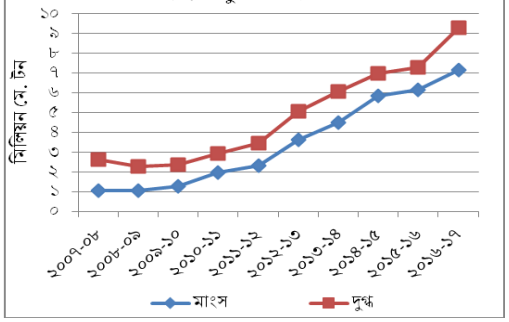

প্রাণি-সম্পদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি অব্যাহত

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাণি-সম্পদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৪ মিলিয়ন, যা ২০০৭-০৮ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ২৭.৬৪% ও ২.৩৯% বেশী। দেশে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পোল্ট্রির সংখ্যা ৩০.৪৭% ও গবাদি-পশুর সংখ্যা ১২.৮৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছাগলের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক ২৫.৯৩ মিলিয়ন আর গরুর সংখ্যা ছিল ২৩.৯৪ মিলিয়ন। বিগত ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত পরিবীক্ষণ সময়ে দেশে ছাগল ২০.২৭%, ভেড়া ২২.৩০%, মহিষ ১৭.৪৬% ও গরু ৪.৫৪% উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য প্রাণি-সম্পদের তুলনায় গরুর উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম হওয়ার মূল কারণ গরুর চারণ-ভূমি হ্রাস, ফলে গড়ে একটি গরুর গড় ওজন ১০০-১৫০ কেজি হয়, যা বেশ কম এবং বাংলাদেশে ষাঁড়ের গড় ওজন ১৫০-২৫০ কেজি হয়, যা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের তুলনায় ২৫%-৩৫% কম[১১৩]। পাখি-জাতীয় প্রাণির মধ্যে ২০৬-১৭ অর্থবছরে পোল্ট্রির সংখ্যা ছিল ২৭৫ মিলিয়ন, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২৯.৫১% এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২.৫৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হাঁসের সংখ্যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ৩৫.৫৯% এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ৩.৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-১৭)।

সারণী -১৭ : বাংলাদেশে প্রাণি-সম্পদের সংখ্যা

প্রাণির নাম	প্রাণি-সম্পদের সংখ্যা (মিলিয়ন)			বৃদ্ধির হার (%)	
	২০০৭-২০০৮	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০০৭-০৮ – ২০১৬-১৭	২০১৫-১৬ - ২০১৬-১৭
গরু	২২.৯	২৩.৮	২৩.৯	৫%	০.৬%
মহিষ	১.৩	১.৬	১.৫	১৭%	০.৭%
ভেড়া	২.৮	৩.৪	৩.৪	২২%	১.৮%
ছাগল	২১.৬	২৫.৮	২৫.৯	২০%	০.৬%
মোট তৃণভোজী	৪৮.৫	৫৪.৬	৫৪.৭	১৩%	০.৭%
মুরগী	২১২.৫	২৬৮.৩	২৭৫.২	৩০%	২.৫%
হাঁস	৩৯.৮	৫২.২	৫৪.০	৩১%	৩.৪%
মোট পাখি	২৫২.৩	৩২০.৫	৩২৯.২	৩০%	২.৭%
মোট প্রাণিসম্পদ	**৩০০.৮**	**৩৭৫.১**	**৩৮৪.০**	**২৮%**	**২.৪%**

সূত্র : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৪.৫.২. নীতি উন্নয়ন/ চলমান কর্মসূচি এবং পরবর্তী করণীয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ৫-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ২৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-৫ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের প্রায় ১৬% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ০.২৭%। চারটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ৫ গঠিত, যাতে ১৪টি বাস্তবায়িত, ২৩টি চলমান এবং ১টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ৫.১-এর আওতাভুক্ত ৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ছয়টি অর্থবছরে ৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৩টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৫.২-এর আওতাভুক্ত ৯টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ছয়টি অর্থবছরে ৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৬টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ১টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ১৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৫.৩-এর আওতাভুক্ত ২০টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ছয়টি অর্থবছরে ৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ১৩টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৫.৪-এর আওতাভুক্ত কোন প্রকল্প ছিল না। সার্বিকভাবে কর্মসূচি ৫ এর আওতাভুক্ত ৩৮টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ছয় অর্থবছরে মোট ২৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ২৩টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ১১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ১টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ১৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি ৫-এর আওতায় মোট বাজেট ব্যয় হয়েছে ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৬১% বৃদ্ধি নির্দেশ করে। চলমান প্রকল্পের বাজেট বৃদ্ধি নতুন প্রকল্প চালু হবার ফলে আগের বছরের তুলনায় কর্মসূচি ৫-এর বাজেট সংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ৫-এর আওতায় মোট ১৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৬৮%। কর্মসূচি ৫-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৭৮% ও ২৪%। অপরদিকে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৯৪% ও ৬%। এ ধারা প্রাণিসম্পদ , বিশেষ করে পোল্ট্রি এবং দুগ্ধ খামারে সরকারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

জাত উন্নয়ন কর্মসূচি

'বাংলাদেশ এবং চীনের যৌথ সহযোগিতায় গরু ও মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প'টি ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে[১১৪]। এই প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার উথুরায় গরু ও মহিষের বাণিজ্যিক প্রজনন খামার ও গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে, যা গবাদি-পশু উপখাতে কৃত্রিম-প্রজননের জন্য উচ্চমানের শুক্রাণু সরবরাহ করছে। কৃত্রিম-প্রজননের কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ কার্যক্রমের এলাকা বিস্তৃত করার জন্য "কৃত্রিম প্রজননের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন" প্রকল্প (৩য় পর্যায়) চালু করা হয়েছে। এছাড়াও 'বিফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে বার্মিজ ষাঁড়ের শুক্রাণু ব্যবহার করে মাংসের জন্য ষাঁড় উৎপাদন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম বারের মত 'বাফেলো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে কৃত্রিম-প্রজননের মাধ্যমে দুগ্ধ-প্রদানকারী মহিষ উৎপাদন শুরু হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সোনালী জাতের মুরগী উন্নয়ন করেছে, যা মাংসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আয়-বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। সম্প্রতি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য সাদা পালকের 'ডাবালী' (সিপিএফ-২) লেয়ার মুরগী এবং বিভিন্ন রংয়ের 'স্বর্ণালী' (সিপিএফ-৩) মুরগীর জাত উন্নয়ন করছে।

প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণি-সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এবং কৃষি জলবায়ু অঞ্চলভেদে অনগ্রসর এলাকার কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি (ফসল, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য) এবং পানির সু-ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আইএপিপি প্রকল্প (২০১১-১৬) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১৪,৩৯,৯৮৪ জন বেকার যুবক, যুব মহিলা, দুস্থ মহিলা , ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী পালন , খাদ্য বিক্রেতা ও ঘাস চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে যা পূর্বের বছরের তুলনায় ১৩.৬৭ শতাংশ বেশী ।

টিকাদান সুবিধাদি এবং প্রাণি সেবাসমূহ সম্প্রসারণ

বাংলাদেশে বিগত চার বছরের মধ্যে ২০১১-১২ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর জন্য ১৭ প্রকারের প্রায় ৮৪ মিলিয়ন ডোজ টিকা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪১০ মিলিয়ন ডোজ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০৫.৬ মিলিয়ন ডোজ টিকা উৎপাদন করা হয়েছে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৬০ মিলিয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ৬২.৬ মিলিয়ন গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীকে চিকিৎসা-সেবা প্রদান করেছে। এছাড়াও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর রোগ প্রতিরোধের জন্য ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পোলট্রির জন্য ১৭৭.১ মিলিয়ন ও জাবর-কাটা প্রাণির জন্য ১৪.৩ মিলিয়ন টিকা উৎপাদন করাসহ ১৮৬.৬ মিলিয়ন পোলট্রি ও ১২.৬ মিলিয়ন জাবর-কাটা প্রাণিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও পোলট্রির জন্য ২২৪ মিলিয়ন ও জাবর-কাটা প্রাণির জন্য ১২.৩ মিলিয়ন টিকা উৎপাদন করাসহ ২২৭.৯ মিলিয়ন পোলট্রি ও ১৩.৭ মিলিয়ন জাবর-কাটা প্রাণিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০.৮ মিলিয়ন প্রাণি এবং ৮০.১ মিলিয়ন পোলট্রিকে চিকিৎসা-সেবা দেয়া হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও পোলট্রির জন্য ২৩৮ মিলিয়ন ও জাবর-কাটা প্রাণির জন্য ১৬.১ মিলিয়ন টিকা উৎপাদন করাসহ ২৪৭.২৫ মিলিয়ন পোলট্রি ও ১৭.৮১ মিলিয়ন জাবর-কাটা প্রাণিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে।

বায়ো-গ্যাস উৎপাদনের জন্য কারিগরি সহায়তা সম্প্রসারণ

বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ বাড়িতে রান্নার জন্য ধানের কুড়া, গোবর বা কাঠের মত বিভিন্ন ধরণের জৈব-বস্তু ব্যবহার করা হয়। ফসল উৎপাদনে সার হিসাবে গোবর ব্যবহার করা ছাড়াও রান্নার জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য জৈব-পদার্থ দিন দিন দুর্লভ ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে এবং এর অভাবে মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে[১১৫]। ফলে ভবিষ্যতে বায়োগ্যাস উৎপাদন জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৪২৪ টি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫০০ টি এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৩৩০ টি নতুন বায়োগ্যাস-প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপাদন সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২৪৪ টি নতুন বায়োগ্যাস-প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জার্মান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড)-এর আর্থিক সহযোগিতায় 'অবকাঠামো উন্নয়ন

কোম্পানি লিমিটেড (Infrastructure Development Company Limited)'-এর আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর 'টেকসই জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

অন্যান্য কার্যক্রমের সহযোগিতায়

- প্রাণিখাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য ইতোমধ্যে মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন এবং পশু খাদ্য বিধিমালা অনুমোদিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করেছে। উক্ত অভিযানে ১,৪৯,০৬৮ কেজি প্রাণিখাদ্য জব্দকরণসহ ১২,৮৮,৮০০ টাকা জরিমানা আদায় ও ২,৭৬৬ কেজি ভেজাল প্রাণিখাদ্য বিনষ্ট করা হয়েছে। একই সময়ে প্রাণিখাদ্যে ভেজাল প্রদানের দায়ে ১ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রাণিখাদ্যে বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভা/সেমিনার, বিজ্ঞপ্তি প্রচার, মাইকিং, বিলবোর্ড স্থাপন, লিফলেট বিতরণ ও স্টেক-হোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আবহাওয়া উপযোগী সংকর-জাতের বিফ-ব্রিড উন্নয়নের লক্ষ্যে আমেরিকা থেকে ১০০% ব্রাহমা জাতের হিমায়িত সিমেন আমদানি করে মাংসল জাতের বাছুরের উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাত্র দুই-বছরে এই জাতের সংকর গরু ৬০০ কেজি ওজন লাভ করতে সক্ষম, যা মাংসের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। এছাড়াও সংকর জাতের গাভী প্রতিদিন ১৮ কেজি দুগ্ধ দানে সক্ষম। জুন, ২০১৬ মাস পর্যন্ত ১৪০৭ টি ব্রাহমা সংকর ষাঁড় ও ১৩৪৯ টি ব্রাহমা সংকর বকনা উৎপাদিত হয়েছে, যাদের দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার দেশীয় জাতের তুলনায় ৪-৫ গুন বেশী ।
- ট্রান্স-বাউন্ডারি রোগ প্রতিরোধের জন্য জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমান বন্দরসমূহে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ২৪টি এনিমেল কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশন এর কার্যক্রম চালু হয়েছে ।
- কেন্দ্রীয় প্রাণি-পুষ্টি গবেষণাগারে প্রাণিখাদ্য বিশ্লেষণ করে প্রাণিখাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয় । এছাড়াও ২২টি বৃহত্তর জেলায় প্রাণি-পুষ্টি গবেষণাগার হতে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সেবা দেয়া হচ্ছে ।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর "নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের প্রতিশ্রুতি সুস্থ সবল জাতি" প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ২৩ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ২০১৭ উদযাপিত হয় । এই সেবা সপ্তাহে ৭৩টি স্টল-সমৃদ্ধ প্রাণিসম্পদ মেলা, ৭টি সেমিনার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্কুলে স্কুল ফিডিং ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং বিনা মূল্যে প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম পরিচালিত হয় ।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫টি ডিসিপ্লিনের আওতায় মোট ৬১টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে । মুন্সিগঞ্জ জাতের গাভীর দুধের পুষ্টিগুণ (ল্যাকটোজ ৫.৩%) ও কৌলিকমান বেশী হওয়ায় মুন্সিগঞ্জ জাতের ষাঁড়ের সমন্বয়ে একটি "ব্রিডিং বুল ষ্টক" তৈরি করা হয়েছে এবং উক্ত ষ্টক হতে কৃত্রিম উপায়ে বীজ সংগ্রহ করে খামারী পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে । বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১ বা বিসিবি-১ নামে মাংসল জাতের গরুর জাত উন্নয়ন করেছে । প্রাণিখাদ্য সংকট নিরসনে উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য লবণাক্ত সহনশীল ঘাসের জাত উদ্ভাবন, হাওর এলাকার জন্য ফডার উৎপাদন মডেল উদ্ভাবন, হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস উৎপাদন বিষয়ক গবেষণা চলমান রয়েছে ।

এই ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম:

- **সম্মুখ এবং পশ্চাৎ যোগসূত্র (backward and forward linkage) শক্তিশালীকরণ**

  প্রাণি-খাদ্যের উৎপাদন স্বল্পতা ও উচ্চমূল্যের কারণে বাংলাদেশে প্রাণি-সম্পদের মালিকগণ প্রাণিদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুষম খাদ্য দিতে পারেন না। প্রাণি-খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, কৃমিরোধে টিকাদান কর্মসূচি, প্রজনন-সেবা, প্রাণি-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, প্রাণি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ করা প্রয়োজন।

এছাড়াও দুগ্ধ-খাতে স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার, প্রাথমিক দুগ্ধ-প্রক্রিয়াকরণ, দুগ্ধ-সংগ্রহ সুবিধা প্রতিষ্ঠা ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোতে খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়গুলো কম-বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঐতিহ্যগতভাবে প্রাথমিক দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সহজ, মসৃণ, নিরাপদ হওয়া দরকার। দুগ্ধ খামারগুলোর দুগ্ধ-বাজারের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

- **প্রাণিসম্পদ পণ্য উন্নয়ন ও এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ**

পত্রিকা এবং গণ মাধ্যমে দুগ্ধ, দুগ্ধ-জাত দ্রব্য এবং পোল্ট্রি নিয়ে প্রচারণা, স্কুলে দুগ্ধ-পান কর্মসূচি, স্কুলে ডিম খাওয়ানো কর্মসূচি, দিনে বা সপ্তাহে স্কুলে দুগ্ধ-পান কর্মসূচির আয়োজন একদিকে যেমন, সচেতনতা, পুষ্টি উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ ভোক্তা সৃষ্টি হবে, অন্য দিকে বাচ্চাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে দুগ্ধ এবং মাংস খাওয়ার উপকারিতা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ বছরে একটি সপ্তাহকে ''জাতীয় দুগ্ধ সপ্তাহ'' ঘোষণা করার উদ্যোগ নিতে পারে।

- **প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সকল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতির জন্য বিশেষ করে প্রাণি-সম্পদ উৎপাদন, উপকরণ সরবরাহ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, বাজারজাতকরণ সহজতর করা এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যাপ্তির জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রাণি-সম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোর মাধ্যমে এবং মোবাইল প্রযুক্তির মাধ্যমে পশুপালনকারীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রাণি-সম্পদের বিভিন্ন অসুখসহ আগাম সতর্কতা প্রদান করা যায়। এই লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিনা মূল্যে প্রাণি-সম্পদ ও পোল্ট্রি সম্পর্কিত সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য সেবা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং '১৬৩৫৮ নম্বরে' যে কেউ কল করে এই সেবা গ্রহণ করতে পারে।

- **চামড়ার গুণগত মান উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ**

দেশের মোট রপ্তানিতে চামড়া ও চামড়া-জাত পণ্যের অবদান প্রায় ৪%। পোশাক শিল্প এবং পাট রপ্তানির পরেই রপ্তানিতে এই খাতের অবদান। এই খাতের সম্ভাবনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুধুমাত্র রপ্তানি বা বেকারত্ব হ্রাস নয়, এই খাত দেশীয় শিল্প বিকাশের পাশাপাশি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করবে[১১৬]। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে চামড়া ও চামড়া-জাত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করে চামড়া ও চামড়া-জাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলোতে চামড়া রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ট্যানারিগুলো হাজারীবাগ থেকে সাভারে সরিয়ে পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ট্যানারি স্থানান্তরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে । উল্লেখ্য যে, ভালুকায় উৎপাদিত কুমিরের চামড়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। কিছু মাংস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কুমিরের মাংস রপ্তানি ঘোষণা দিয়েছে, যা ইতিবাচক ।

- **দুগ্ধ-জাতীয় দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান**

গ্রামীণ দুগ্ধ-খামারিদের জন্য দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত-পণ্য উৎপাদনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক এবং বাজার তথ্য পাবার ব্যবস্থা এখনও তেমনিভাবে গড়ে উঠেনি। বাণিজ্যিকভাবে দুগ্ধ-বাজারজাতকরণের মিল্ক-ভিটা ১৯৭০ সালে প্রথমবারের মতো উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে 'বেসরকারিভাবে বাজারজাতকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা' তৈরি করে এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে দুগ্ধ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগ দুগ্ধের চাহিদা পূরণে অবদান রাখছে। তবে উপকরণ মূল্যের অস্থিরতা (বিশেষ করে প্রাণি-খাদ্যের মূল্য)-এর ফলে দীর্ঘ-মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনা নেয়া কঠিন। এছাড়া, কুল-চেইন (cool-chain) উন্নয়নসহ সংরক্ষণাগার ও পরিবহণ সুবিধা এখনো অপর্যাপ্ত, যা বাজারজাতকরণের একটি বড় অন্তরায়। সহজ-শর্তে ঋণ-দানের মাধ্যমে এবং কর-অব্যাহতি দিয়ে যন্ত্রপাতি ও আমদানি উপকরণ ক্রয় করে দুগ্ধ-উৎপাদনকারী ও উপকরণ-সরবরাহকারী উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- **গুণগত মানের জাত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ**

  কৃত্রিম-প্রজননের মাধ্যমে জাত-উন্নয়ন প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় ব্রিডিং (breeding) আইন প্রাণিজাত এবং কৃত্রিম-প্রজনন দ্রব্য আমদানি, গুণগত-মানের জাত-নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করতে পারে।

- **বিপণন চেইন পাওয়ার নিশ্চয়তা বৃদ্ধিকরণ**

  প্রাণিজাত-পণ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য-সংযোজন, বিপণনসহ অন্যান্য পোষ্ট-হার্ভেস্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কর্পোরেশন বা ডেইরি-বোর্ড বা পোল্ট্রি-বোর্ড গঠন করে কৃষক উৎপাদিত প্রাণিজ-পণ্যের উপযুক্ত মূল্য কিংবা সুসংগঠিত বিপণন চেইন পাওয়ার নিশ্চয়তা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ডেইরি, পোল্ট্রি ও মাংস উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমে লাগসই ব্যবস্থাকে স্থায়ী ভিত্তি দান ও গুণগত-মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের স্থান করে দেয়া যেতে পারে। দেশীয় বাজারের পাশাপাশি বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশের প্রাণিজ-পণ্যের বাজার সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করতে হবে।

- **অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ**

  - মা ও শিশুদের ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য ছোট পরিসরে ও বসত-বাটিতে হাঁস-মুরগী পালনের জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে ;
  - সকল ধরণের খামারিদের জন্য ইনস্যুরেন্স-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ;
  - দুর্গম এলাকায় পোল্ট্রি পালনে প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে ;
  - ছাগল উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে ;
  - সারাদেশে মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্য-সম্মত কসাইখানার ব্যবস্থা করতে হবে ;
  - মহিষ এবং ভেড়া পালনে জনগণকে সামাজিকভাবে উদ্ভূত করতে হবে ;
  - গুণগত-মানের একদিনের মুরগীর বাচ্চা, মান-সমৃদ্ধ পোল্ট্রি-খাদ্য ও খাদ্য উপাদানের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; এবং
  - বেসরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত ভেটেরিনারি ঔষধ, টিকা, খাদ্য, খাদ্য-উপাদান, প্রজনন সরঞ্জাম ও উপকরণের গুণগত-মান যাচাই করার জন্য স্বশাসিত এজেন্সি গঠন করা যেতে পারে ।

৫. খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ: রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার সূচকে অগ্রগতি

খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সংক্রান্ত বিষয়টি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার কর্মসূচি ৬ থেকে কর্মসূচি ৯-তে আলোচিত হয়েছে। খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিগুলো হল– বাজারে অভিগম্যতায় উন্নতি, কৃষিজ এবং কৃষি-বহির্ভূত খামার আয়ে উন্নতি, উন্নত সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালন; জাতীয় খাদ্য নীতি ও সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; এবং কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। এই কর্মসূচিগুলো জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার ২৬টি কার্যপরিধির মধ্যে ১১টি কার্যপরিধির সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং জাতীয় খাদ্য নীতি-এর কর্মপরিকল্পনাভুক্ত প্রতিটি কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে আলোচনা করা হল।

৫.১. কর্মসূচি ৬ - বাজারে অভিগম্যতায় উন্নতি, কৃষিজ এবং কৃষি-বহির্ভূত খামার আয়ে উন্নতি

কৃষি এবং কৃষি-বহির্ভূত খাতে আয় বৃদ্ধি করে জনগণের খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা সিআইপি কর্মসূচি ৬-এর উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচিতে কৃষি খাতে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে কৃষকদের বাজারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। চারটি সহযোগী উপ-কর্মসূচির মাধ্যমে উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের পরিকল্পনা করা হয়েছে: (১) বাজার তথ্য ও বাজারে অভিগম্যতা উন্নয়ন; (২) উৎপাদক ও বাজার সংগঠনগুলোকে বাজার সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণে ও বাজারে অভিগম্যতার সক্ষমতা উন্নয়নে সাহায্য করা; (৩) সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগার নির্মাণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, গুণগত মান এবং অপচয় হ্রাসের ব্যবস্থা করা; এবং (৪) খামার বহির্ভূত কার্যক্রম ও গ্রামীণ ব্যবসাকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা। এই কর্মসূচির সাথে খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনায় নিম্নলিখিত সাতটি হস্তক্ষেপ ক্ষেত্রের সম্পর্ক রয়েছে: (১) ভৌত অবকাঠামো (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র ১.৬); (২) কৃষি বিপণন (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র ১.৭); (৩) নীতি/নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র ১.৮); (৪) বেসরকারি খাদ্য বাণিজ্য (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র ২.৩); (৫) কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র ২.৬); (৬) পারিবারিক আয় বৃদ্ধিকরণ (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র ২.৫) এবং (৭) দক্ষতা উন্নয়ন (কর্মপরিকল্পনার হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র ২.৭)।

৫.১.১. কর্মসূচি ৬-এর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

সারণী – ১৮ : সিআইপি কর্মসূচি ৬-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সিআইপি/এনএফপি-পিওএ ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী নির্দেশকসমূহ		*২০০৭-২০০৮*	*২০০৯-২০১০*	*২০১৪-২০১৫*	*২০১৫-২০১৬*	*২০১৬-২০১৭*	*উৎস*
কতিপয় কৃষিপণ্যের খামার ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য (খামার পর্যায়ে মূল্যের শতকরা হার)	*মোটা চাল*	*৪.৮%*	*১.০%*	*৭.৮৫%*	১০%	৫.৮%	*কৃষি মন্ত্রণালয়*
	মসুর	*৩৯.৩%*	*৬৬.৫%*	*৩.০%*	৫৫.২%	৭০.৬%	
	পেঁয়াজ	*১৩.৭%*	*৩৯.১%*	*১৭.১%*	২৩.৬%	২৪.১%	
	বেগুন	*৬৭.০%*	*৪৫.৯%*	*৬২.০%*	৫১.৭%	৪৪.৬%	
	আলু	*২১.০%*	*২৫.৩%*	*২৩.০%*	২৯.১%	৩১.৪%	
ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে সারের মূল্যের পার্থক্য (ডিলার পর্যায়ে মূল্যের শতকরা হার)	*ইউরিয়া*	*১৯%-২৫%*	*২০%*	*১৪%*	*১৪%*	*১৪%*	*কৃষি মন্ত্রণালয়*
	টিএসপি	*৩%-৬%*	*১০%*	*১০%*	*১০%*	*১০%*	
	পটাশ	*১৭%-৩১%*	*৯%*	*১৫%*	*১৫%*	*১৫%*	
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত গ্রোথ সেন্টার,পল্লীবাজার, মহিলাদের বাজার, ইউপি ও উপজেলা		৪৪২	৬৪৭	১৫০	৩৯০	৩৬১	*স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ*
পুরুষ ও মহিলা কৃষি শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর পার্থক্যের হার		৪৮%	৪৩%	৩৩%	*২৪%*	*২৪%*	*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*
ক্ষুদ্র শিল্প খাতে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি		৭.১%	৭.৮%	৮.৫%	*৯.১%*	*৯.৮%*	*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		৮৯,৬৩৭	১২৫,৫৯৪	১৭৭,৫২৭ (২০১৪)	১৭ *৮,০৮৫* (২০১৫)	১৮০৫৯২ *(২০১৬)*	*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং বিএএনবিইআইএস*
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হার (পূর্ববর্তী বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যার তুলনায়)		১.২১%	১.৮৪%	২.০৯%	*১.৯০%*	*১.৭৪%*	

খামার পর্যায়ের মূল্য ও খুচরা মূল্যের পার্থক্য হ্রাস

ফসলের মূল্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আলু ও মসুর ডাল ব্যতীত অধিকাংশ কৃষি পণ্যের খামার পর্যায়ের মূল্য ও খুচরা মূল্যের ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বেগুনের ক্ষেত্রে এই মূল্য পার্থক্য ছিল ৬২%, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৫২% এ দাঁড়িয়েছে (সারণী-১৮)। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে মূল্যের ব্যবধান হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। তবে মসুর ডালের ক্ষেত্রে এই হ্রাস-বৃদ্ধির হার বেশী। মসুর ডালের এই মূল্যের ব্যবধান অনেক বেশী, যা অধিকতর বিশ্লেষণের দাবী রাখে। লেখচিত্র ২৫-এ জুন, ২০১০ মাস থেকে জুন, ২০১৬ মাস পর্যন্ত মোটা চালের পাইকারি মূল্য (যা খামার পর্যায়ের মূল্যের প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে) ও খুচরা মূল্যের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। এখানে যৌক্তিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চালের মূল্যের পরিবর্তন মৌসুম-ভিত্তিক হয়ে থাকে। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে আমন ফসল কর্তনের পূর্বে মূল্য বৃদ্ধি সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। **গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারি গড় মূল্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে প্রায় ৩১% ও ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চালের খুচরা ও পাইকারি গড় মূল্য স্থিতিশীল থাকলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি/১৬ থেকে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পরবর্তীতে এপ্রিল-মে/১৭ মাসে অর্থাৎ বোরো মৌসুমে হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যা পরিস্থিতির কারণে বাজারে চালের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।** (লেখচিত্র-২৫)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোটা চালের পাইকারি ও খুচরা গড় মূল্যের ব্যবধান একটি অস্থিতিশীল পর্যায়ে ছিল।

লেখচিত্র ২৫: মোটা চালের পাইকারি ও খুচরা মূল্যের পার্থক্য

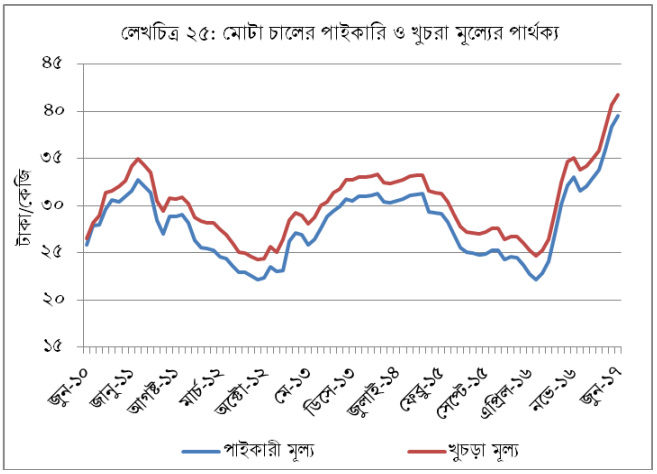

ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে সারের মূল্য ব্যবধান স্থিতিশীল

সরকার সাধারণত: ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে সারের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে এবং সারের চাহিদার সাথে সরকার কর্তৃক সরবরাহ ঠিক রাখা এবং সরকারের নিবিড় তদারকির কারণে এই মূল্য ব্যবধান স্থির রাখা সম্ভব হয়েছে। বিগত চার বছরে বিভিন্ন প্রকার সারের ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে মূল্যের তেমন ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়নি। এই মূল্য ব্যবধান ইউরিয়া, টিএসপি এবং মিউরেট-অব-পটাশের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৪%, ১০%ও ১৫% (সারণী-১৮) ছিল। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে খাদ্য ও সারের সংকটকালে সারের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অপ্রতুল থাকায় ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে মূল্যের অধিক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়; যার ফলশ্রুতিতে উক্ত সময়ে এই মূল্য ব্যবধান বেশী ছিল। বর্তমানে সার বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্রের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি

২০১৫-১৬ অর্থবছরে গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্র, পল্লী বাজার, মহিলা বাজার কেন্দ্র এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের সংখ্যা ৩৯০ থেকে কমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৬১ টিতে হ্রাস পেয়েছে (সারণী-১৮)। বেসরকারিভাবে উন্নয়ন কেন্দ্র ও পল্লী বাজার নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪,৮১৩ কিলোমিটার রাস্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে ২৮.৩২ কিলোমিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ১৪০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, ৪০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, ৮৫টি গ্রোথ সেন্টার, ৯০টি হাটবাজার উন্নয়ন এবং ৬টি মহিলা বাজার কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এ সময়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯০টি উন্নয়ন কেন্দ্র, ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স এবং ৭৫টি পল্লী বাজার উন্নয়ন ও সংস্কার করেছে[১১৭]। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে জানা যায় যে, ৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৪০ লাখ লোক এই সব কেন্দ্র থেকে তথ্য সেবা গ্রহণ করছে[১১৮]। সরকার দেশের ৭টি বিভাগের ৭টি স্থানে ৩.৭৫ একর ভূমি নিয়ে কম খরচে শহরের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পল্লী আশ্রয়ণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে[১১৯]।

কৃষি খাতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মজুরী পার্থক্য সামান্য বৃদ্ধি

কৃষি খাতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মজুরীর পার্থক্য ২০১৩-১৪ সালে ৩০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ সালে ৩৩%-এ উন্নীত হয়েছিল। অবশ্য, এই ব্যবধান ২০০৭-০৮ এবং ২০০৯-১০ সালে ৪০%-এর বেশী ছিল। সেই তুলনায় এই ব্যবধান ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৪% নেমে আসাকে উন্নতি হিসাবে দেখা যায়। কৃষি খাতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের এই মজুরী পার্থক্য উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের কারণে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে[১২২]। ২০১৩ সালের শ্রম জরিপে (labour force survey) দেখা যায় যে, কৃষিতে ৫৬.৩% মহিলা ও ৭.১% পুরুষ শ্রমিক মজুরী-বিহীন পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিত। মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে ১৫.৭% কৃষিতে স্ব-কর্মসংস্থানের আওতায়, ৮.৯% দৈনিক মজুরীতে এবং ৯.৪% কৃষি-বহির্ভূত খাতে স্বকর্মে নিয়োজিত[১২৩]। শ্রম বাজারে ৬৮.৩% কর্মক্ষম মহিলা কৃষি-খাতে, ২১.৩% সেবা-খাতে এবং ১৩.৩% শিল্প-খাতে কর্মরত। মহিলা শ্রমিকেরা কৃষি বিপণন ও মূল্য সংযোজনের তুলনায় শস্য উৎপাদন ও কর্তন-পরবর্তী কাজে বেশী নিয়োজিত[১২৪]।

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পসহ ক্ষুদ্র শিল্পে প্রবৃদ্ধি

বিগত বছরে ক্ষুদ্র শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ৮.৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ সালে ৯.২%-এ উন্নীত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে এই প্রবৃদ্ধি ছিল গড় প্রায় ৭%। ক্ষুদ্র উৎপাদন-শিল্পের প্রবৃদ্ধি সরকারের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই খাতকে দেশের অর্থনীতির একটি অভিঘাত (thrust) খাত হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৭ সালের জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত ২,৪৪৯টি কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৯৯.৯ বিলিয়ন টাকা পুনঃ-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের জন্য ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃ-অর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণকে উৎসাহিত ও প্রসারিত করার জন্য বিভাগীয় শহরে এবং নারায়ণগঞ্জের বাইরে ২০১০টি প্রতিষ্ঠানকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৭৪.১ বিলিয়ন টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল[১২৫] থেকে বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকগুলোকে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ১০% হারে ঋণ প্রদানে নির্দেশনা দিয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকগুলোকে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই তহবিলের ১৫% সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যায় স্থিতিশীলতা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে (টিভিইটি) ভর্তির সংখ্যা বিগত তিন বছরে গড়ে প্রায় ১৭৭ হাজার ছিল। এই ভর্তির সংখ্যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রায় ১২৫ হাজার ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ১৮০ হাজারের তুলনায় অনেক বেশী ছিল (সারণী ১৮)। দেশের জনসংখ্যা কাঠামোতে কর্মোপযোগী জনসংখ্যার প্রাচুর্য থাকার সুবিধা আহরণের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুব শক্তিকে উৎপাদন ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০ ভাগে উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিউএফ) বাস্তবায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ের ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অসচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদের আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশ-বিদেশে চাকরীর বাজার চাহিদা ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী করে ট্রেড ও টেকনোলজি, কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭,৯৪১টি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ২৩টি বিশ্বমানের পলি-টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এবং বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলি-টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৮৯টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ (BITTTR) স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৫.১.২. নীতি উন্নয়ন/চলমান কর্মসূচি ও পরবর্তী করণীয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ৬-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ১৪৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ৫২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-৬ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ৩৫% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ২.৯%। চারটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ৬ গঠিত, যাতে ৪৪টি বাস্তবায়িত, ৪৪টি চলমান এবং ৭টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ৬.১-এর আওতাভুক্ত ৬৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ৩৪৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৩৬টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ১১৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ৩টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৬.২-এর আওতাভুক্ত ৯টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে ৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া এই উপকর্মসূচির আওতায় কোন বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ছিল না। উপ-কর্মসূচি ৬.৩-এর আওতাভুক্ত ৫টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ১টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ১২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৬.৪-এর আওতাভুক্ত ৮টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ২টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ৩টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। সার্বিকভাবে কর্মসূচি-৬ এর আওতাভুক্ত ৯৫টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে মোট ৩৯৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৪৪টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ১২৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ৭টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ২২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি ৬-এর আওতায় মোট বাজেট ব্যয় হয়েছে ৫২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ সালের ৬০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১৩% হ্রাস নির্দেশ করে। চলমান প্রকল্পের বাজেট হ্রাস ও নতুন প্রকল্প চালু না হবার ফলে আগের বছরের তুলনায় কর্মসূচি ৬-এর বাজেট সংস্থান হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ৬-এর আওতায় মোট ৫৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের শতভাগের উপরে। কর্মসূচি ৬-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৮৪% ও ১৬%। অপরদিকে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৬৯% ও ৩১%। এ ধারা বাজার প্রবেশের সক্ষমতা কার্যক্রমে সরকারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ হচ্ছে: (১) মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; (২) ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ; (৩) সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ; (৪) দ্রুতগতিসম্পন্ন গণপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ; এবং (৫) আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সেবা সম্প্রসারণ।

কৃষি বাজার ব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বিদ্যমান বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদন বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ কে আরও যুগোপযোগী করার কাজ শুরু করেছে এবং তা বর্তমান গুদামজাতকরণ অধ্যাদেশ ১৯৫৯ এর সাথে সমন্বয় করা হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩-এর সাথে সমন্বয় করে বিপণন সম্প্রসারণ নীতির উন্নয়ন সাধন করছে, যা আধুনিক কার্যকর বিপণন কার্যক্রমের সুব্যবস্থা করবে[১২৫]।

সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে: (১) পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প; (২) গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট; (৩) ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (মেট্রোরেল); (৪) জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ; (৫) কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি ২য় সেতু নির্মাণ এবং সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প; (৬) ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) । পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৫,১৬০ কিঃমিঃ উপকূলীয়

বাঁধসহ মোট ১১,৪৩৬ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ করেছে। এছাড়া নদী ভাঙনের কবল হতে শহর, স্থাপনা ও জনবসতি রক্ষাকল্পে ৯০৭ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষায় ৩৪৭ কিঃমিঃ ড্রেজিং ও খনন কাজ সম্পন্ন করেছে।

এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- **খামার-গেট এবং খুচরা পর্যায়ের মূল্য ব্যবধান হ্রাসকরণ**

কিছু কৃষি পণ্যের (যেমন; মসুর ডাল ও বেগুন) ক্ষেত্রে খামার ও খুচরা পর্যায়ে মূল্য ব্যবধান উঠা-নামা করলেও উচ্চ ব্যবধান বিরাজমান ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেগুনের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান ছিল ৪৫% এবং মসুর ডালের ক্ষেত্রে ৭১%। আলুর ক্ষেত্রেও এই মূল্যের ব্যবধান বেশী ছিল। বিশেষত: অধিকাংশ ফল ও সবজির ক্ষেত্রে মূল্যের এই পার্থক্য বেশী। কৃষক পর্যায়ে অপচয় ও মধ্যসত্বভোগীদের দৌড়াত্ব এই পার্থক্যের একটি বড় কারণ। এছাড়া বিপণন ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে চাঁদাবাজি, মূল্য পার্থক্যের অন্যতম কারণ। এই অবস্থায় অধিকাংশ খাদ্যের বিপণন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দেয়া যেতে পারে।

- **খাদ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি ও অপচয় হ্রাসকরণ**

ফল ও সবজির ক্ষেত্রে অপচয় এবং গুণ ও পরিমাণগত মান হ্রাস একটি বড় সমস্যা, যা খামার ও খুচরা পর্যায়ে মূল্য ব্যবধান বৃদ্ধি এবং খাদ্যের মান হ্রাস করে। উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়ে সকল পর্যায়ে বিশেষত: গুদামজাতকরণ ও পরিবহণের সময় এই সমস্যা বেশী হচ্ছে। কিছু বড় বড় বেসরকারি বা সমবায় প্রতিষ্ঠান গুদামজাতকরণ এবং পরিবহণের জন্য কাভার্ড ভ্যান ও শীতল/হিমায়িত পরিবহণ ব্যবহার করছে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী বড় আকৃতির খোলা ট্রাকে পণ্য পরিবহণ করে, যার ফলশ্রুতিতে পণ্যের অপচয় ও মানের ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ ও বিপণন অধিদপ্তর কৃষক ও ব্যবসায়ীদের জন্য ফসল উত্তোলন পরবর্তী কার্যক্রম ও কৃষি পণ্য মোড়কীকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, যা ফসল উত্তোলন পরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করবে। এ ধরণের সুবিধা ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

- **গ্রামীণ পরিবহণ ও বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন**

গত কয়েক দশক ধরে দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু প্রত্যন্ত গ্রাম, সড়ক পরিবহণ সুবিধা হতে বঞ্চিত। জীর্ণ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পচনশীল কৃষি পণ্যের পরিবহণের জন্য একটি বড় অন্তরায়। সরকার রাস্তা-ঘাট, গ্রোথ সেন্টার, হাটবাজার ও সেতু-কালভার্ট পূণনির্মাণ[১২৭] ও বর্ধিত করার জন্য কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। মানব সৃষ্ট ও পলি জমার ফলে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ জল পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যা পুনরায় সচল করা প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু নদী ও খাল পুনঃ-খনন করার কাজ জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। রেল পরিবহণ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকার ২০ বছর মেয়াদী রেলওয়ে মহা-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর উত্তর প্রান্তে যমুনা নদীর উপর রেল লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর উপর রেল সেবার পরিকল্পনা, ঢাকা-টঙ্গী রুটে ৩য় এবং ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ, টঙ্গী-জয়দেবপুরে ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ প্রকল্প[১২৮] বাস্তবায়ন ছাড়াও বিভিন্ন রুটে ১৫৬ কি মি নূতন রেল লাইন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও চাহিদার তুলনায় এসব ব্যবস্থা অপ্রতুল, তবে খাদ্যশস্য কম খরচে পরিবহণের জন্য রেলওয়ের আরও উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

- **কৃষি খাতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মজুরীর পার্থক্য হ্রাসকরণ**

কৃষি খাতে পরুষ ও মহিলা শ্রমের মজুরী পার্থক্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তবে এই পার্থক্য এখনো প্রায় ২৪%, যা আরও কমানো দরকার। কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়নের সাথে তাদের মজুরী বঞ্চনার সম্পর্ক থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IFPRI)-এর গবেষণায় দেখা যায় যে, 'Feed the Future Zone' শীর্ষক কর্মসূচিভুক্ত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এলাকাসমূহে ২০১৫ সালে প্রায় অর্ধেক মহিলার ক্ষমতায়ন হয়েছে। এই ক্ষমতায়নের ফলে তাদের খাদ্য গ্রহণ বৈচিত্র্য ও উৎপাদনে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে[১২৯]। এই ধরণের পরিবর্তন কৃষি ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে মজুরী বঞ্চনা হ্রাস করতে পারে। পুরুষ ও মহিলা শ্রমের মজুরী পার্থক্য বিবেচনার ক্ষেত্রে কৃষি খাতে তাদের উৎপাদনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়, যা গবেষণা করা দরকার।

➢ কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কৃষি কর্মসংস্থান উৎসাহিত প্রদান

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম বিগত কয়েক বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭৫০টি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রাণ, মিল্ক ভিটা, তীর, অলিম্পিয়া, ফ্রেশ, আহম্মেদ, বেঙ্গল ইত্যাদি কোম্পানি ও brand বিদ্যমান। অধিকাংশ বড় প্রতিষ্ঠান এই খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। প্রাণ গ্রুপ ১০৬টি দেশে ৩০০ মিলিয়ন ভোক্তার নিকট তাদের পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে[১৩০]। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর[১৩১] তথ্যানুযায়ী ২০১৫-১৬ সালের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে প্রক্রিয়াজাত ফল ও সবজি থেকে প্রায় ৭৫.১ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণকে উৎসাহিত করার জন্য, বিশেষ করে মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য রেয়াতী ঋণ সুবিধা সম্প্রসারিত করেছে। অবশ্য কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ উন্নয়নের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর জন্য গুদামজাতকরণ, পরিবহণ অবকাঠামো, প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য-পণ্যের গুণগত-মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বেশী করে নীতি সহায়তা প্রয়োজন। আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাসহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সাভার, খুলনা, রংপুর, নরসিংদী ও কুমিল্লায় ৫টি প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে[১৩২]। সেই সাথে বাজারে প্রক্রিয়াজাত পণ্যের ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক সেবা প্রদানের সুবিধা রাখা হয়েছে। এই উদ্যোগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শ্রম বাজারে নবীন কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং সুইস উন্নয়ন ও সহযোগিতা সংস্থার সাহায্য নিয়ে প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক আগামী ৩ বছরে ১০,২০০ জনকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বাজার-ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসএমই-খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে এই রকম আরও উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

➢ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এখন কর্মক্ষম পর্যায়ে রয়েছে। যথাযথ প্রযুক্তি ও দক্ষতা ব্যবহার করে এই জনশক্তিকে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের কাজে লাগানো প্রয়োজন। কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) কার্যক্রমে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন করা দরকার। সারণী ১৮-তে দেখা যায় যে, বিগত তিন বছরে টিভিইটি (TVET) এ ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ মাত্র ২৪%। এ অবস্থার আরও উন্নতির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধির জন্য টিভিইটি (TVET) এর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিশ্ব-বাজারের চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেড নির্ধারণ করত: আরও অধিক সংখ্যক অনুপ্রেরণা ও প্রচারণামূলক কাজ হাতে নেয়া দরকার।

➢ কৃষক সংগঠনগুলির দর-কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

মনে করা হয়ে থাকে যে, দর কষাকষির সক্ষমতা কম থাকায় কৃষকেরা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক তাদের পণ্য বিক্রি করে ভোক্তাদের ব্যয়ের যথেষ্ট অংশ পায় না। পচনশীল কৃষি পণ্য ফল ও সবজীর ক্ষেত্রে এটি আরও বেশী প্রকট, কারণ এই সমস্ত পণ্য দ্রুত পচনশীল হওয়ায় এক দিনের মধ্যেই বিক্রি করতে হয়। পল্লী এলাকার বাজারগুলোতে গুদামজাতকরণ সুবিধা নেই বললেই চলে এবং সেখানে অনেক মধ্যসত্বভোগী রয়েছে, যাদের কারণে বাজার থেকে কাঙ্ক্ষিত মূল্য কৃষকেরা পায় না। ব্যবসায়ীগণ এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কৃষকদেরকে কম মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য করে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে ধান/গম বিক্রির ক্ষেত্রে প্রায়শই নির্দিষ্ট আর্দ্রতা বজায় রাখতে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং প্রায়ই তাদেরকে অতিরিক্ত কিছু খরচ করতে হয়[১৩৩]। জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থার কারিগরি সহায়তায় কৃষকদের সংগঠনের সক্ষমতা পরিমাপ করা হয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কিছু নির্দেশণা[১৩৪] প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া অনগ্রসর উদ্বৃত্ত উৎপাদন অঞ্চলের কৃষকদের সমবায় সংগঠন কার্যকর করা যেতে পারে।

৫.২. কর্মসূচি ৭: জাতীয় খাদ্য নীতি ও সিআইপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

কর্মসূচি ৭-এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য নিয়োজিতদের প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবলের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। এই কর্মসূচিটি তিনটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে গঠিত, যথা- (১) নীতি বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ; (২) বিনিয়োগ নকশা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং সিআইপি কার্যক্রম; এবং (৩) সুশীল সমাজের সংস্থাসমূহকে সিআইপি-এর উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো। জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা এবং সিআইপি-এর প্রাতিষ্ঠানিক গঠন এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.২.১. কর্মসূচি ৭-এর লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি

সারণী-১৯: রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) কর্মসূচি-৭ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

সিআইপি/এনএফপি ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী নির্দেশকসমূহ		২০০৭/০৮	২০০৯/১০	২০১৪/১৫	২০১৫/১৬	**২০১৬/১৭**	উৎস
সিআইপি[১৩৫]—তে অতিরিক্ত সম্পদের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১২০	১৩১৩	১৪৬৫	সিআইপি মনিটরিং
চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ও অর্থায়ন বৃদ্ধি	সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	২৬	৫০	২	সিআইপি মনিটরিং
	ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৩৪৭	১৩৭	১	সিআইপি মনিটরিং
সিআইপি বাজেটের বাস্তবায়ন অগ্রগতি		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৫২%	৫৭%	৬৫%	সিআইপি মনিটরিং
প্রকাশিত সিআইপি মনিটরিং রিপোর্ট		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রকাশিত	প্রকাশিত	প্রকাশিত	এফপিএমইউ

সিআইপি-তে অতিরিক্ত সম্পদ সংযোজন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৪৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সংযোজিত হয়েছে (চলমান, সমাপ্ত বা নতুন প্রকল্পের জন্য বাজেট বরাদ্দ) । এই সংযোজন ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১,৩১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৪৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বস্তুত, এর ফলে ৩০শে জুন, ২০১৭ পরবর্তী সময়ে চলমান প্রকল্প বাজেটের অবশিষ্ট পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরে ৩০ শে জুন, ২০১৬ পরবর্তী সময়ের জন্য চলমান প্রকল্পের বাজেটের অবশিষ্ট ৫,১৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৪% কমে ৪,৪৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে।

সিআইপি-এর আওতায় অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়ন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২ টি প্রকল্প (নতুন অথবা পূর্বে পাইপলাইনে ছিল) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, যার বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর-ভিত্তিক অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প সংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৫০টি থেকে কমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাত্র ২টিতে নেমে এসেছে এবং তা শুধুমাত্র খাদ্যের লভ্যতা সংশ্লিষ্ট (টেবিল ১৯ দ্রষ্টব্য)।

সারণী- ২০: ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহীত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা এবং বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ

উপাদান	২০১৫-১৬ অর্থবছর				২০১৬-১৭ অর্থবছর				২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ এর মধ্যে পরিবর্তন			
	প্রকল্প সংখ্যা	বাজেট বরাদ্দ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			প্রকল্প সংখ্যা	বাজেট বরাদ্দ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			প্রকল্প সংখ্যা	বাজেট বরাদ্দ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
খাদ্যের লভ্যতা	৩১	৩৯	৩৯	০	২	১	১	০	-২৯	-৩৮	-৩৮	০
খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	১৮	৯৭	৯৭	০	০	০	০	০	-১৮	-৯৭	-৯৭	০
খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	১	১	১	০	০	০	০	০	-১	-১	-১	০
মোট	৫০	১৩৭	১৩৭	০	২	১	১	০	-৪৮	-১৩৬	-১৩৬	০

২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যের লভ্যতার ক্ষেত্রে চলমান প্রকল্প সংখ্যা কমেছে ২৯টি এবং খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরে যথাক্রমে ১৮টি ও ১টি নতুন চলমান প্রকল্প যুক্ত হলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কোন প্রকল্প সংযোজিত হয়নি। সার্বিকভাবে, নতুন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ৯৯% হ্রাস পেয়েছে (সারণী ২০)। খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি সু-নির্দিষ্ট আঙ্গিক (খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার)-এর আওতায় নতুনভাবে গৃহীত প্রকল্পের আনুপাতিক হার পর্যবেক্ষণে (সারণী-২০) প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় (২০১৬-১৭ অর্থবছরে) সরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উভয়ের ক্ষেত্রেই আর্থিক সম্পদ খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের দিক থেকে খাদ্য লভ্যতার দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

সিআইপি বাস্তবায়ন

১লা জুলাই, ২০১০ থেকে শুরু করে ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৭ বছর সময়ে সিআইপি-তে অন্তভুক্ত প্রকল্পসমূহের মোট বাজেট চাহিদা ১৭,৯২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছেছে, যার ৬৫% ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অর্থায়ন সম্পন্ন হয়েছে (সমাপ্ত এবং চলমান প্রকল্পে)। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সক্ষমতার ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ইতোপূর্বে (২০১৫-১৬ অর্থবছরের পূর্বে) বেশ ধীরগতিতে চলমান ছিল। যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৩%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫২%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯৬% ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৫% । সর্বশেষ দুই অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তার পূর্বের অর্থবছর-দ্বয়ের শ্লথগতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রতিফলন (সারণী ২১)। পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত অর্থ যোগ হয়ে পরবর্তী বছরের বাজেট বাড়ায় বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি হ্রাস পেয়েছিল।

টেবিল ২১: সিআইপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি

উপাদান	২০১৪/১৫ অর্থবছর		২০১৫/১৬ অর্থবছর		২০১৬/১৭ অর্থবছর	
	প্রকল্পসমূহের ব্যয় (Delivery) (মিলিয়ন মা.ডলার)	বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পসমূহের ব্যয় (Delivery) (মিলিয়ন মা.ডলার)	বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রকল্পসমূহের ব্যয় (Delivery) (মিলিয়ন মা.ডলার)	বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি
খাদ্যের লভ্যতা	৫৫৮	৪৩.২%	৫০৮	৯৪.৩%	৫৬৪	৯১.৯%
খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	৮২৭	৫৯.২%	৮৯৭	৯৮.৬%	৮০৯	৯৯.৬%
খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	৬৮	৫৫.৫%	৪০	৭৫.২%	৪৮	৭৩.৯%
মোট	১৪৫৩	৫১.৮%	১৪৪৫	৯৬.২%	১৪২১	৯৫.৩%

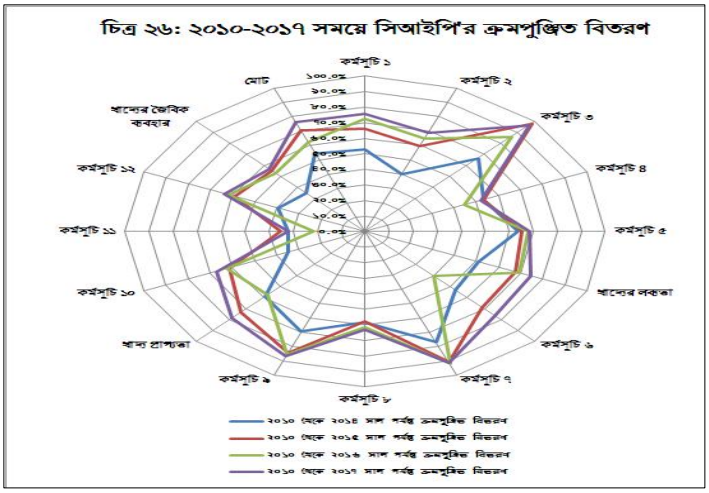

গত সাত বছরে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট অর্থায়নকৃত বাজেটের প্রায় ৭৬%। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সার্বিক ব্যয়ের অগ্রগতি ছিল ১.৪২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূবর্তী অর্থবছরের ১.৪৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ের তুলনায় সামান্য কম হলেও গত ৬ বছরের বার্ষিক গড় ব্যয় (১.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর তুলনায় বেশি। লেখচিত্র ২৬-এ খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি আঙ্গিক (লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার) এবং সিআইপি-এর প্রতিটি কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে ব্যয় ছিল সর্বোচ্চ, যা ৭৯% এবং খাদ্য লভ্যতা ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৭৪% এবং ৫৭%। সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত ১২টি কর্মসূচি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের হার ছিল (৯৭%) কর্মসূচি ৩-এ এবং পরবর্তী সর্বোচ্চ ব্যয়ের হার ছিল যথাক্রমে কর্মসূচি-৭ (৯১%) এবং কর্মসূচি ৯-তে (৮৭%)। খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ১১-এর ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ছিল ৩২%।

পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

যে সকল প্রতিষ্ঠান খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি তৈরি, পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে জড়িত আছে যেমন, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি), থিমেটিক টিম (টিটি), খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ (FPWG) ইত্যাদি যাদেরকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। এফপিএমইউ প্রাথমিকভাবে থিমেটিক টিমের সভা এবং অনানুষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং তথ্য উপাত্ত বিনিময় শক্তিশালী করার কাজে নিযুক্ত থাকে। মনিটরিং রিপোর্ট হচ্ছে উক্ত সমন্বয়ের একটি প্রধান ফল, যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অঞ্জানে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাজ, বিনিয়োগ এবং প্রায়োগিক কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যে সমন্বয় ও সাদৃশ্য ঘটায়।

উপরোল্লিখিত অবস্থায় 'খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ'-এর নির্দেশনায় থিমেটিক দলসমূহ জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা ও সিআইপি মনিটরিং করে এবং বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা থেকে আর্থিক উপাত্ত এবং জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা ও সিআইপি'র লক্ষ্য ও ফলাফল সূচকের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বার্ষিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা করে। এছাড়াও থিমেটিক টিমসমূহ অংশীদারদের নিয়ে পরামর্শমূলক সভার মাধ্যমে মনিটরিং রিপোর্টের খসড়া প্রণয়ন করে এবং এর ফলাফল পর্যালোচনা করে থাকে। এই সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকরীভাবে সমন্বয় এবং সফলভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করার একটি সুন্দর পদ্ধতি হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খাদ্য-নিরাপত্তা ও পুষ্টি-নীতি-এর কর্মসূচি এবং বিনিয়োগের টেকসই পরিবীক্ষণ

বাংলাদেশে জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) কর্তৃক প্রদত্ত কারিগরি সহায়তা গ্রহণের ফলে এফপিএমইউ ইতোমধ্যেই 'জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা ও সিআইপি বাস্তবায়ন' টেকসইভাবে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে। অধিকন্তু, এর পাশাপাশি এফএও কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সিআইপি মনিটরিং-এ সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহের বিশেষ করে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতি পরিকল্পনাসমূহ পরিবীক্ষণে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৫.২.২ নীতি উন্নয়ন / চলমান কর্মসূচি এবং পরবর্তী করণীয়

এফপিএমইউ-এর উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার কারণে থিমেটিক টিম (টিটি) সদস্যদের সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তের সংগ্রহ নিশ্চিতকরণসহ মনিটরিং রিপোর্টের গুণগতমান এবং ব্যবহৃত আর্থিক তথ্য-উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হচ্ছে। টিটি ও 'খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকর মতবিনিময় এবং তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ কার্যক্রম' খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সঠিক গতি প্রকৃতি উপস্থাপনে ফলপ্রসূভাবে সহায়তা করে আসছে। এছাড়া, টিটি সদস্যদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ মনিটরিং ডাটাবেজ হালনাগাদকরণে সহায়তা করে, যা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপাত্তকে মনিটরিং রিপোর্টের নির্দেশক অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়, যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা হচ্ছে। টিটি সদস্যগণ সিআইপি-এর আর্থিক উপাত্তসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে যাচাই বাছাই-পূর্বক পরিবীক্ষণ কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে সরবরাহ করে আসছে। উপরন্তু, 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর আর্থিক তথ্য উপাত্ত পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের 'বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক 'প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন' -এর সাথে মিলিয়ে সত্যায়ন করা হয়। অনুচ্ছেদ ৭ এবং পরিশিষ্ট ৪-এ সিআইপি ফলাফল এবং আর্থিক বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এফপিএমইউ'-এর বর্ধিত ভূমিকা:

এফপিএমইউ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বহুমুখী (multi-sectoral) নীতি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তার অবস্থানকে অনেক শক্তিশালী করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং নীতি প্রণয়ন বিষয়ক সহায়তা কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে এফপিএমইউ-এর অন্যতম কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে (ক) নিরাপদ খাদ্য আইন, (খ) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জরুরী পদক্ষেপ পরিকল্পনা (National Food Safety Emergency Plan) প্রণয়ন, (গ) রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা-২ প্রণয়ন, (ঘ) জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন, (ঙ) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশের অর্জন বিষয়ক তথ্য প্রদান, এবং (চ) নিরাপদ খাদ্য আইনের আওতায় বিভিন্ন বিধি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান। ২০১৫ সালে জাতীয় পুষ্টি-নীতি অনুমোদিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি-নীতির কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action of Nutrition বা এনপিএএন-২) প্রণীত হয়েছে। এফপিএমইউ এনপিএএন ২-এর চারটি খাত-ভিত্তিক কমিটিতে কার্যকরভাবে নিযুক্ত আছে। কমিটিগুলো হচ্ছে: (১) স্বাস্থ্য, নাগরিক স্বাস্থ্য এবং পানি স্বাস্থ্যবিধি (WASH); (২) কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; (৩) নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং তথ্য; (৪) অর্থায়ন, পরিকল্পনা ও বাজেট। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) কর্তৃক প্রণীত ফুড ব্যাল্যান্স সীট (Food Balance Sheet) এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এফপিএমইউ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে যাচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তামূলক গভার্নেন্স প্রক্রিয়াসমূহ, যেমন: নব-প্রবর্তিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ,

জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে এফপিএমইউ নিয়মিতভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও এফপিএমইউ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে এসডিজি'র লক্ষ্য-২ "ক্ষুধা দূরীকরণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন" এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত আছে।

পুষ্টি কার্যক্রমের জন্য আর্থিক সম্পদ অনুসরণ

উন্নত পুষ্টির জন্য নীতি নির্ধারকদের আর্থিক সম্পদের প্রবাহ অনুসরণ করা আবশ্যক হওয়ার কারণে পুষ্টি কার্যক্রম আরও ভালভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে । জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে অনুধাবন করতে সহায়তা করে । ২০১৫ সালের সিআইপি ডাটাবেজ ব্যবহার করে এফপিএমইউ পুষ্টি খাতে বিনিয়োগ কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ পুষ্টি সংবেদনশীল এবং পুষ্টি সহায়ক কার্যক্রম এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে, যেখানে পুষ্টি সংবেদনশীল কার্যক্রম বলতে ঐসকল কার্যক্রমকে বুঝায় যা সরাসরিভাবে অপুষ্টি হ্রাস করে এবং পুষ্টি সহায়ক কার্যক্রম বলতে উন্নত পুষ্টির জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করাকে বুঝায়। এই প্রক্রিয়াকে উন্নত করার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে সরকারি একীভূত বাজেট ও হিসাব প্রক্রিয়ায় (iBAS) অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি পৃথক বাজেট কোড প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বৃহত্তর বাজেট খাত নির্ধারণ করা সহায়ক হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি কার্যক্রমে সরকারি ব্যয়ের আকার নিরূপণ করা এবং এর ভিত্তিতে সরকারি নীতি ও অগ্রাধিকার খাতসমূহকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। ফলে একই রকমের বিদ্যমান কার্যক্রমসমূহের (DFID, WB, FAO-এর খাদ্য ও কৃষি নীতির পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ) মাঝে সমন্বয় সাধন করা সহজ হবে।

খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনার ও পরিবীক্ষণের জন্য উন্নত দক্ষতা

খাদ্য মন্ত্রণালয় "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা বা Modern Food Storage Facilities" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যার জন্য সরকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) থেকে ২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের চাহিদা পূরণ এবং খাদ্যের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং নীতি গ্রহণসহ শস্য মজুদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় এবং পরিবার উভয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের মজুত ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানো। উল্লেখ্য, মজুদ এবং পরিবহন ক্ষতি বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে, যা এটাই নির্দেশ করে যে, খাদ্যশস্য বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটছে। খাদ্য অধিদপ্তর স্বল্প পরিসরে ডিজিটাল খাদ্য মজুদ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, যা নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার ভাল ইঙ্গিত প্রদান করেছে। গত কয়েক বছর যাবত খাদ্যশস্যের স্থিতিশীল মূল্য হচ্ছে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে উন্নত দক্ষতার ফল।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের একীভূত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প

কৃষি মন্ত্রণালয়ের একীভূত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (Integrated Agriculture Productivity Project) শীর্ষক একটি প্রকল্প কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে আরও কার্যকর বিনিয়োগের জন্য জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরাসরিভাবে সিআইপি কর্মসূচি ৭-এ অবদান রাখে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য প্রকল্প পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। এই কার্যক্রম IAPP-এর বিনিয়োগ উপাদানসমূহের বাস্তবায়নে অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতে কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক বিনিয়োগ প্রকল্পের কার্যকর নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহযোগিতা প্রদান করবে।

এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয় :

- **নীতি কর্মপরিকল্পনা এবং কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান**

  খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি , কর্মপরিকল্পনা ও দেশীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয় সাধনে এফপিএমইউ মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। পুষ্টি সহায়ক কার্যক্রমকে মূল উন্নয়ন স্রোতধারায় আনয়ন, জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই ও বহুমুখী কৃষির উন্নয়ন নীতি গ্রহণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন, খাদ্যের নিরাপদতা এবং শস্যবহির্ভূত- খাদ্যের মূল্য পরিবীক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহের উপর আলোকপাত করতে হবে।

- **নতুন নীতি এবং সিআইপি বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ**

  সরকারি কার্যক্রমকে সহযোগিতার জন্য উন্নয়ন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিআইপি বাস্তবায়নে অংশীদার হিসেবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ চলমান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রকল্পের উপর সঠিক ও সঙ্গাত তথ্য প্রদান করে এবং পূর্ববর্তী প্রকল্প এবং কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বিনিময় করে, যা নীতি প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকন্তু, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অর্থায়নকৃত প্রকল্পে দক্ষতা উন্নয়ন অংশ যুক্ত থাকায় কার্যকরী সরবরাহ এবং জাতীয় সক্ষমতা টেকসই করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- **নেতৃত্ব এবং নীতি গ্রহণ বিষয়ক দিক নির্দেশনায় সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সরবরাহ শক্তিশালীকরণ**

  প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতি প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রকল্প উন্নয়ন, বাজেট এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জড়িত থাকে। এই জটিল প্রক্রিয়ার কারণে প্রকল্প দেরীতে বাস্তবায়ন হয় এবং এর দক্ষতা ও জবাবদিহিতা হ্রাস পায় । অনেক সময় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মৌখিক আশ্বাসে প্রকল্প শুরু হলেও অর্থ পেতে যথেষ্ট কালক্ষেপণ হয়, আবার কোন কোন সময় উক্ত অর্থ পাওয়াই যায় না। এসকল ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় রকমের সমস্যার উদ্ভব হয়। অধিকন্তু, পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বিভাগ-ভিত্তিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সকল পর্যায়ে সিআইপি বাস্তবায়নের হার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের দক্ষতা উন্নয়নসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৫.৩. কর্মসূচি ৮ - উন্নত সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হচ্ছে: (১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আন্তর্জাতিক বা দেশীয় বাজার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে দেশে চাল ও গমের বাজার সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা; (২) বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারসমূহকে খাদ্য সহায়তা প্রদান (কর্মসূচি ৯-এ দেখা যেতে পারে); এবং (৩) ফসল কর্তনের সময় খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের অত্যধিক পতন রোধের মাধ্যমে কৃষকদেরকে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে প্রণোদনা ও সহযোগিতা প্রদান। সরকারি-খাতে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, আমদানি, বিতরণ ও সরকারি খাদ্য মজুদ সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যথাযথ বিনিয়োগের মাধ্যমে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি হচ্ছে কর্মসূচি ৮-এর উদ্দেশ্য। এটি মূলত: 'জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনা (এনএফপি-পিওএ)-এর দুটি কার্যক্ষেত্রের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত: সরকারি সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদককে মূল্য সহায়তা প্রদান (কর্ম-পরিকল্পনার হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র ১.১০) এবং সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল-কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন (কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্ষেত্র ১.১১)। কর্মসূচি ৮ তিনটি উপ-কর্মসূচিতে বিভক্ত, যার মধ্যে রয়েছে: (১) 'সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা এবং মূল্য স্থিতিশীলতায় তার প্রভাব সুসংহত করা; (২) সরকারি খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনায় খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা; এবং (৩) দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় খাদ্য গুদামের সংখ্যা ও পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণ চলমান রাখা। সারণী-২২ এ প্রাসঙ্গিক নির্দেশকসমূহের ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জনের অবস্থা দেখা যেতে পারে।

৫.৩.১. কর্মসূচি ৮-এর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

সারণী – ২২ : সিআইপি কর্মসূচি ৮-এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি

সিআইপি/এনএফপি-পিওএ ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী নির্দেশকসমূহ	২০০৭-০৮	২০০৯-২০১০	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	উৎস
অর্থ-বছর শেষে খাদ্যশস্যের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা (হাজার মেট্রিক টন)	১,৪৯৩	১,৫২৯	১৮৭৯	১৮৭০	১৮৭৬	খাদ্য অধিদপ্তর
সরকারি খাদ্য গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতার গড় ব্যবহারের হার (%)	৪৭	৭০	৭০	৭৫	৪৪	খাদ্য অধিদপ্তর
প্রকৃত বোরো সংগ্রহ (হাজার মেট্রিক টন)	১,১৬৮	৫৬৩	১০৭০	১০২১	৩৩৮	খাদ্য অধিদপ্তর
সরকারি বোরো সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)	৭৮	৪৯	৯৭	৯৭	২৭	খাদ্য অধিদপ্তর
বোরো সংগ্রহ মৌসুমে উৎপাদন খরচের তুলনায় পাইকারি বাজার দরের হার (%)	১৪৮	১২৯	৯১	৯১	১২৬	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়
বাজেট লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত সমাপনী মজুদের হার [১৩৬]	৪৪	৪৬	১১২	৫২	৮০	জাতীয় বাজেট এবং এফপিএমইউ
মোট অভ্যন্তরীণ চাল সরবরাহের তুলনায় খোলা বাজারে OMS-এর মাধ্যমে চাল বিক্রয়ের হার (%)	১.১০	১.১৪	০.২৪	৮৬	৩.৬২	এমআইএসএম, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস

টিকা- কোন অর্থবছরে বোরো সংগ্রহ ওই অর্থবছরের পুরো মৌসুমে সম্পূর্ণ বোরো সংগ্রহ (ক্রয়) কে নির্দেশ করে, যা ঐ অর্থবছরের শেষাংশে শুরু হয়।

সরকারি খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগারের কার্যকর ধারণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে

সরকারি খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগারের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে ১৭.৯ লাখ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শেষে ১৮.৮ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। সংরক্ষণাগারের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ১৪.৯ লাখ মেট্রিক টনের তুলনায় প্রায় ২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-২২)। যে কোনও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগারের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি সরকারি পরিকল্পনার একটি অংশ। পরিকল্পনা অনুসারে কার্যকর সংরক্ষণাগারের ধারণ ক্ষমতা আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লাখ মেট্রিক টন পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে। এক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন যে, দীর্ঘ সময়ব্যাপী খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ফলে মজুদ-কৃত খাদ্যশস্যের গুণগত মান হ্রাস রোধকল্পে বর্ধিত ধারণ ক্ষমতার পাশাপাশি উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ধারণ ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। এরই নিরিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় 'আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে দেশের ৮টি নির্ধারিত স্থানে অতিরিক্ত ৫.৪ লাখ মেট্রিক টন ধারণ-ক্ষমতা

সম্পন্ন আধুনিক সাইলো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে[১৩৭]। সারণী ২৩-এ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৭.২৫ লাখ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের বিবরণ দেয়া হল।

সারণী - ২৩: ডিসেম্বর ২০১৬ নাগাদ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্মাণাধীন খাদ্য গুদাম ও ধারণ ক্ষমতা

খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ	বাস্তবায়নকাল	ধারণ ক্ষমতা (০০০ মেট্রিক টন)	জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
মংলা বন্দরে সাইলো নির্মাণ	জানু/১০ - জুন/ ১৬	৫০	৯৯%
পোস্তগোলায় আধুনিক ময়দা মিলের আওতায় সাইলো নির্মাণ	জুলাই/১২- জুন/১৫	১০	৯৯%
সান্তাহারে সাইলোতে বহুতল বিশিষ্ট খাদ্য গুদাম নির্মাণ	জানু/১২ - জুন/১৭	২৫	৯৯%
নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	জুলাই/১৩ -জুন/১৮	১০৫	৩৫%
বাংলাদেশ আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের সাইলো নির্মাণ	জানু/১৪ - জুন/২০	৫৩৫	২২%
মোট ধারণ ক্ষমতা	২০২০ এর মধ্যে	৭২৫	-

সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তর

সরকারি খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগারের বর্ধিত ধারণ ক্ষমতা ব্যবহার হ্রাস

সরকারি খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগারের ধারণ ক্ষমতার গড় ব্যবহার ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৭০% থেকে বেড়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭৫%-এ উন্নীত হয়েছে। তবে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতার ব্যবহার ৪৭% থেকে ৭৫% এর মধ্যে ওঠা-নামা করেছে। কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উক্ত গড় ব্যবহার কমে ৪৪% এ নেমে এসেছে। এর কারণ হিসেবে গত অক্টোবর,২০১৬ থেকে মজুদ হ্রাসের প্রবণতাই মূলত: দায়ী। সরকারি অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, আমদানি ও বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের বার্ষিক ভিন্নতার উপর ধারণ ক্ষমতার গড় ব্যবহার নির্ভরশীল। উল্লেখ্য যে, এই ধারণ ক্ষমতার গড় ব্যবহারে মাসিক, মৌসুম-ভিত্তিক ও বার্ষিক ভিন্নতা রয়েছে। যদিও পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য বিতরণ কিছুটা কম হয়েছে, মৌসুম-ভিত্তিক হিসাবে জুন মাসের শেষে কার্যকর ধারণ ক্ষমতার ব্যবহার ২০% হয়েছে, যা মূলত: বোরো সংগ্রহ মৌসুমে সংগ্রহ না হওয়ার প্রতিফলন।

বোরো ধান সংগ্রহ অধিকতর হ্রাস

বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বোরো সংগ্রহ মৌসুমে সরাসরি কৃষকগণের নিকট থেকে সরকারিভাবে প্রথমবারের মতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থাৎ ৬.৭০ লাখ মে: টন ধান ও দ্বিতীয় পর্যায়ে জুলাই মাস থেকে মৌসুমের শেষ পর্যন্ত ৫.৮৬ লাখ মে: টন চাল সংগ্রহ করা হলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বোরো থেকে মাত্র ৪.৭ হাজার মে: টন ধান এবং ৩.৩৪ লাখ মে: টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে । ২০১৭ সালের সরকারিভাবে বোরো সংগ্রহ মৌসুমে চালের আকারে মোট প্রায় ৩.৩৮ লাখ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে, যা বোরো মৌসুমে সংগৃহীত কয়েক বছরের তুলনায় সব চেয়ে কম (সারণী-২২)। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালে বোরো চালের সরকারি সংগ্রহ ছিল ১১.৭০ লাখ মেট্রিক টন, যা ২০০৯ সালে প্রায় ৫.৬০ লাখ মেট্রিক টনে নেমে আসে; কিন্তু পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে তা ১০.২১ লাখ মেট্রিক টনে পৌঁছায়। বিগত তিন বছর যাবত বোরো সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার ৯৫%-এরও বেশী অর্জিত হয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে ২০১৭ সালে সরকারি সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত ১২.৫৫ লাখ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত অর্জন (৩.৩৮ লাখ মেট্রিক টন) সর্বনিম্ন (২৭%) ছিল। সংগ্রহের এই হ্রাস-বৃদ্ধি সাধারণত উৎপাদন খরচ, সংগ্রহ মূল্যের সাথে অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্যের ব্যবধান, এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের তারতম্যের কারণে ঘটে থাকে।

বোরো চালের পাইকারি দাম উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি

বোরো সংগ্রহ মূল্য সাধারণত বাজারে চালের পাইকারি মূল্য, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনের পরিমাণ ও চলমান আন্তর্জাতিক বাজারদর বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যায় যে, সংগ্রহ মৌসুমে চালের পাইকারি দাম সাধারণত বোরো উৎপাদন খরচের উপরে থাকে। **বিগত অর্থবছরও তার ব্যতিক্রম নয়।** যদিও ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংগ্রহ মৌসুমে বোরো চালের পাইকারি দর উৎপাদন খরচের নিচে

লেখচিত্র নং-২৭ বোরো চালের সংগ্রহ, পাইকারী মূল্য ও উৎপাদন খরচ

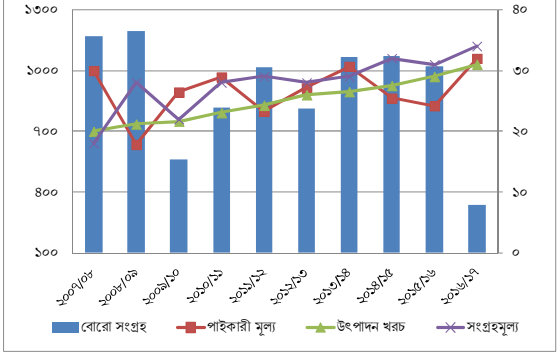

নেমে যায়, অর্থাৎ বাজার মূল্যের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশী এবং সংগ্রহ-মূল্য আরও বেশী (লেখচিত্র-২৭)। বোরো সংগ্রহ-মূল্য উৎপাদন খরচের তুলনায় বেশী নির্ধারণ করায় বোরো সংগ্রহের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে প্রায় ৯৭.২% ও ৯৬.৮% (সারণী-২২)। যদিও বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্য বেশি নির্ধারণ করা স্বত্বেও আশানুরূপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

সমাপ্তি মজুদ উঠানামা সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম ছিল

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রকৃত সমাপ্তি মজুদ বাজেট লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২০% হ্রাস পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে ৪৮% হ্রাস এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ১২% বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রকৃত ও লক্ষ্য স্থিরীকৃত সমাপ্তি মজুদের পার্থক্য ৮৮% ছিল যা পরবর্তী বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকৃত সমাপ্তি মজুদ বাজেট লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫৪% হ্রাস পেয়েছে কিন্তু তা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে দুই বছর ব্যতীত বিবেচ্য সময়ের মধ্যে প্রকৃত সমাপ্তি মজুদ তুলনামূলকভাবে বাজেট লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি ছিল, যা খাদ্যশস্যের মজুদ পরিকল্পনার সাফল্য হিসেবে দেখা যেতে পারে।

মোট খাদ্যশস্যের সরবরাহে ওএমএস এর অংশ বেড়েছে (খাদ্যবান্ধবসহ)

১৯৮০ দশকের শেষ দিকে কর্মাভাবকালীন (lean) অপেক্ষাকৃত উচ্চ খাদ্য মূল্যের মৌসুম-দ্বয় যথা: ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল (বোরো ফসল কর্তনের পূর্বে) ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর (আমন ফসল কর্তনের পূর্বে) খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য খোলা বাজারে (ওএমএস) চাল বিক্রি চালু করা হয়। পরবর্তীতে ওএমএস এর মাধ্যমে নিয়মিত বিক্রয় কার্যক্রম চালু করা হয়। সারণী-২২ এ দেখা যায়, ওএমএস খাতে চাল ও গম বিক্রির হার দেশে মোট খাদ্যশস্য সরবরাহের একটি ক্ষুদ্র অংশ। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মোট সরবরাহে ওএমএস এর অংশ ছিল ৩.৬২%, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল মাত্র ০.৮৬% । উল্লেখ্য যে, ওএমএস খাতে চাল বিক্রির হার ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল সর্বোচ্চ ১.১৪% বিগত অর্থ-বছর এ হারকেও অতিক্রম করেছে। যদিও ওএমএস মোট অভ্যন্তরীণ সরবরাহের একটি ক্ষুদ্র অংশ, খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে এর ভূমিকা খাটো করে দেখা যাবে না। যেহেতু ওএমএস মূলত: শহর কেন্দ্রিক, যা মৌসুম-ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাই স্বল্পকালের জন্য শহরের বাজারে এর প্রভাব পড়ে[১৪০]। মুক্তিযোদ্ধা, চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী এবং পোশাক শ্রমিকদের জন্য সুলভ মূল্য কার্ডের (FPC) মাধ্যমে চাল/আটা বিতরণ শুরু করায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ওএমএস এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে।

চিত্র নং-৩০ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

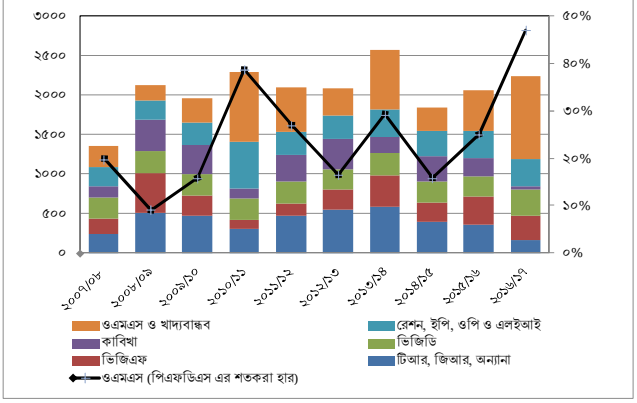

৫.৩.২. নীতি উন্নয়ন/চলমান কর্মসূচি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ৮-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ২৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-৮ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ১১% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ০.১৮%। তিনটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ১ গঠিত, যাতে ৭টি বাস্তবায়িত, ৩টি চলমান এবং ১টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ৮.১ ও ৮.২-এর আওতাভুক্ত কোন প্রকল্প ছিল না। উপ-কর্মসূচি ৮.৩-এর আওতাভুক্ত ১০টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ছয়টি অর্থবছরে ৪১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৩টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারিত আছে। সার্বিকভাবে কর্মসূচি ৮ এর আওতাভুক্ত ১০ টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে মোট ৪১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ৩ টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ১টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ০.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি ৮-এর আওতায় মোট বাজেট ব্যয় হয়েছে ২৫.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ সালের ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৩৫% হ্রাস নির্দেশ করে। চলমান প্রকল্পের সংখ্যা হ্রাস ও বাজেট হ্রাসের ফলে আগের বছরের তুলনায় কর্মসূচি ৮-এর বাজেট ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ৮-এর আওতায় মোট ২৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৬৩%। কর্মসূচি ৮-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৯০% ও ১০%। অপরদিকে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৩৪% ও ৬৬%। এ ধারা উন্নত সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যক্রমে সরকারি বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

দেশে সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা অতিরিক্ত ৭.২৫ লাখ মেট্রিক টন সম্প্রসারণ-কল্পে পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় এককভাবে ৫.৪০ লাখ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্প্রসারণ করা হবে। এই কাজগুলো আগামী ২০২০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মংলা বন্দরে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো, পোস্তগোলা আধুনিক ময়দা মিল এবং সান্তাহার সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার দ্বিতল গুদাম নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর শেষে সরকারি গুদাম ও সাইলোতে খাদ্যশস্য মজুদের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ২১.০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে যা ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ছিল প্রায় ২০.৪ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমানে আরও ৭.১৫ লাখ মে: টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এছাড়াও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে:

সরকারি খাদ্য সরবরাহ সিস্টেম বা পিএফডিএস ডিজিটালাইজেশন

খাদ্য অধিদপ্তর ও এফপিএমইউ'তে ইতোপূর্বে সম্পাদিত ডাটাবেজ সিস্টেম উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় সরকারি খাদ্য মজুদ পরিবীক্ষণের জন্য দেশব্যাপী একটি ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম কার্যকর করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এই আধুনিক প্রযুক্তি দেশব্যাপী খাদ্য মজুদ পরিবীক্ষণ এবং সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই সমস্ত উদ্যোগগুলি অত্যন্ত জরুরী ও অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকরভাবে খাদ্যশস্য বিতরণ ছাড়াও অপচয় রোধে সহায়ক হবে।

খাদ্যশস্যের গুণগত মান পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি

সরকার খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিদ্যমান খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৌশলগত অবস্থানে নতুন পরীক্ষাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের আওতায় পরীক্ষাগারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিশ্লেষণসহ পরীক্ষাগারের কার্যক্রমের আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে সুশাসন ও জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ

প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মদক্ষতা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চলমান রয়েছে। প্রতি বছর মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের মধ্যে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় একটি অর্থ বছরের মধ্যে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে চায়, তা প্রতিফলিত হয়। এই চুক্তি শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমকেই তুলে ধরে না, সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন নির্দেশক এবং তাদের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অগ্রগতিও নিরূপণ করে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ খাদ্য মজুদ সংরক্ষণ, উৎপাদন মৌসুমে কৃষক ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং পিএফডিএস খাতে বিতরণের জন্য মজুদ গড়ে তোলা, দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং দরিদ্র জনগণের স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহ, ইত্যাদি নির্দেশকের মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে।

খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন:

টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, কৃষকদের পণ্যের প্রণোদনামূলক মূল্য প্রদান, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারী ও শিশুর পুষ্টির উন্নয়ন সাধন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গ্রাম ও শহরে সমাজের মাঝে বিরাজমান আয় বৈষম্য হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ তথা ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে হত-দরিদ্রদের জন্য "খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি" চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০ লাখ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারকে বছরে কর্মাভাবকালীন দুই প্রান্তিকে যথা: সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল মোট পাঁচ মাস-ব্যাপী প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল সেলাই করা বস্তায় সরবরাহ করা হয়। দারিদ্র সূচকের ভিত্তিতে উপজেলা ওয়ারী চিহ্নিত অতি-দরিদ্র পরিবারগুলোকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারী প্রধান পরিবার এবং শিশু ও প্রতিবন্ধী বিশিষ্ট পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচিতে কেজি-প্রতি চাল ১০ টাকায় সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। ইউনিয়ন-ভিত্তিক ডিলাররা প্রধান প্রধান হাট-বাজারে অবস্থিত দোকান থেকে কার্ডের মাধ্যমে এ চাল সরবরাহ করছে। এতে প্রতিটি পরিবার গড়পড়তা মাসে ৮৬০ টাকার সুবিধা পাচ্ছে। এ কর্মসূচিতে বছরে সাড়ে সাত লাখ মে: টন চালের প্রয়োজন। এতে বছরে সরকারের ভর্তুকির মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২১০০ কোটি টাকা।

ভবিষ্যৎ করণীয়:

- **মান সম্পন্ন খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ ত্বরান্বিতকরণ :**

সারণী ২২- এ দেখা যায় যে, সরকার অতিরিক্ত ৭.৩ লাখ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৮টি ইস্পাতদ্বারা তৈরি সাইলো নির্মাণে একত্রিতভাবে ৫.৪ লাখ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে। এই প্রকল্পের মধ্যে কিছু কাজ ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় চলমান প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ আগামী জুন ২০২০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। জুন ২০১৭ সালের মধ্যে প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাত্র ১৯%। উল্লেখ্য, ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণের ক্ষেত্রে জুন ২০১৭ সালের মধ্যে মাত্র ৩৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে[১৪২]; এছাড়া অন্যান্য প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ১৫৮টি খাদ্য গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত খরচ এড়ানোর জন্য খাদ্য গুদাম ও সাইলো নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

- **সংগ্রহ কর্মসূচির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা:** সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম দুটি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রথমত : কৃষকদের ফসল কর্তন মৌসুমে যখন বাজার মূল্য কম থাকে, তখন কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি প্রণোদনা মূল্যে খাদ্যশস্য (ধান ও গম) সংগ্রহ করার মাধ্যমে কৃষকে পরবর্তীতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত: সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমের জন্য মজুদ গড়ে তোলা। সরকারি সংগ্রহ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি মজুদ গড়ে তুলতে পারলেই সংগ্রহ কর্মসূচিকে কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। **সরকারি খাদ্য মজুদ অত্যন্ত সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার এবং সরকার কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রণোদনা মূল্যে কৃষকের নিকট থেকে সরকারিভাবে খাদ্য সংগ্রহের এ প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার নীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও বিতরণ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে** । এছাড়াও সরকারি সংগ্রহ কার্যক্রম বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষককে সহায়তা করে থাকে[১৪৩]। সরকারি সংগ্রহ বাজার দরে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে তা গবেষণার বিষয়। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, সংগ্রহের পরিমাণ বাজারদরের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত, অর্থাৎ যখন বাজার দর কম থাকে, তখন সরকার বেশী করে সংগ্রহের মাধ্যমে বাজার মূল্যকে বাড়তে সহায়তা করে[১৪৪]। মিল মালিকদের নিকট থেকে চাল ক্রয়ের মাধ্যমে খাদ্যশস্যর মজুদ বৃদ্ধি সরকারের জন্য একটি সুবিধাজনক বিকল্প, কিন্তু এমন একটি নীতিমালা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যেন মিলিং ব্যবসা প্রতিযোগিতামূলক হয় এবং কৃষকরা মূল্যের ইতিবাচক সুবিধা পায়। অন্য আরেকটি উপায় হল কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে পরিচালিত শস্য গুদাম ঋণ কর্মসূচি (SHOGORIP)-এর ন্যায় শস্য মজুদের জন্য ঋণ প্রদান করা।

- **উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য মজুদ পরিবীক্ষণ উন্নতকরণ:** বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর সহায়তায় একটি পরীক্ষামূলক Software তৈরি করা হয়েছে। এই Software-টি Virtual Private Network (VPN) টাঙ্গাইল জেলার সকল খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম পোর্ট

(সিএমএস), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সাইলো এবং খাদ্য অধিদপ্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ Software-এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মজুদ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, চলাচল ও বাজার দর সংক্রান্ত তথ্যাদির আদান-প্রদান করা যাবে। ফলে খাদ্য পরিস্থিতি ও সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য আদান-প্রদান সহজতর হবে। এ ব্যবস্থা সারা দেশে বাস্তবায়ন করার দ্রুত কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ইতোপূর্বে উল্লেখিত বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় সরকার খাদ্য মজুদ পর্যবেক্ষণের জন্য দেশব্যাপী একটি ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম বাস্তবায়ন করছে। আশা করা যায়, এই উদ্যোগ দেশে উন্নত ও কার্যকর সরকারি মজুদ পরিবীক্ষণের জন্য অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। সরকারি মজুদের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি খাদ্য মজুদ পরিবীক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এফপিএমইউ কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০১১ সালের শেষে প্রায় ৬০ লাখ মেট্রিক টন (যা মোট উৎপাদনের প্রায় ২০%) চাল বেসরকারি মজুদ হিসেবে ছিল[১৪৫]। গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকেরা উৎপাদন মৌসুমের পরেও পরিবারের জন্য বড় পরিমাণ আমন চাল ঘরে মজুদ রাখে। সুতরাং কার্যকর খাদ্য পরিকল্পনার জন্য সময়মত দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় মজুদের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন।

- **কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং খাদ্য তথ্য-ব্যবস্থা প্রণয়ন:** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন, মূল্য এবং মজুদের উপর আগাম তথ্য ব্যবস্থা কার্যকর খাদ্য পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। ১৯৯০ দশকের শেষ দিকে পূর্ব সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে খাদ্য মন্ত্রণালয় পূর্ব-সতর্কীকরণ ও খাদ্য তথ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (স্ট্রেন্দেনিং অফ আর্লি-ওয়ার্নিং এন্ড ফুড ইনফরমেশন) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। খাদ্য উৎপাদন পূর্বাভাসের জন্য শস্যের উৎপাদনশীলতার সাথে আবহাওয়ার বিভিন্ন স্থিতিমাপের (প্যারামিটার) সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং পানির ভারসাম্য সূচক মডেল ব্যবহার করত: খাদ্য উৎপাদনের পূর্বাভাষ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বৎসরের বিভিন্ন সময়ে শস্যের উৎপাদন পরিবীক্ষণের জন্য এফপিএমইউ'তে পূর্ব-সতর্কীকরণ কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই উদ্যোগকে পুনঃজাগরিত করে কার্যকর খাদ্য পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বিশেষ করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উৎপাদন, মূল্য এবং খাদ্য মজুদের সময়-ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- **নতুন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের (NSSS) সাথে PFDS ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সাধন:** সরকার সম্প্রতি দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) প্রণয়ন করেছে। এটি অতীতের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রণীত এবং এর মাধ্যমে ২০২১ সাল[১৪৬] এবং পরবর্তীতে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বীমা অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণে সরকার বদ্ধপরিকর। NSSS এর আওতায় যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদে শর্তযুক্ত ও শর্তহীন খাদ্য-ভিত্তিক কার্যক্রমকে ধীরে ধীরে নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তর করার বিষয়টি গভীর বিবেচনার দাবী রাখে। NSSS জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জীবনচক্রের উপর জোড় দেয়া হয়েছে এবং এতে ছোট ছোট অনেক কর্মসূচি একত্র করে যথাসম্ভব কম সংখ্যক প্রাধিকার কর্মসূচিতে রূপান্তরের নির্দেশনা রয়েছে। এতে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক দরিদ্র ও অসহায় মানুষের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। সরকারের খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বড় আকারের মজুদ সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য বাজারে নিরবচ্ছিন্ন অবিকৃত (non-distortionary) হস্তক্ষেপ করা । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য কিছু খাদ্য ভিত্তিক কর্মসূচি রেখে অবশিষ্ট খাদ্য ভিত্তিক কর্মসূচি সংহত করে নগদ অর্থ-ভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরের উদ্যোগ কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। তবে সংগ্রহ অভিযান অব্যাহত রাখলে বড় আকারের খাদ্য মজুদ থাকবে। আর সেই ক্ষেত্রে মজুদ আবর্তন সচল রাখা প্রয়োজন হবে। সুতরাং উক্ত দুইটি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে NSSS-এ বর্ণিত অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায়, আর পাশাপাশি পরিকল্পিত মজুদ গড়া ও তা আবর্তনের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখা যায়।

৫. ৪. কর্মসূচি ৯ - কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

কর্মসূচি ৯-এর লক্ষ্য হচ্ছে দুইটি উপ-কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে উপকারভোগী চিহ্নিতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধি। দুইটি উপ-কর্মসূচি হল- (১) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ ও একটি নতুন সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন; এবং (২) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে আয় বর্ধন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিনিয়োগ। এটি মূলত: জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার দুইটি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত সরকারি মজুদ থেকে জরুরী প্রয়োজনে খাদ্যশস্য বিতরণের কার্যকারিতা ও পরিধি বৃদ্ধি (কর্ম-পরিকল্পনার হস্তক্ষেপের-ক্ষেত্র ২.২) এবং খাদ্য-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের দক্ষতা বৃদ্ধি, লক্ষ্য নির্ধারণ, অপচয় (wastage) হ্রাস, পরিধি ও পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি (পিওএ এওআই ২.৩)।

৫.৪.১. কর্মসূচি ৯-এর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

সারণী - ২৪ : সিআইপি কর্মসূচি ৯-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সিআইপি/ জাতীয় খাদ্য নীতি কর্ম-পরিকল্পনার আউটপুট প্রক্সি নির্দেশকসমূহ		*২০০৭-২০০৮*	*২০০৯-২০১০*	*২০১৪-২০১৫*	*২০১৫-২০১৬*	*২০১৬-২০১৭*	*উৎস*
বাজেটে উপকারভোগীর সংখ্যা	ভিজিএফ (লাখ জন)	-	৮৫.০০	৬৪.৭২	৬৪.৭২	৬৪.৭২	জাতীয় বাজেট, অর্থ মন্ত্রণালয়
	ভিজিডি (লাখ জন মাস)	-	৮৮.৩৩	৯১.৩৩	৯১.৩৩	১২০	
মোট দেশজ উৎপাদনের তুলনায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে ব্যয়ের হার ১৪৭		-	১.৯৫%	১.৪২%	১.৪৬%	১.৫৬%	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্পে উপকারভোগীর সংখ্যা (লাখ জন মাস)		-	৪৫	৪৪	৪৪	৩৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ভিজিএফ ও জিআর খাতে বিতরণের পরিমাণ (হাজার মে. টন)		২২৬	২৮৫	৩২০	৪২৮	৩৯১	খাদ্য অধিদপ্তর

মোট দেশজ উৎপাদনের অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ব্যয় অপরিবর্তিত রয়েছে:

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে ব্যয় ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট জিডিপি'র ১.৯৫% থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১.৪২% এ নেমে আসে, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১.৫৬% দাঁড়িয়েছে (সারণী-২৪)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট ছিল ২৫২.৬ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেড়ে ৩০৫.৮ বিলিয়ন টাকা হয়, ফলে নামিক (nominal) মূল্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাজেট বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অব্যাহত থাকবে বলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত বাজেট (৪৩৩.৩ বিলিয়ন টাকা) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ১২.২%, যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৯.০% ছিল। এই হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অপরিবর্তিত (৯.৬%) রয়েছে। একইভাবে, সামগ্রিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতের অংশ হিসাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট সামাজিক সুরক্ষা খাতে খরচের ৮০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭৫% এ দাঁড়িয়েছে[১৪৮]। এই হার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮০% তে বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাজেটে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ ২০০৯-১০ অর্থবছরের ৩৭% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৪% হয়েছে (লেখচিত্র-২৯)।

চিত্র নং-৩১ সামাজিক সুরক্ষা এবং মোট বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে বরাদ্দের হার

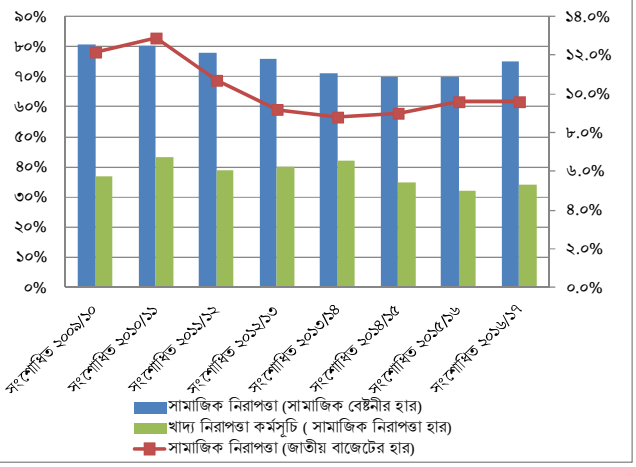

ভিজিএফ এর পরিধি অপরিবর্তিত ও ভিজিডি এর পরিধি বৃদ্ধি

২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ভিজিএফ খাতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৬৪.৭ লাখ জনে অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু এই সংখ্যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের ৮৫.০ লাখ জন থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ে বড় ধরণের কোন মৌসুমি ক্ষতি (Shocks), প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মূল্য বৃদ্ধি না হওয়ায় ভিজিএফ-এর অধীনে বিতরণ হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে। ভিজিএফ এবং জিআর খাতের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৩.২০ লাখ মেট্রিক টন থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪.২৮ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উক্ত সংখ্যা ৩.৯১ লাখ মেট্রিক টনে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ভিজিডি খাতে বিতরণ জাতীয় খাদ্য নীতির ভিত্তি বছর ২০০৭-০৮ সালের ৮৮.৩ লাখ জন মাস থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১২০ লাখ জন মাসে উন্নীত হয়েছে। ভিজিডি খাতের উপকারভোগীর সংখ্যা বিগত তিন বছর ধরে অপরিবর্তিত থাকলেও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়েছ (সারণী-২৪)।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচির পরিধি অপরিবর্তিত

মৌসুমি বেকারত্ব বা খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব প্রশমন করতে কিছু প্রকল্প একযোগে পরিচালিত হচ্ছে । এরমধ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিশ্ব-বাজারে খাদ্য-মূল্যের উর্ধ্বগতি মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গৃহীত হয়, যেমন ''অতি-দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচি (EGPP)'', যা প্রথম শুরু হয় ২০০৮ সালে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল কৃষিতে কর্মহীন মৌসুমে স্বল্পকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ স্থানীয়/পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় হত-দরিদ্র জনগণের জন্য জনপ্রতি ৮০ কার্যদিবসের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সব হত-দরিদ্র পরিবারের গৃহকর্তা শ্রমিক এবং যাদের জমির পরিমাণ ০.৫ একরের কম, তাদের জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, EGPP কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ ৩৬ শতাংশ[১৪৯]। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় EGPP-তে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সর্বনিম্ন ৪৪ লাখ জন উপকারভোগীর জন্য ১৫০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কমে ৩৯ লাখ জনে নেমে এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৬৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৯ লাখ জনকে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৫.৪.২. গৃহীত কর্মসূচি এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ৯-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ৯১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-৯ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ২৮% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ১.৪২%। দুইটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ৯ গঠিত, যাতে ২৫টি বাস্তবায়িত, ১৩টি চলমান এবং ১টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ৯.১-এর আওতাভুক্ত ১টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ছয়টি অর্থবছরে ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া প্রক্রিয়াধীন ৩টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। উপ-কর্মসূচি ৯.২-এর আওতাভুক্ত ২৪টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে ২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। বাস্তবায়নাধীন ১৩টি প্রকল্পের অব্যয়িত বাজেট হিসাবে ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত আছে। সার্বিকভাবে কর্মসূচি ৯ এর আওতাভুক্ত ৩৮ টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে মোট ২১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়। এছাড়া ১৩ টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অব্যয়িত অবস্থায় ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও প্রক্রিয়াধীন ১টি প্রকল্পের বাজেট চাহিদা হিসাবে ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি ৯-এর আওতায় মোট বাজেট ব্যয় হয়েছে ২৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ সালের ২৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় প্রায় ৩% হ্রাস নির্দেশ করে। চলমান প্রকল্পের বাজেট হ্রাস হবার ফলে আগের বছরের তুলনায় কর্মসূচি ৯-এর বাজেট ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ৯-এর আওতায় মোট ১৮২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৮৬%। কর্মসূচি ৯-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৬৪% ও ৩৬%। অপরদিকে, বাস্তবায়নাধীন

প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৬৭% ও ৩৩%। এ ধারা কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে সরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুমোদিত

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) ২০১৫ সালের জুলাই মাসে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত কৌশল সীমিত নিরাপত্তা বেষ্টনীর ধারণা থেকে বের হয়ে কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বীমা অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক সুরক্ষা সুযোগ বর্ধিত করার মাধ্যমে একটি উদীয়মান মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের আশু চাহিদা মোকাবেলার প্রয়াস নিয়েছে। শিশু, যুবক ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী, দুঃস্থ নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ বয়স্ক মানুষের জীবন-চক্রের (life-cycle) ঝুঁকি হ্রাস করা এই কৌশলের লক্ষ্য। এই কৌশল ও কর্মসূচি সামাজিক উন্নয়ন নীতি কাঠামোর একটি অংশ। দারিদ্র্য বিমোচনসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, উপজাতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করে সরকারের নীতি কৌশল সমন্বয় করে এই কৌশল প্রণীত হয়েছে।

নিম্নলিখিত দুটি বিষয় NSSS এর কৌশলগত ধারণা বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ:

প্রথমত, এটিতে সকল প্রাপ্য নাগরিকের দারিদ্র্য ও বৈষম্য রোধে অধিকার-ভিত্তিক অভিগমন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে করে উপকারভোগীর অধিকার সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য মোকাবেলার মাধ্যমে ব্যাপক মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা যায়[১৫০]। উল্লেখ্য, সরকারের বিভিন্ন নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির[১৫১] মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে, কিন্তু অধিকার-ভিত্তিক অভিগমন ও নীতি তেমন অনুসৃত হয়নি। এসব নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো সংযোজনসহ বিভিন্ন ধরণের সমন্বয় প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, জীবনচক্র ঝুঁকির উপর অগ্রাধিকার দিয়ে অসংখ্য কর্মসূচিকে সংহত করে স্বল্প সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে একটি সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল কৌশল হচ্ছে জীবনচক্রের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন সব হত-দরিদ্রের সমন্বয় করে শিশু, কর্মক্ষম মানুষ, যুব-সমাজ, নারী, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।

কাজের বিনিময়ে অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রকল্পসমূহ (Workfare) সংহতকরণ

বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে মৌসুমি বেকারত্ব মোকাবেলাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজের বিনিময়ে অর্থ/খাদ্য কর্মসূচি প্রকল্পসমূহ চালু করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ''অতি-দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচি'' EGPP-এর আওতায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও অপচয় হ্রাসের জন্য কিছু সংস্কার কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যসমূহ: (ক) বাংলাদেশের অতি-দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। বিশেষ করে যে সমস্ত ভৌগোলিক এলাকায় দারিদ্র্যের হার বেশী সে সব এলাকায় এ কর্মসূচিতে উপকারভোগী মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মজুরি প্রদান এবং পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থা উন্নতকরণ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অতীতের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে এই সংস্কার কর্মসূচি আরও সুসংহত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হিসাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MoDMR) এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (MoLGRDC)-এর মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে ''অতি-দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচি'' কে সমন্বিত ও সংহত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং কার্যকর MIS ব্যবস্থা স্থাপনসহ উত্তম পন্থাসমূহ (best practices) প্রয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দুর্যোগ চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে খাদ্য হস্তান্তর চলবে। ক্ষুধা ও খাদ্য প্রাপ্তি সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন খোলা বাজারে বিক্রয় কার্যক্রম (ওএমএস) প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারণ করা হয়ে থাকে। খোলা বাজারে বিক্রয় কার্যক্রম স্ব-লক্ষ্য অর্জনকারী হিসেবে কাজ করবে। ওএমএস-এর

মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ সরকারের খাদ্য মজুদ নীতি ও ফেয়ার প্রাইস নীতির সাথে সমন্বিত হবে বলে আশা করা হয়। যে সব বছর দুর্যোগ কম থাকে অথবা হয় না, সে সমস্ত বছরে কার্যকরভাবে খাদ্যশস্যের মজুদ ব্যবস্থাপনার জন্য নগদ অর্থ ও খাদ্য হস্তান্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। খাদ্য সংরক্ষণে কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্ট সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদ পরবর্তী বছরগুলোতে জরুরী কর্মসূচির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নগদ অর্থ ও খাদ্য স্থানান্তরের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। NSSS বাস্তবায়ন-কল্পে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে চলমান আছে।

সামাজিক সুরক্ষা ও কৃষির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি

গ্রামীণ দারিদ্র্য ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য কৃষি ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয় প্রয়োজন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ঋণ, সঞ্চয় ও তারল্য সংকট সংশ্লিষ্ট অসুবিধাসমূহ দূর করতে সাহায্য করে[১৫২]। একই ভৌগোলিক সীমানায় বিদ্যমান ক্ষুদ্র কৃষি খামারের জন্য গৃহীত কর্মসূচি ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা গেলে তা গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণকে আরও ফলপ্রসূ করতে পারে। যে সকল কৃষক নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী এবং উৎসাহী, তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ খসড়া নীতি (NAEP, ২০১৫) অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ৫৩% কৃষক ভূমিহীন, যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯ হেক্টরের কম[১৫৩]। এই পরিবারগুলো মূলত বর্গা-চাষ ও কৃষি মজুরী থেকে প্রাপ্ত রোজগারের উপর নির্ভরশীল। তাদের অনেকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপকারভোগী হিসেবে চরম দরিদ্র পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। কিছু কৃষি কর্মসূচি যেমন; কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি ভাল উৎপাদনশীল নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত। যেহেতু চরম দারিদ্র্য ভূমিহীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই পশু পালন, মৌ ও মাশরুম চাষের মত অ-শস্য কৃষি কার্যক্রম এই শ্রেণীর মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে অধিকতর উপযুক্ত কর্মসূচি হিসেবে মনে করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারকে উপযুক্ত গবাদিপশু ও মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও করণীয়:

- **জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ**

  অধিকতর অংশগ্রহণমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপান্তরে যথাযথ বাজেট বরাদ্দের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মুখ্য বিষয়। বাজেটের উপর ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে: সার্বজনীন (যেমন: শিশুদের জন্য অনুদান) এবং লক্ষ্যমুখী কার্যক্রম (যেমন: দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প)-এর মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন; আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধিকারের ক্ষেত্র নির্ধারণ; এবং উপকারভোগীদের সহায়তার পরিমাণ (transfer size) এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধন। জীবনচক্র পদ্ধতি একটি উন্নত ধারণা এবং তার মধ্যে জীবন চক্রের প্রথম ১০০০ (এক হাজার) দিনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, শিশুদের পরিচর্যায় ঘাটতি থাকলে তা শিশুদের পুষ্টিহীনতা বাড়াতে এবং বুদ্ধি উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ফলশ্রুতিতে, তাদের ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতা হ্রাসসহ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধির আশংকা থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চ মান সম্পন্ন তথ্য পদ্ধতি থাকা দরকার। এক্ষেত্রে, একক নিবন্ধন বিশিষ্ট তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে (Single Registry Management Information System) নীতি-নির্ধারকদের জন্য তথ্য প্রাপ্যতা সহজতর করা অত্যাবশ্যক।

- **খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের সঙ্গে নগদ এবং খাদ্য-ভিত্তিক কর্মসূচির সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ**

  দুর্যোগকালীন জরুরী বিতরণ, মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য খোলা বাজারে চাল বিক্রয় ও মজুদের চক্রায়নের (stock rotation) জন্য খাদ্য-ভিত্তিক কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে সব বছরগুলোতে কোন দুর্যোগ হয় না বা কম হয়, সে সব বছরগুলোতে খাদ্য মজুদ নষ্ট না করতে খাদ্য ও নগদ টাকায় বিক্রয়-ভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। বিতরণ ব্যবস্থার খাদ্য ও নগদ টাকা-ভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যে পারস্পরিক স্থানান্তর প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা

দরকার। উল্লেখ্য যে, সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৩০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে (কর্মসূচি ৮)। এই বর্ধিত কার্যকর গুদাম ধারণক্ষমতা পরবর্তী বছরগুলোতে দুর্যোগকালীন সময়ে যথাযথ ব্যবহার তথা খাদ্যশস্যর টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে খাদ্য-ভিত্তিক কর্মসূচির সাথে নগদ টাকা-ভিত্তিক কর্মসূচির সমন্বয় করা প্রয়োজন।

- **বাজার-তাড়িত উদ্যোগসহ ক্ষুদ্র/মাঝারি শিল্প সম্প্রসারণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ**

  বাজার-তাড়িত উদ্যোগকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সাথে সমন্বিত করে সরকারি ব্যয়কে আরও কার্যকর করা সম্ভব। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের জন্য জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে কমিউনিটি-ভিত্তিক অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক প্রভাব সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের কর্মসংস্থান সুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ-ভিত্তিক কার্যক্রমে তাদের মতামত গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মানের উন্নতি এবং প্রশিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো সম্ভব।

- **পুষ্টি সমন্বিত খাদ্য-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণে গুরুত্ব বৃদ্ধিকরণ**

  পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল (fortified rice) বিতরণের ক্ষেত্রে চলমান কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (যেমন: মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়) কর্তৃক রোডম্যাপ ও কার্যকর একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমর্থন প্রয়োজন, যাতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ থাকে এবং এই কর্মসূচির স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হয়। খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণ সমন্বয় করতে হবে। ব্র্যাক পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এই চালের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে বাজারজাত করা গেলে পুষ্টিগত অবস্থা ও খাদ্যাভ্যাস উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৬. খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহার: সিআইপি এবং জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার ফলাফল সূচকের অগ্রগতি

জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার তৃতীয় স্তম্ভ 'খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টির উন্নতি'র বিষয়টি বিনিয়োগ পরিকল্পনার কর্মসূচি ১০, ১১ এবং ১২ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই তিনটি কর্মসূচিতে 'কমিউনিটি-ভিত্তিক পুষ্টি কর্মসূচি ও সেবা', 'খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি তথ্য'; 'নিরাপদ খাদ্য', 'খাদ্যের গুণগত মান' এবং 'ভোক্তা সুরক্ষা' এবং 'জনস্বাস্থ্য'-সহ 'নিরাপদ খাদ্যের মান ও গুণ নিয়ন্ত্রণ' সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করা রয়েছে। জাতীয় খাদ্য নীতির তৃতীয় উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিকল্পনার আটটি কার্যক্ষেত্রের সাথে এই তিনটি কর্মসূচির সামঞ্জস্য রয়েছে। (সংযুক্তি-১ দ্রষ্টব্য)।

৬.১. কর্মসূচি ১০ - কমিউনিটি-ভিত্তিক পুষ্টি কর্মসূচি এবং সেবাসমূহ

কমিউনিটি-ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম ও সেবার বিষয়টি কর্মসূচি ১০-এ বর্ণিত রয়েছে যা মূলত: সরকারের (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের) জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রম নামক 'প্রায়োগিক পরিকল্পনা (অপারেশনাল প্ল্যান)' দ্বারা প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয় কমিউনিটি, বিশেষ করে মা ও শিশুদের প্রাধান্য দিয়ে প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় সার্বিক সেবার পরিধি, প্রাপ্যতা ও প্রচার বৃদ্ধি করাই জাতীয় পুষ্টি সেবার লক্ষ্য। কর্মসূচিতে পুষ্টি ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপ-খাতের মধ্যে সমন্বয় ও পরিপূরকতা জোরদার করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। কর্মসূচিটি জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৩.৭ এবং ৩.৮ কার্যক্ষেত্রে দুঃস্থদের সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য-ভিত্তিক কর্মসূচি এবং শিশুর বৃদ্ধি পরিবীক্ষণ, খাদ্য বৈচিত্র্য বিষয়ক পুষ্টি শিক্ষা, সম্পূরক খাদ্য ও পুষ্টি সমৃদ্ধকৃত (fortified) খাদ্য প্রদান, মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য, মায়ের দুগ্ধ ও উপযুক্ত পরিপূরক (complementary) খাদ্য খাওয়ানোর সুরক্ষা ও প্রচার প্রভৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬.১.১. কর্মসূচি ১০-এর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

সারণী - ২৫ : সিআইপি কর্মসূচি-১০-এর অর্জনের অগ্রগতি

সিআইপি/খাদ্য নীতি কর্ম-পরিকল্পনার আউটপুট-প্রক্সি নির্দেশকসমূহ		২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	উৎস
শুধুমাত্র মায়ের দুগ্ধ-পানকারী ৬ মাসের কম বয়সী শিশুর অনুপাত		৪৩% (২০০৭)	তথ্য নাই	৫৫.৩% বিডিএইচএস	তথ্য নাই	৬০% ইউইএসডি	বিডিএইচএস, ইউইএসডি,
বসতবাড়িতে বাগান এবং হাঁস-মুরগির খামার উন্নয়নকারী দরিদ্র পরিবারের হার		তথ্য নাই	তথ্য নাই	৪৯.০%	তথ্য নাই	তথ্য নাই	এসএফএসএন
		(২০০৫)	তথ্য নাই	(২০১৩)	তথ্য নাই	তথ্য নাই	এফএও
বিভিন্ন ধরণের খাদ্য থেকে শক্তি সরবরাহের হার	শস্য	৭৮.৬%		৭৬.৩%			
	চিনি ও মিষ্টি	৪.১%		৩.১%			
	তেল ও তেল জাতীয় শস্য	৬.৫%		৬.৫%			
	মূল ও কন্দাল	২.৫%		৩.৮%			
	ডাল	১.৭%		২.৫%			
	ফল ও শাক-সবজি	১.৬%		২.২%			
	মাছ, মাংস, ডিম ও দুগ্ধ	৩.৩%		৪.০%			
	অন্যান্য খাদ্য *	১.৭%		১.৪%			
সার্বিক তীব্র অপুষ্টির (*GAM*) বিস্তার <৫ বছর, <-২এসডি		১৭.৪%	১৩.৫%	১১% এসএফএসএন	১০% এসএফএসএন	তথ্য নাই	বিডিএইচএস এসএফএসএন
সার্বিক মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির বা *SAM* বিস্তার <৫ বছর, <-৩ এসডি		২.৯%	৩.৪%	২ % এসএফএসএন	২% এসএফএসএন	তথ্য নাই	বিডিএইচএস এসএফএসএন
গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার সেবা গ্রহণকারী মহিলাদের অনুপাত		২২.০%	-	৪৩% এসএফএসএন	২৯% এসএফএসএন	৩২% ইউইএসডি	ইউইএসডি, এসএফএসএন

অন্যান্য * - উদ্ভেজক পদার্থ, মশলা, অফাল, প্রাণিজ-চর্বি, জলজ-পণ্য এবং বিবিধ।

ছয়-মাসের কম বয়সী শিশুর শুধুমাত্র মায়ের দুগ্ধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের প্রয়োজনীয় শারীরিক বৃদ্ধি, উন্নতি ও স্বাস্থ্য অর্জন করার লক্ষ্যে মায়েরা তাদের শিশুদের জন্মের পর প্রথম ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুগ্ধ খাওয়াবে । কিন্তু এটি সর্বত্র অনুসরণ করা হচ্ছে না এবং সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে শুধুমাত্র মায়ের দুগ্ধ খাওয়ানোর হার হ্রাসের বিষয়টিকে মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মায়ের দুগ্ধ পুষ্টি ও শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে, যা ৬ থেকে ১২ মাস বয়সী শিশুদের প্রয়োজনের অর্ধেকের বেশী খাদ্য শক্তি সরবরাহ করে এবং ১২ থেকে ২৪ মাস বয়সী শিশুদের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য শক্তি সরবরাহ করে। বিডিএইচএস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী শুধুমাত্র মায়ের দুগ্ধ খাওয়ানোর হার ১৯৯৩ সালে ৪৩% থেকে ২০১১ সালে ৬৪% এ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা ২০১৪ সালে হ্রাস পেয়ে ৫৫.৩%এ নেমে এসেছিল। 'স্টেইট অফ ফুড সিকুইরিটি এন্ড নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ (এসএফএসএন) প্রতিবেদন, ২০১৫' অনুযায়ী এই হার আরও হ্রাস পেয়ে ৪৭% এ নেমে এসেছিল[১৬৯]।তবে ইউইএসডি ২০১৬ রিপোর্ট অনুযায়ী এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৬০% হয়েছে।

বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে ডায়রিয়া এবং নিউমোনিয়ার মত সংক্রামক ব্যাধি এবং মৃত্যুর হার কমানো ছাড়াও শিশু ও মায়েদের নানা উপকারের বিষয়টি প্রমাণিত[১৫৪]। মায়েদের দীর্ঘমেয়াদী টাইপ-২ ডায়াবেটিস, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, বয়স্কদের কার্ডিও-ভাস্কুলার রোগ, স্তন ক্যান্সার ও ওভারিয়ান ক্যান্সার-এর সম্ভাবনা হ্রাস করাসহ স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন উপকার পাওয়া যায়। সুতরাং শিশু পুষ্টির উন্নয়নে সহায়তাকারী ফ্যাক্টর এবং প্রতিবন্ধক ফ্যাক্টরসমূহকে চিহ্নিত করা উচিত। বিশেষ করে জন্মের পরে ৬ মাস পর্যন্ত শিশুদেরকে শুধুমাত্র মায়ের দুগ্ধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি এবং মায়ের দুগ্ধ খাওয়ানোর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে স্তন-দাত্রী মায়েদের জন্য গণমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রমের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগির পালনে উন্নতি পরিলক্ষিত

বসতবাড়িতে পরিকল্পিতভাবে সবজি-বাগান গড়ে তোলা এবং হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে গৃহ পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP)-এর অন্যতম লক্ষ্য হল কৃষির সাথে পুষ্টির নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন। এসএফএসএন রিপোর্ট অনুযায়ী বসতবাড়িতে বাগান এবং হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে এমন দরিদ্র পরিবারের হার ২০১১ সালে ৪২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৪৯% হয়েছে (সারণী-২৫)। এসএফএসএন-এর ২০১৫ সনের রিপোর্ট-এ 'বসতবাড়িতে বাগান এবং হাঁস-মুরগীর খামার রয়েছে এমন দরিদ্র পরিবারের হার' বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে 'পোল্ট্রি বায়ো-সিকিউরিটি এবং উৎপাদন প্রকল্প' এবং 'সমন্বিত কৃষি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রকল্প' দুইটির সমাপ্ত জরিপে এই সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। পোল্ট্রি বায়ো-সিকিউরিটি এবং উৎপাদন প্রকল্পের ভিত্তি জরিপ[১৫৫] অনুযায়ী দক্ষিণাঞ্চলের কিছু জেলায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগির চাষ এবং ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক খামার রয়েছে, যার মধ্যে ৮৬.২% পরিবার হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। ২০১৬ সনে অনুষ্ঠিত এই প্রকল্পের সমাপ্ত জরিপ (End Line Survey) অনুযায়ী ৯২% পরিবার গৃহ-পর্যায়ে হাঁস-মুরগি পালন করছে, যেখানে ২০১৪ সনের স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি এন্ড নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ (এসএফএসএন) প্রতিবেদন অনুযায়ী এই হার ছিল ৬৪%। সমন্বিত কৃষি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির সমাপ্তি জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী ৪৭.৭% বসতবাড়িতে সবজি-বাগান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৬২.৪% সুবিধাভোগী বসতবাড়িতে সবজি চাষের সাথে জড়িত[১৫৮] ।

সরকারের 'কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)'- কর্তৃক 'কৃষকদের পুষ্টি স্কুল' এবং 'কৃষকদের মাঠ পর্যায়ের স্কুল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে যাদের পরিবারে গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলা এবং অনূর্ধ্ব ২ বছর বয়সী শিশু রয়েছে। জাতীয় পুষ্টি সেবা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পুষ্টি সংবেদনশীল কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে[১৫৬, ১৫৭] চাষাবাদের মৌসুমে বীজ প্রদানসহ বসতবাড়িতে সবজি উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন খাদ্য গ্রুপ থেকে মোট খাদ্য-শক্তির সরবরাহের অংশ সামান্য বৃদ্ধি

বাংলাদেশে বেশীর ভাগ লোক শর্করা জাতীয় খাদ্যকে প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, যা সবথেকে কম মূল্যের খাদ্য-শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত। এই খাদ্য-শক্তিকে স্টার্চি মূল এবং দানা-শস্য জাতীয় খাদ্য একত্রিতভাবে বা পৃথকভাবে ভাগ করা যেতে পারে, এতে স্টার্চি-মূলের তুলনায় বেশী আমিষ থাকে। বিভিন্ন ধরণের খাদ্য গ্রুপ থেকে খাদ্য খাওয়া হলে অধিক মাত্রায় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা মেটানো যায়, যা সাধারণত: স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের সরবরাহে পুষ্টি উপাদানের অংশীদারিত্বে সামান্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। মোট খাদ্য-শক্তি সরবরাহে প্রাণিজ খাদ্য-উৎস থেকে প্রাপ্ত আমিষ ও চর্বি সরবরাহের হার ২০০৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকলেও (সারণী-২৬), তাতে সামান্য অগ্রগতি দেখাচ্ছে। কর্মসূচি ৪, ৫ এবং ১১ তে দেখানো হয়েছে যে, আমিষের চাহিদা মেটাতে এবং অণুপুষ্টির লভ্যতা নিশ্চিত করতে প্রাণিজ সম্পদ এবং মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী- ২৬ : খাদ্য শক্তি সরবরাহে প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত আমিষ ও চর্বির হার

৩ বছরের গড়	*আমিষ*		*চর্বি*	
	মোট খাদ্য-শক্তির শতকরা হার	*প্রাণিজ খাদ্য থেকে প্রাপ্তির শতকরা হার*	*মোট খাদ্য-শক্তির শতকরা হার*	*প্রাণিজ খাদ্য থেকে প্রাপ্তির শতকরা হার*
২০০০ -০২	৮.৬০	১.১	১০.৫	১.৬০
২০০৩-০৫	৮.৭০	১.২	১০.৭	১.৭০
২০০৪-০৬	৮.৮০	১.৩	১০.৬	১.৮০
২০০৫ -০৭	৮.৮০	১.৪	১১.৫	১.৮০
২০০৭-০৯	৯.১০	১.৫	১০.০	১.৯০
২০০৮ -১০	৯.১১	১.৬	১০.৬	২.০৭
২০০৯ -১১	৯.০২	১.৬	১১.০	২.১৫
২০১০-১২	৯.১২	১.৬	১১.০	২.১৭

উৎস: এফএও-পরিসংখ্যান

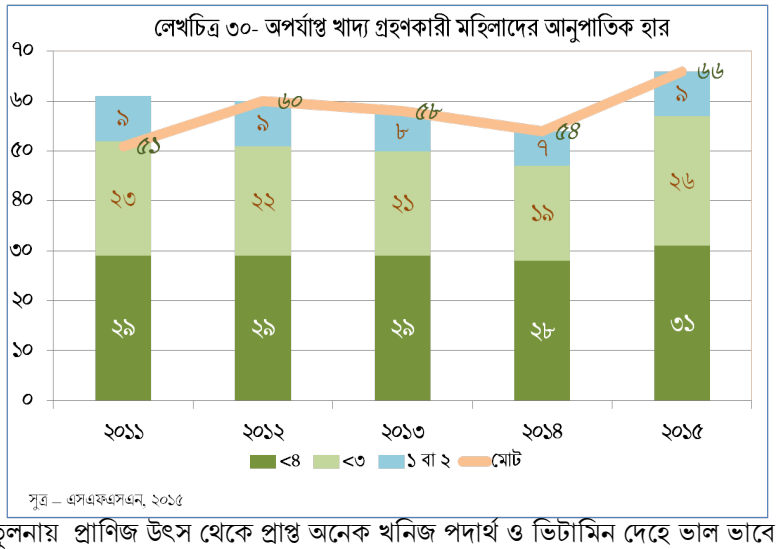

প্রাণিজ উৎসের খাদ্য হিসেবে দুগ্ধ ও দুগ্ধ-জাতীয় খাদ্য, মাংস, মাছ ও পোল্ট্রি বিবেচিত। আমিষ ও চর্বি সরবরাহ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জনপ্রতি দুগ্ধ এবং দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ কম। প্রাণিসম্পদ উপখাতে হাঁস-মুরগির কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। প্রাণিজ উৎসের খাদ্য, খাদ্য-শক্তি সমৃদ্ধ এবং আমিষ, খনিজ পদার্থ (আয়রন, জিংক এবং ক্যালসিয়াম), ভিটামিন (বি-১২ এবং রিবোফ্লাভিন)-এর ভাল উৎস। উদ্ভিদ উৎসের তুলনায় প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত অনেক খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন দেহে ভাল ভাবে শোষিত হয়। প্রাণিজ উৎসের খাদ্যে চর্বি ও খাদ্য-শক্তির পরিমাণ বেশী থাকে। এতে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের পরিমাণও বেশী থাকে[১৫৮]। প্রাণিজ উৎসের খাদ্য অণুপুষ্টির চাহিদা মেটায়, যার ফলে এ খাদ্য অল্প পরিমাণে খেলেও পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের মত কাজ করে। প্রাণিজ উৎসের খাদ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য ও সহজ-প্রাপ্য হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে তাঁরা বৈচিত্র্যময় খাদ্য গ্রহণ করে আমিষ ও অণুপুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে।

মহিলাদের অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের হার বৃদ্ধি

কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করতে হলে পুষ্টি সংশ্লিষ্ট ফলাফল (আউটকাম) যেমন: খাদ্য বৈচিত্র্য এবং নারীর ক্ষমতায়নকেও বিবেচনা করতে হবে। মহিলাদের নতুন খাদ্য বৈচিত্র্য সূচকের মাধ্যমে মহিলাদের খাদ্যে অণুপুষ্টির পর্যাপ্ততা সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে[১৫৯]। বাংলাদেশে মহিলাদের খাদ্যে অণুপুষ্টির অপর্যাপ্ততা যাচাই কালে দেখা যায় যে, মহিলাদের অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের হার ২০১১ সনে ৬১% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সনে ৫৪% হয়েছিল[১৬০]। তবে ২০১৫ সনে তা আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬% হয়েছে[১৬৯]। ২০১৫ সনের উপাত্ত একটি মাত্র মৌসুম (৭ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর ২০১৫) থেকে নেয়া হয়েছে বলে এই হার আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে (লেখচিত্র-৩০)।

ঢাকা শহরের বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের অপুষ্টির হার বেশী

ঢাকা শহরের বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের অপুষ্টি অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে রয়েছে। স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি এন্ড নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ (এসএফএসএন) ২০১৫ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী পাঁচ বয়সের কম বয়সী শিশুদের খর্বতার হার ৪৫%, যা জাতীয় খর্বতার হারের তুলনায় ৯% বেশী[১৬৯]। এ ছাড়া কৃশকায়তার হার ১০% এবং বয়সের তুলনায় কম ওজন বিশিষ্ট শিশুদের হার ৩৯%। কৃশকায়তার হার, জাতীয় হারের (১৪%) তুলনায় কিছু কম হলেও বয়সের তুলনায় কম ওজনের হার, জাতীয় হার (৩২%) এর তুলনায় ৭% বেশী রয়েছে। শিশুদের খাওয়ানোর পূর্বে তাদের সেবাদানকারীদের মধ্যে মাত্র ১% সেবাদানকারী হাত ধোয় এবং মাত্র ২% সেবাদানকারীরা শিশুদেরকে হাত ধোয়ায়। স্বাস্থ্যবিধি এখানে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

কৃষিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে পুষ্টি পরিক্রমায় বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত

গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ও পুষ্টির সংযোগ, বিশেষ করে কৃষিতে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা (বৈষম্য সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ) পাওয়া যায়। ল্যানসা (LANSA)[১৬১]-এর সাম্প্রতিক গবেষণার মাধ্যমে ছয় ধরণের কৃষি ও পুষ্টি পরিক্রমা পাওয়া যায়: (ক) খাদ্যের উৎস হিসেবে কৃষি; (খ) আয়ের উৎস হিসেবে কৃষি; গ) কৃষি-নীতি ও খাদ্য-মূল্য; ঘ) মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা; ঙ) মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং শিশুর যত্ন; এবং চ) মহিলাদের শক্তি ব্যয় ও কৃষি-কাজ সংশ্লিষ্ট রোগ। মানুষের জীবিকার উৎস হিসেবে কৃষির ভূমিকা এবং গৃহ পর্যায়ে কৃষি ও পুষ্টির যোগাযোগ স্থাপনে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব চিহ্নিত হয়েছে। কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষক পরিবারের কৃষি আয়ের ব্যবহার, পরিবারের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খরচের ব্যবহারে কৃষিতে নিয়োজিত মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রভাব, সম্পদের অভ্যন্তরীণ বণ্টন, শিশুদের যত্নের রীতি এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য, খাদ্য বৈচিত্র্য এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে তেমনিভাবে আসেনি, যা খাদ্য গ্রহণ এবং বৃহত্তর পরিসরে পুষ্টির মূল আওতাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

শিশুদের তীব্র অপুষ্টির ধীরগতিতে উন্নতি

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর সার্বিক তীব্র অপুষ্টির হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৪.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০% হয়েছে। একই সময়ে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির হার ৩.১% থেকে হ্রাস পেয়ে ২% এ নেমে এসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এসএফএসএন রিপোর্ট-২০১৫ এর জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, সম্পদের স্তরসমূহ বিবেচনা করলে সবথেকে দরিদ্রদের মধ্যে ১৫% শিশু এবং সবথেকে ধনীদের মধ্যে ৬% শিশু তীব্র অপুষ্টিতে (<-২ এসডি) ভুগছে[১৬৯]। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০% শিশু সার্বিক তীব্র-অপুষ্টি, ৮% শিশু মধ্যম তীব্র-অপুষ্টি এবং ২% শিশু মারাত্মক তীব্র-অপুষ্টিতে ভুগছে। তীব্র-অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর হার অঞ্চল-ভেদে কম বা বেশী হয়। রাজশাহী বিভাগে এই হার সবথেকে বেশী (১৬%), অন্যদিকে সবথেকে কম চট্টগ্রাম বিভাগে (৮%)। এছাড়া শহরের শিশুদের এই হার (৯%)-এর তুলনায় গ্রামের শিশুদের এই হার (১১%) কিছুটা বেশী। শিশু কৃশকায়তা (wasting)-এর স্বল্পস্থায়ী প্রকৃতি অনুযায়ী বছরের পর বছর শিশুরা এই অপুষ্টি থেকে বেরিয়ে আসছে এবং আবার এই অপুষ্টিতে জড়িয়ে পড়ছে। অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী স্বাস্থ্য-সেবা প্রতিষ্ঠানে মারাত্মক তীব্র-অপুষ্টিতে ভোগা শিশু এবং অতিরিক্ত

রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে জাতীয় পুষ্টি সেবার আওতায় কমিউনিটি পর্যায়ে মধ্যম তীব্র-অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করা হচ্ছে, যেখানে তীব্র-অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সনাক্তকরণ এবং চিহ্নিতকরণ, রেফারেল এবং চিকিৎসা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, খাদ্য ঘাটতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে যেসব তীব্র-অপুষ্টি সংঘটিত হয়, তা সফলতার সাথে মোকাবেলার ফলে বাংলাদেশের কমিউনিটি পর্যায়ে তীব্র-অপুষ্টি খুব একটা দেখা যায় না।

প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সেবার পরিধি (এএনসি) বৃদ্ধি

গর্ভকালীন সময়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকাদের দ্বারা সেবা নেয়া এবং গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলারা উল্লেখযোগ্য সুবিধা পেয়ে থাকেন। যে সকল মহিলা প্রথম তিন মাসে (ট্রাইমেস্টার) গর্ভকালীন সেবা গ্রহণ করে, তাদের তুলনায় যারা সেবা গ্রহণ করেননি, তাঁদের গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেশী থাকে। এই সূচক গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার সেবা গ্রহণকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য[১৬২]।

মহিলাদের এএনসি সেবা গ্রহণের হার ২০০৭ সন থেকে ২০১৪ সনে বৃদ্ধি পেলেও, ২০১৫ সনে তা হ্রাস পেয়েছে (২৯%)। এফএসএনএস-২০১৪ এর রিপোর্ট অনুযায়ী দুই-পঞ্চমাংশ (৪৩%) এর বেশী সংখ্যক মহিলারা এই সেবা গর্ভকালীন সময়ে চারবার গ্রহণ করলেও এসএফএসএন-রিপোর্ট ২০১৫ অনুযায়ী ২৯% মহিলারা এ সেবা গ্রহণ করেছে। ইউইএসডি ২০১৬ রিপোর্ট অনুযায়ী এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩২% হয়েছে। ইউইএসডি ২০১৬ রিপোর্ট এর জরিপের ফলাফল অনুযায়ী গর্ভকালীন সময়ে ৭৯.৬% মহিলারা কমপক্ষে ১ বার সেবা গ্রহণ করে। বিভাগ এবং অঞ্চলভেদে এই হারের পার্থক্য রয়েছে, যা এসএফএসএন-২০১৫ রিপোর্ট এর জরিপের ফলাফল অনুযায়ী পাওয়া যায়। এই হার সবথেকে বেশী রাজশাহী (৪৭%) ও রংপুর বিভাগে (৪৩%), সবথেকে কম চট্টগ্রাম (১১%) এবং সিলেট বিভাগে (১৮%)। শহর ও গ্রামের এএনসি কভারেজের পার্থক্য বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রামের মহিলাদের তুলনায় শহরের মহিলাদের এই কভারেজ বেশী, শহরের গর্ভবতী মহিলারা ৪ বার বা ততোধিক বার এই সেবা গ্রহণ করে যা গ্রামের মহিলাদের তুলনায় দেড়গুণ[১৬৯] (এসএফএসএন রিপোর্ট ২০১৫ এর জরিপের ফলাফলে)। এছাড়া বিডিএইচএস এর তথ্য অনুযায়ী ২০১১ সনে ২৫.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সনে ৩২.১% গর্ভবতী মহিলারা কমপক্ষে ৪ বার গর্ভকালীন সেবা গ্রহণ করেছে। গর্ভবতী মহিলাদের এএনসি সেবা গ্রহণের হার আরও বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি এর মানও বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে[১৬৩]। বিশেষ করে নিরাপদ মাতৃত্ব এবং নবজাতকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে প্রসব-পরবর্তী সেবা এবং গর্ভকালীন জটিলতা চিহ্নিত করতে চেক-আপ এর উপর জোর দেয়া উচিত; মহিলারা যেন পরামর্শ পায়, কিভাবে তাঁরা নিজেদের এবং নবজাতকের যত্ন নিতে পারে।

৬.১.২. নীতি গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পরবর্তী করণীয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ১০-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ৩৭৫.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ২৪৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-১০ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ৬৫.৮৩% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ১.৩৮%। তিনটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ১০ গঠিত, যাতে ৭টি চলমান,২৫টি বাস্তবায়িত এবং ৭টি প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ১০.১-এর অর্থসংস্থান ২১৬.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পে অর্থসংস্থান রয়েছে ৮০.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উপ-কর্মসূচি ১০.১-এ ২০টি বাস্তবায়িত, ৬টি চলমান এবং ৫টি প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ১০.২-এর অর্থসংস্থান হয় ৮.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। উপ-কর্মসূচি ১০.২-এ ৪টি বাস্তবায়িত প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ১০.৩-এর চলমান/সমাপ্ত বা প্রক্রিয়াধীন কোন প্রকল্প নেই। ২০১৬-১৭ সালে কর্মসূচি ১০-এর মোট বাজেট ব্যয় ১৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ ২৬ সালের ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় অনেকগুন বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ১০-এর আওতায় মোট ১৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৬৭%। কর্মসূচি ১০-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে

সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ১৮.৫৩% ও ৮১.৪৭%। অপরদিকে, চলমান প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৪০.১২% ও ৫৯.৮৮%। এ ধারা কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টি কর্মসূচি এবং সেবা কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্ব হ্রাস এবং সরকারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

কর্মসূচি ১০ এবং উপ-কর্মসূচি ১০.২ তে অণুপুষ্টির অবস্থা উন্নত করতে বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা আছে। অণুপুষ্টির অভাব প্রতিকার এবং নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশলে অবহেলিত জনগণ, বিশেষ করে অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু, স্কুলে যাওয়া শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং দুগ্ধ-দাত্রী মহিলাদের অণুপুষ্টির অভাব দূরীকরণ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগের বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কৌশলের সম্ভাব্যতা ত্বরান্বিতকরণ

দরিদ্র মানুষের খাদ্য অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ করতে এবং প্রধান (staple) খাদ্যের পুষ্টি মান বাড়াতে 'জৈব-প্রক্রিয়ায় অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধকরণ (Bio-fortification)' কর্মসূচি একটি কার্যকর ও ব্যয় সাশ্রয়ী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। বোরো মৌসুমে জিংক-সমৃদ্ধ ব্রি-ধান ৬২ এবং ব্রি-ধান ৬৪ নামক ধানসমূহের জাত উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলাফল ইতোমধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। এছাড়া, মিষ্টি আলুর কমলা-সুন্দরী জাত উন্নয়ন, বীজ মাল্টিপ্লিকেশন এবং গর্ভবতী মায়েদের উদ্দেশ্য করে চারা রোপণের জন্য ভাউচার প্রদান, স্বাস্থ্য ও কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি পরামর্শ প্রদান করার কাজ কৃষকের মাঠ স্কুল (farmers field school)-এর মাধ্যমে সম্পাদন করে পথ্য-উন্নয়ন এবং পুষ্টি ও আয় বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ২০১৮ সালের মধ্যে ১৪ লাখ বাংলাদেশী কৃষককে 'জিংক সমৃদ্ধ ধান' উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৫৮টি জেলায় জিংক সমৃদ্ধ ধান বা চালের লভ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার উপর প্রচারণামূলক কার্যক্রম চলছে[১৬৪]। এছাড়া ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ চাল বা 'গোল্ডেন রাইস' বিষয়ে গবেষণা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

খাদ্যে অণুপুষ্টির মূল্যায়ন অনুযায়ী অণুপুষ্টি সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির ব্যাপ্তি চাহিদার তুলনায় কম[১৬৫]। বাংলাদেশে বর্তমানে শিশু ও মহিলাদের চাহিদার তুলনায় বিভিন্ন অণুপুষ্টি যেমন: আয়রন, জিংক, ফোলেট, ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন বি-১২ গ্রহণের হার কম। অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল এবং ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ তেল পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে, কারণ এসকল খাদ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সবাই খায়। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বাংলাদেশের মানুষের জন্য চাল ও তেলকে পুষ্টি সমৃদ্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে[১৭০]। খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কৌশলকে বৃহত্তর শিল্প এবং বাজার পরিস্থিতির পরিপূরক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং সমৃদ্ধকরণের মাত্রা বাজার মূল্য, কারিগরি এবং সেন্সরি প্যারামিটার এর উপর নির্ভর করে।

পুষ্টি উন্নতিকরণের আন্দোলন (SUN Movement) এর বৈশ্বিক কৌশল প্রণয়নে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ বৈশ্বিক পুষ্টি উন্নতিকরণের আন্দোলন (SUN movement) কার্যক্রমে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশে এই আন্দোলন দেশীয় নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে, যা দেশের চলমান নীতি ও কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই আন্দোলন সান গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক, সান সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক[১৬৬], উন্নয়ন সহযোগীদের নেটওয়ার্ক এবং জাতিসংঘের রিচ (UN-REACH)[১৬৭] এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে SUN এর বৈশ্বিক কৌশল (২০১৬-২০২০) চূড়ান্ত করা হয়েছে। সান এর বৈশ্বিক কৌশল চূড়ান্তকরণে বাংলাদেশের সান মুভমেন্ট কাজ করেছে। SUN প্রক্রিয়ায় সমন্বিত পুষ্টি নির্দেশনা ও পরিবীক্ষণ শক্তিশালীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য জবাবদিহিতাও অন্যতম নিয়ামক। সান মুভমেন্ট একটি সাধারণ ফলাফল এবং জবাবদিহিমূলক ভিত্তির উপর কাজ করছে, যা রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়েছে, যাতে করে ২০২০ সালের ফলাফলে সকল অংশীদারদের পারস্পরিক জবাবদিহিতা থাকে এবং সকলেই সান রোড ম্যাপ (SUN Road Map) অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের মধ্যে পুষ্টি সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হয়।

কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণসহ সংবেদনশীল পুষ্টি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

প্রত্যক্ষ পুষ্টি কর্মসূচির পাশাপাশি সংবেদনশীল পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সার্বিকভাবে অপুষ্টি দূর করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বহুখাত-ভিত্তিক কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও কার্যক্রম বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সমন্বিত পুষ্টি টার্গেট বাস্তবায়ন করে অপুষ্টি দূর করা সম্ভব। চাল, আলু ও অন্যান্য সবজি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার লক্ষ্যে কৃষক ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়াস চালাচ্ছে। কিছু কিছু অঞ্চলে দুধের চাহিদা পূরণে দুগ্ধ উৎপাদনকারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহ পুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত কর্মসূচি যেমন গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নের জন্য আদিবাসী মৎস্য প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং গ্রামীণ মহিলা, বিশেষ করে যারা কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত কাজে জড়িত যেমন: পশুপালন থেকে গৃহস্থালির কাজে সম্পৃক্ত, তাঁদের পুষ্টি উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম:

- **ঢাকা শহরের বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণের উপর জোরদারকরণ**

  ঢাকা শহরের বস্তির শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে প্রয়োজন সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ঢাকা শহরের বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের খর্বতার হার কমানোর জন্য স্বাস্থ্য ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার পুষ্টি কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে অপুষ্টির হার দূর করা সম্ভব হবে। পুষ্টির প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি এবং সঠিকভাবে স্যানিটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- **দেশব্যাপী দুগ্ধপোষ্য ও কম বয়সী শিশু-খাদ্যের কর্মসূচি (IYCF Programmes) প্রচার বৃদ্ধিকরণ**

  শিশু-খাদ্য খাওয়ানো কর্মসূচিতে শিশুর জন্মের প্রথম ১৮০ দিনে শুধুমাত্র মায়ের দুগ্ধ খাওয়ানো, ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুগ্ধ দেয়া অব্যাহত রাখা এবং ১৮১ তম দিন থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুকে পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে জোর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দেশব্যাপী শিশু-খাদ্য খাওয়ানোর প্রচারণামূলক কার্যক্রম নেয়া উচিত, যার ফলে শিশুদের পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণের হার বৃদ্ধি পায়।

- **মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতে পুষ্টি সংবেদনশীল কৌশল সম্প্রসারণ, বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়ন জোরদারকরণ**

  বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, জনপ্রতি মাছ গ্রহণের পরিমাণগত ও গুণগত হার স্বল্প আয়ের থেকে অধিক আয়ের মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য ব্যয়ের মধ্যে মাছের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সবথেকে দরিদ্র স্তরের জনগণ সবথেকে ধনী স্তরের তুলনায় ৩৯% কম মাছ গ্রহণ করে এবং সবথেকে দরিদ্র ভোক্তা ধনীদের তুলনায় কম মূল্যের মাছ ক্রয় করে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের পুষ্টি ও জীবনযাত্রা উন্নত করার লক্ষ্যে মৎস্য প্রজাতির জীব বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পুষ্টির মূলধারায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন প্রয়োজন। এই পুষ্টি-সংবেদনশীল কৌশলে সাফল্যের জন্য মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো অত্যাবশ্যক।

- **সেবা-দানকারীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সহযোগিতা প্রদান**

  বৈচিত্র্যময় খাদ্য, রন্ধন প্রণালী, স্বাস্থ্য বিধি, শিশুদের খাদ্য এবং যত্ন প্রদান বিষয়ে কার্যকর যোগাযোগ এবং অব্যাহত তথ্য সহযোগিতা, বিভিন্ন পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রমের সম্পূর্ণ পরিধি; যেমন, আইওয়াইসিএফম(IYCF) কাউন্সেলিং, অণুপুষ্টি সম্পূরক, পুষ্টি বাছাই এবং তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমের গুণগতমান এবং এর আওতায় বিদ্যমান প্রচারের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কিশোরীদের পুষ্টি এবং বাল্যবিবাহের কারণে অল্প বয়সের মেয়েদের গর্ভধারণ বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে।

- **খাদ্যে পুষ্টি-সমৃদ্ধকরণের উদ্যোগ জোরদারকরণ**

  সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মাধ্যমে চালে পুষ্টি-সমৃদ্ধকরণ (fortification) কর্মসূচির সম্ভাব্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সমৃদ্ধ-কৃত চালের বণ্টন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। বাজার থেকে প্রাপ্ত সমৃদ্ধ-কৃত চাল দরিদ্র লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য ভর্তুকি প্রদান করা উচিৎ। বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল বিতরণ যাচাই (trial) করে আরও ব্যবহার উপযোগী জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।

- **পুষ্টি বিষয়ক এক দশকের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ**

  সবার জন্য উন্নত পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য টেকসই পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে সব ধরণের অপুষ্টি দূর করতে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পুষ্টিহীনতার বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে এই সম্মেলনের ফলাফলকে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণে অঙ্গীকার করেছে[১৬৮]। পুষ্টির ফলাফল উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতকে আরও সমন্বিতভাবে কাজ করা উচিত। জাতিসংঘের ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে মিল রেখে 'ক্ষুধা থেকে মুক্ত, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং পুষ্টিতে উন্নতি' করার জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন এর কাজের কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন) অনুযায়ী দেশের কৌশল, নীতি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সদস্য দেশের পরামর্শে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ রোম ঘোষণা (Rome Declaration) এবং কাজের কাঠামো অনুমোদন করে এবং ২০১৬ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দশককে পুষ্টি বিষয়ক দশক হিসাবে ঘোষণা করে।

- **দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনের ঘোষণা এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ**

  দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন (ICN-২) ২০১৪ সনের নভেম্বর মাসে রোমে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী ৬০টি সুপারিশমালা রয়েছে। এই ৬০টি সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অগ্রগতি মনিটরিং করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যার মাধ্যমে জানা যাবে টেকসইভাবে পুষ্টিহীনতা দূর করতে বাংলাদেশ কি অবস্থানে রয়েছে। এই সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী টেকসইভাবে পুষ্টিহীনতা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে এবং পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে খাদ্য-ভিত্তিক পুষ্টি প্রচার ও প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। কৃষি সম্প্রসারণ ও ফলিত পুষ্টি গবেষণা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সঙ্গতিপূর্ণ নীতি ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত যেন অপুষ্টি দূরীকরণে খাদ্য-ভিত্তিক কৌশল ভবিষ্যতে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে বহুখাত-ভিত্তিক কৌশলের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার খসড়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

- **খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিসমূহের সংকলন ও হালনাগাদকরণ**

  খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নে সাম্প্রতিককালে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদে বহুখাত-ভিত্তিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণে কৃষি, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন এবং বাণিজ্যের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া জরুরী। বিশেষ করে নীতির সংখ্যা, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবীক্ষণ কাঠামো, উদ্যোগ এবং সহযোগী ও অংশীদারদের কারণে বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করেছে। ২০১৫ সাল পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের সাথে মিল রেখে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন খাতের নীতিমালা যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যমান নীতিসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৬.২. কর্মসূচি ১১ - তথ্য উপাত্তের ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি

কর্মসূচি ১১-এ জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার পুষ্টি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ শক্তিশালী করতে হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার কার্যপরিধি-৩.১ এর সাথে এই কর্মসূচি সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূল্যায়ন-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা পরিবীক্ষণের জন্য কিছু সূচক বা মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে উক্ত নির্দেশকসমূহের উপর কোন ভিত্তি বছরের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। 'জাতীয়/আঞ্চলিক (sub-national) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জরিপ' এবং 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' থেকে প্রাপ্ত বাস্তবভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট সূচকসমূহের কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ডের সাথে হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত ও ভিত্তি বছরের তথ্য-উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি অবস্থার গতিধারা নির্ণয় করা হয়। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য স্বীকৃত পদ্ধতি (methodology) ও নির্ণায়ক ব্যবহার এবং সূচক ও আনুষঙ্গিক হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে খাদ্য ও পুষ্টি-নীতি পরিবীক্ষণ করা হয়।

৬.২.১. কর্মসূচি ১১-এর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার কর্মসূচি ১১-এ বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন: খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের জাতীয় সারণী হালনাগাদকরণ, গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের বাস্তবায়ন, খাদ্য গ্রহণ ও মূল্যায়ন উপাত্তের ব্যবহার, খাদ্য বৈচিত্র্য নির্ণয়ের পদ্ধতির অনুমোদন, পুষ্টি জরিপের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এই কর্মসূচির অগ্রগতি সারণী-২৭ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী – ২৭ : সিআইপি কর্মসূচি ১১-এর অর্জনের অগ্রগতি

সিআইপি/কর্মপরিকল্পনার আউটপুট প্রক্সি নির্দেশকসমূহ	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	উৎস
আচরণগত পরিবর্তন-বার্তা (BCC)-এর জন্য গণমাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের সংখ্যা	-	-	১,০০০+	১,০০০+	১,০০০+	স্বাস্থ্য বুলেটিন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অন্যান্য খাত
নিরূপিত, বাস্তবায়িত এবং হালনাগাদকৃত কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণের রীতি	বারটান/ এফপিএমইউ/ ডিজিএইচএস	বিআইডিএস আইএনএফএস ডব্লিউএফপি	জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা বাংলায় অনুমোদিত	জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকার Launching সম্পন্ন এবং এর বিতরণমূলক কার্যক্রম চলমান	জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকার এর বিতরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত	বারডেম এফপিএমইউ এনএফপিসিএসপি-এফএও
খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের সারণী বাস্তবায়িত/ হালনাগাদকৃত	খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের সারণীর হালনাগাদকরণ এর কাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে চলমান	এফপিএমইউ ও এফএও-এর সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্থানীয় খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের সারণীর কাজ সম্পন্ন	বারটান কর্তৃক খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের সারণী এর বাংলায় অনুবাদ এবং তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ মডিউলে এই সারণীর অন্তর্ভুক্তি	বারটান কর্তৃক বাংলায় অনুবাদকৃত খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের সারণী তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এর মডিউলে এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান	বারটান কর্তৃক খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের সারণী তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এর মডিউলে এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান	আইএনএফএস /কারস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এফপিএমইউ/ এনএফপিসিএসপি-এফএও/ ইন ফুডস
বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক ডাটাবেজ/ সার্ভিলেন্স প্রক্রিয়া স্থাপিত/ উন্নীত	-	বিডিএইচএস	এনএফপিসিএসপি এনআইপিইউ এনআইএস	এফপিএমইউ এর অনলাইন ডাটাবেস হালনাগাদ	এফপিএমইউ এর অনলাইন ডাটাবেস হালনাগাদ অব্যাহত	এফপিএমইউ

বিভিন্ন আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ কার্যক্রমে স্থিতাবস্থা

পুষ্টি সংক্রান্ত আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ বা বিসিসি (Behaviour Change Communication) কার্যক্রম পুষ্টি তথ্য, জ্ঞান, মনোভাব এবং বাস্তবক্ষেত্রে জ্ঞানের ব্যবহারের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা হ্রাস করতে সাহায্য করে। বিসিসি কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা জনগণকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে সাহায্য করে। সারণী-২৭ এ বিসিসি কার্যক্রমের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে উৎসাহব্যঞ্জক ধারা দেখা যায়; ২০০৯-১০ অর্থবছরে যেখানে এই সংখ্যা ছিল ৬৩৫, তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০০০ এর অধিক হয়েছ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত বিসিসি যোগাযোগ কার্যক্রম অব্যাহত/চলমান থাকায় ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও এই সংখ্যা ১০০০ এর অধিক ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম (এইচপিএনএসডিপি)[১৭০] এর তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (আইইসি অপারেশনাল প্ল্যান) অনুযায়ী হালনাগাদকৃত পুষ্টি মডিউল মাঠ পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছে। মুঠো ফোনের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণের জন্য যে পুষ্টি-বার্তাসমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে, তা পর্যালোচনা করে উন্নত করা হয়েছে । পুষ্টি কর্মসূচি প্রচারের জন্য বাংলাদেশ বেতারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৬টি হাস্যরসাত্মক গল্প মুদ্রিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পুষ্টি সম্পর্কিত সামগ্রী, যেমন- ফ্লিপ চার্ট, পঞ্জিকা (ক্যালেন্ডার), ফুড প্লেট, উপকরণ তালিকা এবং পুষ্টি সম্প্রসারণ সামগ্রী, মুখ্য পুষ্টি-বার্তা ও জন্মের প্রথম ১০০০ দিন সংশ্লিষ্ট সামগ্রী এবং বয়স্কদের পুষ্টি বিষয়ক সামগ্রী ব্যবহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে।

আচরণ পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য বার্তা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি সেবার অন্যতম অংশ। দুইটি কৌশলের মাধ্যমে এটিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়: ১) জাতীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নয়ন কৌশল; এবং ২) পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে জাতীয় যোগাযোগ (communication) কৌশল[১৭১]। এই কৌশলগুলোর লক্ষ্য হল বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন আনয়ন করা। এই কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে দুটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে; ১) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রচার; এবং ২) পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ স্থাপন[১৭২]।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বারটান, বিএআরসি, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বিসিসি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দক্ষিণাঞ্চলের নির্বাচিত কয়েকটি জেলায় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষকদের মাঠ পর্যায়ের স্কুলের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিশুর প্রথম ১০০০ দিনের বিষয়সহ সমন্বিত পুষ্টি বার্তা প্রদান শুরু করেছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিসিসি নেটওয়ার্ক দেশব্যাপী নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য উপজেলা ঘোষণা এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার দুটি উপজেলায় আইইসি সামগ্রী ব্যবহার করে গৃহ-পর্যায়ে খাদ্য প্রস্তুতকারী (মহিলা) এবং স্কুলগামী শিশুদের উদ্দেশ্য করে পরিচালিত কার্যক্রম পাইলট ভিত্তিতে পরিচালনা। এই কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নে দেখা যায় যে, নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস সম্পৃক্ত জ্ঞান ও সচেতনতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিসি কার্যক্রমের ম্যাপিং এবং গণমাধ্যমে বিসিসি কার্যক্রম প্রচারের কার্যকারিতা নির্ণয়ের জন্য নিয়মানুগ (systematic) গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে[১৭৩]। বাংলাদেশে 'এ্যালাইভ এন্ড থ্রাইভ' শীর্ষক প্রকল্পের মূল্যায়নে দেখা যায়, গণমাধ্যমে প্রচারের ফলে শিশুদের শুধুমাত্র বুকের দুগ্ধ খাওয়ানোর হার ভিত্তি বছরের ৫০% থেকে বেড়ে ৬১% হয়েছে; গণমাধ্যমে প্রচারের সাথে সাথে সম্মুখ সারীর (ফ্রন্ট-লাইন) কর্মীদের কার্যক্রম যুক্ত করার ফলে বুকের দুগ্ধ খাওয়ানোর এই হার বেড়ে ৮৩% হয়েছে[১৭৪]।

শিশুদের জন্য উন্নত খাদ্য রেসিপি

শিশুর উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ তাদের দেহের বৃদ্ধি ও উন্নতি তথা পুষ্টি উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন (বিবিএফ) এর উন্নত অনুশীলন পরীক্ষা (Trial and Improved Practices বা TIPS) পদ্ধতির মাধ্যমে ৩৫ টি উন্নত পরিপূরক খাবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। যে সকল বিষয়ে এই উন্নত রেসিপির প্রণয়ন বিবেচনা করা হয়েছে, তা

হলোঃ খাদ্য গ্রুপের সংখ্যা (৭টির মধ্যে কমপক্ষে ৪টি)[১৭৫], খাদ্য-শক্তি ও পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ, আমিষের পরিমাণ ও গুণাগুণ, প্রাকৃতিক উৎসে আয়রনের প্রাপ্যতা, সঙ্গতি, সম্ভাব্যতা যাচাই, ঋতু, স্থানীয় খাদ্যের ব্যবহার এবং জীব বৈচিত্র্য। এই রেসিপিসমূহের পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য নতুনভাবে প্রণীত খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের সারণী ব্যবহার করা হয়েছে।

এসএফএনএস রিপোর্ট ২০১৫ অনুযায়ী ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের হার ৩৭%। সম্পদের স্তর বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সবথেকে ধনীদের ঘরে মাত্র ৫৮% শিশু ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করছে (চারের অধিক ধরণের খাদ্য) এবং সবথেকে গরীব ঘরের মাত্র ২৩ % শিশু ঐ প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করছে (লেখচিত্র-৩১)।

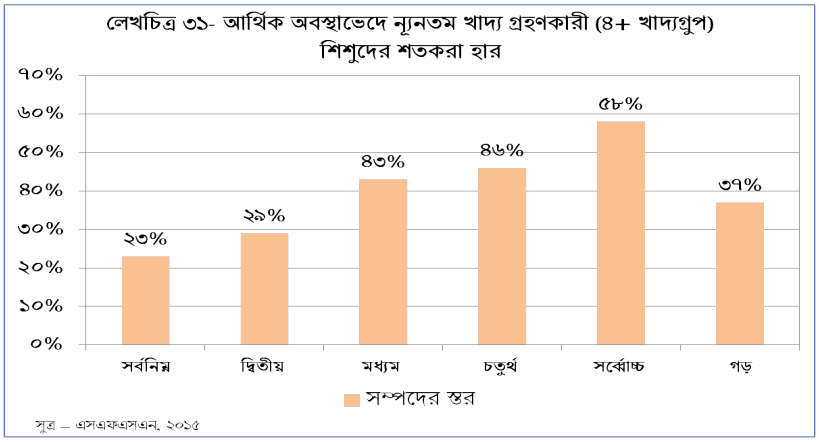

শিশুর উন্নত পুষ্টির জন্য কৃষিতে পুষ্টি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিকরণ

খাদ্য ও পুষ্টি নীতি কাঠামোর অন্যতম কৌশল হল শিশু খাদ্য (IYCF) গ্রহণে সুরক্ষা, প্রবর্ধন এবং সমর্থন প্রদান। পরিবারের ও শিশুদের খাবারে বৈচিত্র্য জোরদার করাসহ খাদ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে খাদ্য গ্রহণের সুপারিশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বাস্তবায়নকারী অন্যান্য সংস্থার কৃষি কার্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষা ও শিশু খাদ্যের বিসিসি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পুষ্টি সম্পর্কিত ফলাফল (outcome) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের কার্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ এবং শিশুদের বৃদ্ধিতে ফলপ্রসূ হয়।

এক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক তথ্য হল, বিবিএফ, বারটান, ডিএই, ডিএলএস, ডিওএফ এবং এফটিএফ (FtF) এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচিত পুষ্টি সমৃদ্ধ পরিপূরক খাদ্যের রেসিপি মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের এফটিএফ অঞ্চলে স্থানীয় কৃষি ও স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় বাস্তবায়িত সমন্বিত পুষ্টি কর্মসূচির প্রারম্ভিক (বেস-লাইন) ও সমাপনী জরিপের (২০১১-২০১৫) তুলনামূলক মূল্যায়নে (ইফপ্রি কর্তৃক সম্পাদিত) পরিপূরক খাদ্য গ্রহণে উন্নতি দেখা যায়। ঐ অঞ্চলে ২০১১ সালের প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী ১২.৭% শিশু ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করলেও ২০১৫ সালে (সমাপনী জরিপ অনুযায়ী) তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৮% হয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যায় যে, অন্যান্যের মধ্যে মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মীরা কৃষকদের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যালয়ে নারী কৃষি নেত্রী ও সমাজের (ফিল্ড স্কুলের) স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে কমিউনিটি-ভিত্তিক পুষ্টি শিক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে[১৭৬]।

জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার প্রচার অব্যাহত

খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নীতি বিষয়ক কার্যক্রমের (policy inform) উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পূর্ববর্তী বছরের সুপারিশসমূহ অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, বারডেম ও খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা পুনঃ-যাচাই করে বাংলায় অনুবাদসহ 'জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা' হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি বহুখাত-ভিত্তিক কমিটি এই নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং অনুবাদ করেছে; পুরো কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় ১বছর সময় লেগেছে। পুষ্টির উপর ১০ টি মূল তথ্য এই খাদ্য নির্দেশিকায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য খাতের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচার করা প্রয়োজন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক এই নির্দেশিকাটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। খাদ্য-শক্তি, মুখ্য ও গৌণ

অণুপুষ্টির প্রয়োজনীয়তা, খাদ্য (মেনু) পরিকল্পনা (diet planning), পুষ্টি গ্রহণ (nutrient intake)-এর নিয়মাত্বক (normative) নজরদারি এবং কাঙ্ক্ষিত খাদ্য গ্রহণের ধারণা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

খাদ্যে পুষ্টিমানের সারণীর ব্যবহার চলমান

খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুষ্টি, কৃষি এবং খাদ্য বিষয়ক নীতি এবং কর্মসূচি প্রণয়নে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নির্ধারণে খাদ্য উপাদান সারণী থেকে মূল তথ্য পাওয়া যায়। খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার ন্যায় হালনাগাদকৃত খাদ্য উপাদান সারণী থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নীতি বিষয়ক কার্যক্রমের উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই সারণীর ব্যবহার চলমান রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বারটান 'খাদ্য উপাদান সারণী' বাংলায় অনুবাদ করে 'সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' প্রকল্পের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে মডিউল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক তথ্য উপাত্তের বিস্তৃত উৎস

জাতীয় ও বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জরিপ এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা (সার্ভিলেন্স সিস্টেম) বিদ্যমান পুষ্টি সহায়ক নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে অবদান রাখে এবং অপুষ্টির অন্তর্নিহিত কারণসমূহ সমাধানে সচেষ্ট পুষ্টি-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সারণী - ৩০ : খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে নির্বাচিত জরিপ

জরিপ ও বছর	কভারেজ	সংগৃহীত উপাত্ত	অংশীদার
বিবিএস-পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬	জাতীয় জরিপ (৪৬০৭৬ পরিবার)	গৃহ পর্যায়ে আয়, ব্যয়, খাদ্য ও ক্যালোরি গ্রহণ, দারিদ্র্যের হার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা	বিবিএস
ইউইএসডি ২০১৬	জাতীয় জরিপ (১২০০০ পরিবার)	শুধুমাত্র মায়ের দুধ-পানকারী ৬ মাসের কম বয়সী শিশুর অনুপাত, আন্টিনেটাল কেয়ার, ন্যূনতম খাদ্য গ্রহণকারী ৬ থেকে২৩ মাসবয়সী শিশুদের শতকরা হার (%)	নিপোর্ট, *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,*
বাংলাদেশের শহরের শিশুদের অবস্থার জরিপ ২০১৬	জাতীয় জরিপ (বাংলাদেশের সকল শহর)	শিশু পুষ্টি অবস্থা, শিশু রোগ, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, নবাগত শিশু এবং মায়েদের স্বাস্থ্য, শিশু উন্নয়ন,শিশুদের অক্ষর জ্ঞান ও শিক্ষা এবং শিশুদের নিরাপত্তা (*protection)*	বিবিএস, ইউনিসেফ
এসএফএসএন-২০১৫	জাতীয় জরিপ (বছরে একবার, ৫,৮৫৬টি পরিবার)	খাদ্য-নিরাপত্তা ও পুষ্টি-৬৪ জেলার কৃষি পরিবেশগত অঞ্চলের তথ্য	এনএনএস,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এইচকেআই

এসব জরিপের ফলাফল দারিদ্র্য, জেন্ডার ও জরুরি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বুঝতে সাহায্য করে[১৭৭]। এগুলো কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন এবং পুনর্বাসনের চাহিদা সংক্রান্ত জ্ঞানের ঘাটতি (knowledge gap) পূরণ করে। দেশের কৃষির সাফল্যের উপর অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভর করে; তাই কৃষি পরিসংখ্যান সংহত, শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য ও সবার কাছে সহজলভ্য করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সক্রিয়ভাবে কাজ করছে[১৭৮]। প্রতিবেদন প্রণয়নকালীন খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সম্পর্কিত কিছু নির্বাচিত জরিপের তথ্য সারণী-৩০ এ দেয়া হয়েছে। তথ্য সারণী-৩০ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়নকালীন সময়ে 'বিবিএস-পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬', 'ইউইএসডি জরিপ ২০১৬', 'বাংলাদেশের শহরের শিশুদের অবস্থার জরিপ ২০১৬', এবং 'ষ্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি এন্ড নিউট্রিশন (এসএফএসএন)-২০১৫' এর তথ্যাদি পাওয়া যায়।

সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা স্তর বিন্যাস (IPC) এর জরিপের ফলাফল এবং সুপারিশ অনুসরণ[১৭৯]

সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা স্তর বিন্যাস (IPC)-এর সমর্থনে ব্যবহৃত জরিপসমূহ থেকে বাংলাদেশের ১০টি জেলার চলমান স্বল্পস্থায়ী/তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই জেলাসমূহের মধ্যে ৫ (পাঁচ) টি জেলা (বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, মাদারীপুর ও যশোর) লেভেল-২ তে রাখা হয়েছে, সেখানকার জনগণ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার কারণে চাপ বা stress এর মধ্যে পড়ে এবং অপর ৫ টি জেলা (বাগেরহাট, ঝালকাঠি,ভোলা, পিরোজপুর এবং সাতক্ষীরা) লেভেল-৩

(যেখানকার জনগণ খাদ্য নিরাপত্তা-হীনতার কারণে সংকট বা crisis এর মধ্যে পড়ে) এ রাখা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা-হীনতার লেভেল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খাদ্যের ব্যবহার (food utilization) এবং খাদ্য নিরাপত্তার অর্থনৈতিক প্রাপ্যতা (financial access) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অপরদিকে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা স্তর বিন্যাস (IPC)-এর সমর্থনে ব্যবহৃত জরিপসমূহ থেকে বাংলাদেশের ৭টি জেলার প্রক্ষেপণ (projected) স্বল্পস্থায়ী/তীব্র নিরাপত্তা-হীনতার অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই জেলা সমূহের মধ্যে ৩ (তিন) টি জেলা (পটুয়াখালী, পিরোজপুর এবং সাতক্ষীরা) লেভেল-২ তে রাখা হয়েছে, যেখানকার জনগণ খাদ্য নিরাপত্তা-হীনতার কারণে চাপ বা stress এর মধ্যে পড়বে এবং অপর ৪ টি জেলা (বাগেরহাট, বরগুনা, ঝালকাঠি এবং ভোলা) কে লেভেল-৩ (যেখানকার জনগণ খাদ্য নিরাপত্তা-হীনতার কারণে সংকট বা crisis এর মধ্যে পড়ে) এ রাখা হয়েছে। বরগুনা জেলা বর্তমান সময়ে লেভেল-২ তে থাকলেও প্রক্ষেপণ সময়ে লেভেল-৩ এ রাখা হয়েছে, অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা অবস্থার অবনতি হবে। অন্যদিকে ২ টি জেলা- পিরোজপুর এবং সাতক্ষিরা জেলা বর্তমানে লেভেল-২ তে থাকলেও খাদ্য নিরপত্তাহীনতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় লেভেল-২ তে রাখা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রক্ষেপণ (projected) লেভেল নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খাদ্যের ব্যবহার (food utilization) এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রাপ্যতা (financial access) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের তথ্য ব্যবস্থাপনা সংহত ও জোরদারকরণ

দেশে দুইটি স্বতন্ত্র এবং আন্তঃ-বিভাগ নির্ভরশীল তথ্যব্যবস্থা বিদ্যমান। খাদ্য মন্ত্রণালয় 'এফপিএমইউ অনলাইন ডাটাবেজ' এবং 'খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি তথ্য ব্যবস্থাপনা (FSNIS)' পদ্ধতি পরিচালনা করছে, অন্যদিকে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পুষ্টি তথ্য ব্যবস্থা (NIS) কার্যকর রয়েছে। পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ধারাবাহিক উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যাখ্যা (interpretation), বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার এবং পুষ্টি কর্মসূচির অগ্রগতি, ব্যাপ্তি (Coverage) এবং মূল্যায়ন করার জন্য স্বাস্থ্য খাতে নৈমিত্তিক পুষ্টি তথ্যের গুণগত উৎকর্ষ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের তথ্যাদি বা সূচক যেমন- শিশু অপুষ্টির মাত্রা, বিশেষ করে খর্বতা (stunting), স্বল্প ওজন, কৃশকায়তা (wasting); জন্মের সময় কম ওজন এবং মায়ের রক্ত স্বল্পতা; এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বাজেটের তথ্যাদিসহ খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টি দূরীকরণে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান রয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণায়ের এফপিএমইউ একটি তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে যার মধ্যে একটি বৃহত্তর তথ্য উপাত্ত সেটের জন্য উপাত্ত সংরক্ষণ এবং প্রয়োগ করে এফপিএমইউ থেকে দৈনিক ও পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এফপিএমইউ উইং-এর অনলাইন ডাটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এফপিএমইউ-এর একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার এবং ইলেকট্রনিক রিপোসিটরিও রয়েছে। এখানে ওয়েব নির্ভর তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা পরিধারণ করত: খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক খাদ্য নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্প এবং তাদের ফলাফল নির্ভর সূচকের জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে (কর্মসূচি ৭)।

৬.২.২. নীতি গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পরবর্তী করণীয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ১১-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ১১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে পুরোটাই বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-১১ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ১০০% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ০.৬৪%। তিনটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ১১ গঠিত, যাতে ১১টি বাস্তবায়িত, ৫টি চলমান এবং কোন প্রক্রিয়াধীন (pipeline) প্রকল্প নেই। উপ-কর্মসূচি ১১.১-এর অর্থসংস্থান ৮৭.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উপ-কর্মসূচি ১১.১-এ ১টি চলমান ও ২টি সমাপ্ত প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ১১.২-এর অর্থসংস্থান হয় ০.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উপ-কর্মসূচি ১১.২-এ ২টি বাস্তবায়িত প্রকল্প রয়েছে, তবে কোন চলমান ও প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প নেই। উপ-কর্মসূচি ১১.৩-এর অর্থসংস্থান ২৭.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । উপ-কর্মসূচি ১১.৩-এ ৭টি বাস্তবায়িত এবং ৪টি চলমান প্রকল্প রয়েছে ও কোন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প নেই। । ২০১৬-১৭ সালে কর্মসূচি ১১-এর মোট বাজেট

৩৬.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ব্যয় ২৩.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ১১-এর আওতায় মোট ৩৭.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৩২.৪০%। কর্মসূচি ১১-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ১৪.৪৫% ও ৮৫.৫৫%। অপরদিকে, চলমান প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ১৭.৪৪% ও ৮২.৫৬%। এ ধারা তথ্য উপাত্তের ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

বৈশ্বিক পুষ্টি পরিস্থিতি রিপোর্ট ২০১৬: বাংলাদেশের অবস্থান

বৈশ্বিক পুষ্টি প্রতিবেদন ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে খর্বতার হার (খর্বতার সবথেকে কম হার থেকে বেশী হারের হিসেবে) ১৩২ টি দেশের মধ্যে ১০৭তম, কৃশকায়তার হার ১৩০টি দেশের মধ্যে ১১৭তম, মেয়েদের রক্তশূন্যতার (এনিমিয়ার) হার ১৮৫ টি দেশের মধ্যে ১৫৮তম। 'শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পানকারী' শিশুদের হার (সবথেকে বেশী হার থেকে সবথেকে কম হারের হিসেবে) ১৪১ দেশের মধ্যে ২৯তম। অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুর ওজনাধিক্যের হার (সবথেকে কম হার থেকে বেশী হারের হিসেবে) ১২৬ টি দেশের মধ্যে ৫ম। অর্থাৎ, বৈশ্বিক পুষ্টি প্রতিবেদন ২০১৬ অনুযায়ী, খর্বতার, কৃশতা এবং মেয়েদের এনিমিয়ার হারের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। অন্যদিকে শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুদের হার এবং অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুর ওজনাধিক্যের হার বৈশ্বিক পুষ্টি পরিস্থিতির তুলনায় সন্তোষজনক। যদিও বৈশ্বিক পুষ্টি প্রতিবেদন ২০১৬ অনুযায়ী, শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পানকারীর শিশুদের হার হ্রাস পেয়ে ৫৫% (সূত্র: বিডিএইচএস-২০১৪) এ এসে দাঁড়িয়েছে। খর্বতা, কৃশকায়তা এবং মেয়েদের এনিমিয়ার হারের অবস্থা সন্তোষজনক পর্যায়ে আনতে হলে পুষ্টি সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা জরুরী।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এই পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গঠিত ৪টি সেক্টরাল কমিটি (যা জাতিসংঘ, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত) গঠন করা হয়। যার একটি কমিটি হল-সেক্টরাল কমিটি-২, যেখানে পরোক্ষ পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যেমন- খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং মহাপরিচালক, এফপিএমইউ এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সেক্টরাল কমিটি-১ মূলত: প্রত্যক্ষ পুষ্টি কর্মসূচি বিষয়ে এবং সেক্টরাল কমিটি-৩ সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে। সেক্টরাল কমিটি-৪ পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাজেট, মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করে। এই ৪টি সেক্টরাল কমিটির মাধ্যমে প্রণয়ণকৃত জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয়/আন্তঃ-সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কোর কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কোর কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ এই জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার খসড়ার উপরে কাজ করে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে। জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এফপিএমইউ এর সংশ্লিষ্ট শাখা কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

এই ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- **দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

  দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ প্রয়োজন।

- **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ে নতুন সেক্টরাল পরিকল্পনা HNPSIP (২০১৬-২০২১) বাস্তবায়ন**

  স্বাস্থ্য-খাতের ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচি যা 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক সেক্টরাল ইনভেস্টমেন্ট প্লান (২০১৬-২০২১)' এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুষ্টি বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মূলত: বিভিন্ন অপারেশনাল প্লান এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত এই সেক্টরাল পরিকল্পনাতে 'জাতীয় পুষ্টি সেবা' ছাড়াও অন্যান্য অপারেশনাল প্লান এ পুষ্টি বিষয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

- **বিসিসি-র ব্যবধান (gap) কমাতে কৌশল প্রতিষ্ঠাকরণ**

  বাংলাদেশ বিসিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে কার্যক্রম পরিকল্পনা ও যোগাযোগ কৌশল পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এইসব দলিলাদি সকল অংশীজনদের সমন্বয়ে প্রণীত হয়েছে। এগুলো পুষ্টি সংক্রান্ত দক্ষতা ও আচরণ পরিবর্তনে চলমান বিসিসি কার্যক্রমসমূহের মধ্যে মিল/অমিল, ব্যবধান, সুযোগ প্রভৃতি চিহ্নিত করত: উক্ত কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সহায়ক হয়েছে। সব অংশীজন এবং খাতের মধ্যে পুষ্টি-বার্তা প্রেরণ করার লক্ষ্যে চলমান কৌশলসমূহের উন্নতি করার জন্য বিসিসি কার্যক্রমকে সমন্বয় ও জোরদার করতে হবে। স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতের স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে 'প্রমিত আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ' এবং 'অপরিহার্য পুষ্টি' বিষয়ে প্রচারণামূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উদ্ভাবনী উপায় হিসেবে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে লক্ষ্য-কেন্দ্রিক (টার্গেটেড) এবং বিষয় ভিত্তিক (ফোকাস) যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য বিভিন্ন খাতের মাধ্যমে বিসিসি কার্যক্রম আরও কার্যকর করতে সেবাদানকারীদেরকে কারিগরি ও পুষ্টি সম্পর্কিত বার্তা বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। পুষ্টি বার্তা প্রচারে সামর্থ্য এবং প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমেরও প্রয়োজন রয়েছে।

- **খাদ্যের পুষ্টিমানের সারণী এবং খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ**

  প্রতিবেদনাধীন সময়ে পেশাজীবী ও প্রধান ব্যবহারকারীগণ (end users) পুষ্টিমান সারণী ও জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ব্যবহার করেছে। বিবিএস, বিআইডিএস, আইপিএইচএন, ব্র্যাক, এফপিএমইউ এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিমানের সারণী ব্যবহার বিশেষ করে খাদ্য গ্রহণের উপাত্ত (HIES) থেকে প্রাপ্ত পুষ্টিমানের বিশ্লেষণে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। নন-টেকনিক্যাল ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে খাদ্যের পুষ্টি উপাদান এবং পুষ্টিমান সহজে বোঝার জন্য পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট কর্তৃক এটিকে 'পুস্তিকা' আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। খাদ্যের পুষ্টিমানের সারণীর উপর একটি সফটওয়্যার তৈরি করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজেই পুষ্টিমান গণনা করতে পারে। বিভিন্ন খাতে খাদ্যের পুষ্টিমানের সারণী এবং খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ব্যবহারের ওপর পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- **খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থায় বিরাজমান বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন**

  নীতি নির্ধারণ এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য দুইটি প্রধান তথ্য ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং ব্যবহারকারীদের তথ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দুইটি তথ্য ব্যবস্থার পদ্ধতি ও সংজ্ঞা একই হওয়া প্রয়োজন, যার মাধ্যমে বিভিন্ন বছরের উৎসের মধ্যে তুলনা করা যায় এবং সঠিকভাবে সময়-ক্রমিক উপাত্ত (Time Series Data) আহরণ করা যায়। পুষ্টি উপাত্তের সঠিক ব্যবহারের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব অনেক। বিডিএইচএস এর মত বৃহত্তর পরিসরে বহু-বিষয় সমৃদ্ধ, জনসংখ্যা-ভিত্তিক এবং পর্যায়ক্রমিক (Periodic) পুষ্টি জরিপ নিয়মিত সম্পন্ন করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সরকার ভবিষ্যতের বিনিয়োগ এবং অপুষ্টি হ্রাসের ধারা টেকসই করাসহ অপুষ্টির প্রধান কারণও নির্ণয় করতে পারে।

- **পুষ্টির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং সমন্বয়ের উৎকর্ষ সাধন**

  সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে পুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান (core) অধিদপ্তরসমূহে উন্নত নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। পুষ্টি সংবেদনশীল এবং পুষ্টি সংশ্লিষ্ট উভয় কর্মসূচিতে কারিগরি এবং বাস্তবায়নকালীন নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন, যা কর্মসূচিকে নিয়মাবদ্ধ এবং শক্তিশালী করবে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা এবং সিআইপি-এর চলমান আন্তঃ-সংস্থা পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পুষ্টি প্রতিবেদন প্রকাশ প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখতে হবে।

৬.৩. কর্মসূচি ১২ – নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্যের গুণগত-মানের উৎকর্ষ সাধন

রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা কর্মসূচি ১২-তে নিরাপদ ও গুণগত-মান সম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিত করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় নজরদারি (surveillance)-এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য কার্যক্রম গুলো হলোঃ (১) খাদ্য-বাহিত রোগ সংক্রান্ত নজরদারির উৎকর্ষ সাধন; (২) খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে পরীক্ষাগার ও পরীক্ষা পদ্ধতির দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং (৩) আধুনিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা। এসব কার্যক্রম জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার ৩.৫ এবং ৩.৬ কার্যক্ষেত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে আভ্যন্তরীণ খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্যের আন্তর্জাতিক ব্যবসার জন্য নিরাপদ ও খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য নিরাপদ পানি এবং উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা যোগান দেয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

৬.৩.১. কর্মসূচি ১২-এর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

নিচের সারণী-৩১ এ বর্ণিত সূচকের মাধ্যমে কর্মসূচি ১২ এর অর্জনের অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণী - ৩১: সিআইপি কর্মসূচি ১২-এর অগ্রগতি

সিআইপি/কর্ম-পরিকল্পনার আউটপুট প্রক্সি নির্দেশকসমূহ	*২০০৭-২০০৮*	*২০০৯-২০১০*	*২০১৪-২০১৫*	*২০১৫-২০১৬*	*২০১৬-২০১৭*	*উৎস*
বিএসটিআই কর্তৃক বাধ্যতামূলক মানযুক্ত নির্ধারিত খাদ্যপণ্যের সংখ্যা	৫৮	৫৮*	৫৯	৫৯	৫৯	*বিএসটিআই এমওআই*
৫ বছরের কম বয়সী ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুর শতকরা হার (দুই সপ্তাহে)	১০% বিডিএইচএস	১৪% (এসএফএসএন-২০১০)	৯% এসএফএসএন	৮% এসএফএসএন	-	*বিডিএইচএস; এসএফএসএন*
গৃহ পর্যায়ে নিরাপদ পানি ব্যবহারকারীর অনুপাত	৯৭%	৯৮%	৯৯%	৯৯%	*৯৯%*	*ডিপিএইচই*
আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় নিরাপদ পানি ব্যবহারকারীর অনুপাত	-	৮৬%	৮৭%	৮৭%	*৮৮%*	*ডিপিএইচই*

* ২০০৯-১০ অর্থবছরে অত্যাবশ্যকীয় ৬৪টি পণ্যসমূহের মধ্যে ৫৮টি খাদ্যপণ্য এবং ৬ টি খাদ্য বহির্ভূত কৃষিপণ্য ছিল ।

খাদ্যের মানদন্ড নির্ণয়ে স্থিতাবস্থা বিরাজমান

ভোক্তার সুস্বাস্থ্য এবং খাদ্য ব্যবসায় সনদ (certification) এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য খাদ্য সামগ্রীর যথাযথ মানদন্ড (Standard) নির্ণয় করা প্রয়োজন। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে বাধ্যতামূলক মানযুক্ত খাদ্যসামগ্রীর সংখ্যা ৫৯-এ স্থির রয়েছে। এই সংখ্যা ২০০৭-০৮ অর্থবছর ৫৮ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬৪ তে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেখানে ৫৮টি খাদ্যপণ্য এবং ৬টি খাদ্য বহির্ভূত কৃষিপণ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সংখ্যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১টি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ হলেও ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা অপরিবর্তিত ছিল (সারণী-৩১)। জাতীয় মান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসটিআই এ যাবত সর্বমোট ৪০৩০টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে। তন্মোধ্যে ৬৩০টি খাদ্যপণ্যের ঐচ্ছিক মানদন্ডও রয়েছে[১৮০]। নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির জন্য আইন বলে গঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)-এর সার্বিক সহযোগিতা ও নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য পণ্য তৈরি ও পণ্যের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদানের আইনগত মান নির্ণয় করা হচ্ছে। তেল-জাতীয় পণ্যের ৪টি মান (একটি সার্ক আঞ্চলিক মানসহ)-এর খসড়ার সংশোধন (amendment) করার জন্য বিএসটিআই কারিগরি কমিটিকে সহযোগিতা করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি মসলা ও গুড়া মশলা এবং ৪টি মাছের মান নির্ধারণ করার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক কৃষির জন্য উত্তম অনুশীলন (GAP) এর Standard নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট Stakeholder-দের প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং খাদ্যে ভেজালসহ মাঠ ও সংরক্ষণ পর্যায়ে কৃষি পণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ খাদ্যের গুণতগমান সংরক্ষণের মাধ্যমে 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে তাদের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করবে।

ডায়রিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে

এসএফএসএন রিপোর্ট অনুযায়ী অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুর ডায়রিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবের হার (শেষ দুই সপ্তাহে) ২০১৪ সালের তুলনায় ১% হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালের ৮% হয়েছে। বিডিএইচএস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই হার (শেষ দুই সপ্তাহে) ২০০৭ সালের ১০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১ সালে ৫% হয়েছে, যা পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৫.৭% হয়েছিল (বিডিএইচএস-২০১৪) (সারণী ৩১)। খাবার স্যালাইন বিস্তৃতকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ ডায়রিয়া রোগের ব্যবস্থাপনায় সফল হয়েছে। একই সাথে খাবার স্যালাইন এবং জিঙ্ক খাওয়ানোর মাধ্যমে ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের দ্রুত সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতি (খাবার স্যালাইন এবং জিঙ্ক খাওয়ানোর সমন্বিত পদ্ধতি) কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিডিএইচএস রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত পাঁচ বছরের কম বয়সী ৩৮.১% শিশুকে খাবার স্যালাইন এবং জিঙ্ক খাওয়ানোর সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা দিয়ে ডায়রিয়া উপশম করা সম্ভব হয়েছে; ২০১১ সালে এই হার ছিল ৩৪.১%। এই প্রতিবেদনকালীন সময়ে ছয় মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী ডায়রিয়া আক্রান্ত এবং ওআরটি বা জিঙ্কের মাধ্যমে চিকিৎসা-প্রাপ্ত শিশুদের কোন উপাত্ত পাওয়া যায়নি। ২০১১ সাল থেকে ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদেরকে বেশী করে পানি পান করানো, ঘন ঘন খাওয়ানো এবং পর্যাপ্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো সম্ভব হয়েছে।

এসএফএসএন রিপোর্ট অনুযায়ী, রান্নার পূর্বে সাবান ব্যবহারের হার ২০১৩ সালের ৫% এর তুলনায় কিছুটা বেড়ে ২০১৪ সালে ৬% হয়েছে, ২০১৫ সালে এই হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪% হয়েছে। মলত্যাগের পর সাবানের ব্যবহার ২০১৩ সালে ৬১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৬৬% হয়েছে, ২০১৫ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫৭%। কিন্তু খাবার খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়ার হার ২০১৩ সালে এবং ২০১৪ সালের মত ২০১৫ সালেও ৭%-এ স্থিতাবস্থায় রয়েছে[১৮১,১৬৯]। এসএফএসএন রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪ সালের ন্যায় ২০১৫ সালেও ৯৮% পরিবারে সাবান থাকলেও ৯৭% পরিবার হাত ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার করেছে, এই হার এফএসএনএসপি ২০১৩ সালের রিপোর্ট থেকে ১% বেশী।

নিরাপদ পানি সরবরাহে স্থিতাবস্থা বিরাজমান

বাংলাদেশে প্রায় সকল নাগরিক নিরাপদ পানির সরবরাহ সুবিধা পাচ্ছে। বাসায় ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের হার ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৯৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৯৮% হয়েছে (সারণী-৩১) এবং ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত এই হার একই থাকলেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯% হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত (২০১৬-১৭ অর্থবছর)-এই হার স্থিতিশীল রয়েছে। সার্বজনীন নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্য এখনও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। নাগরিকদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নতি লক্ষণীয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনুন্নত খাবার পানির উৎস ব্যবহারকারী পরিবারের হার ২% এর তুলনায় কম। গৃহ পর্যায়ে শিশু যত্ন, খাদ্য প্রস্তুতি ও কৃষি উৎপাদনের কাজে পানির প্রাপ্যতা সন্তোষজনক হওয়ায় পরিবারের লোকদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অবস্থার উন্নতি হয়েছে। উল্লেখ্য, নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যবিধি (স্যানিটেশন) প্রাপ্যতার উপর ভাল স্বাস্থ্য নির্ভর করে। রোগের সংক্রমণ ও পানি বাহিত রোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য উন্নত পানি সরবরাহ অপরিহার্য।

আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহে কিছুটা উন্নতি

আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের হার ২০১০-১১ অর্থবছরের ৮৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৮৮% হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা একই হারে (৮৮%) স্থিতি অবস্থায় ছিল। এই হার সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৭% এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা একই হারে (৮৭%) স্থিতি অবস্থায় ছিল। পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮% উন্নীত হয়। গৃহ-পর্যায়ে পানির লভ্যতা নিশ্চিত করতে বেশীরভাগ গ্রামে টিউবওয়েলের সুবিধা আছে। দুর্ভাগ্যবশত: অনেক টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিক দ্বারা দূষিত, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় নিরাপদ খাবার পানির সরবরাহ/প্রাপ্যতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৮৮% হয়েছে, যা এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় আর্সেনিক দ্বারা দূষিত পানি পানের

ঝুঁকি থেকে উত্তরণের জন্য জনগণকে আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবহারে সচেতন হতে হবে এবং তাদেরকে খাবার পানির বিকল্প উৎসের সন্ধান করতে হবে।

স্যানিটেশন সুবিধার উন্নতিতে স্থিতাবস্থা

জনগণের টয়লেট (শৌচাগার/পায়খানা) সুবিধা উন্নত করতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। স্যানিটেশন সুবিধা পর্যালোচনা করার জন্য চার ধরণের ক্যাটাগরি ব্যবহার করা হয়; শৌচাগার সুবিধা না পাওয়া মানুষের অনুপাত (খোলা আকাশের নিচে মলত্যাগ); অনুন্নত শৌচাগার সুবিধা যা স্বাস্থ্য সম্মত নয়; দুই বা ততোধিক পরিবারের যৌথ ব্যবহারের জন্য উন্নত টয়লেট এবং একক পরিবারের ব্যবহারের জন্য উন্নত শৌচাগারের ব্যবস্থা যেখানে উন্নত ফ্লাশ থাকে, পানি-আবদ্ধ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বন্ধ-পিট ল্যাট্রিনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এসএফএনএস ২০১৫ রিপোর্ট অনুযায়ী, কোন প্রকারের শৌচাগার সুবিধা না পাওয়া জনসংখ্যার হার ২০১১ সালের ৭% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ৪% হয়েছে, যা ২০১৫ সালেও ৪%-এ স্থিতাবস্থায় রয়েছে। গ্রামে খোলা আকাশের নীচে মল-ত্যাগকারী জনসংখ্যার হার কমার কারণে এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একক পরিবারের ব্যবহারের জন্য উন্নত শৌচাগার সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের হার ২০১১ সালে ৩০% থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ৪০% হয়েছে, যা ২০১৫ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৪১% হয়েছে। যে সকল পরিবারে কোন শিশু নেই তাদের তুলনায় যে সকল পরিবারে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে, তাঁদের স্যানিটারি স্বাস্থ্যবিধি সম্মত শৌচাগারের হার বেশী[১৮২]।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের মতে, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের ন্যায় ২০১৭ সালেও খোলা আকাশের নীচে মলত্যাগের হার ১% এ স্থিতাবস্থায় রয়েছে, উন্নত শৌচাগার যা দুই বা ততোধিক পরিবার ব্যবহার করে, তার হার ২৮% এবং উন্নত স্বাস্থ্যবিধি সম্মত শৌচাগার ব্যবহারের হার ৬১%। যে সকল মায়েদের ৫ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে তাঁদের বাচ্চাকে খাওয়ানোর পূর্বে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার হার ২% হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য প্রস্তুতকরণের পূর্বে এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণের সময়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস ৪% হ্রাস পেয়েছে। সবথেকে ধনী স্তরের ৯৭% পরিবারে সাবান থাকলেও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মাত্র ৩৫% সেবাদানকারীদের পরিচর্যার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস রয়েছে। সঠিকভাবে হাত না ধোয়ার কারণ হিসেবে গ্রামের জনগণ, দরিদ্র অর্থনীতি, মায়েদের শিক্ষার অপ্রতুলতা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতিকে দায়ী করা যায়।

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং ১টি বিধি ও ৪টি প্রবিধাণমালা চূড়ান্তকরণ সম্পন্ন

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। তবে বাংলাদেশে পরিপূর্ণভাবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত একটি বহুবিধ চ্যালেঞ্জের বিষয়। 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি/নিয়ন্ত্রণে আন্তঃ-মন্ত্রণালয় এবং আন্তঃ-সংস্থার সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর দ্বারা সৃজিত ৬টি স্থায়ী পদ সহ আরও ৩৬৫টি বিভিন্ন পর্যায়ের পদসহ সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। ইতোপূর্বে সরকার ২০১৫ সালের জুন মাসে ৬৪টি জেলায় 'নিরাপদ খাদ্য আদালত (পিওর ফুড কোর্ট) এবং ৬টি মেট্রোপলিটন এলাকায় নিরাপদ খাদ্য আদালত গঠন করেছে। আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটরদের (পিপি) নিয়োগ প্রদান, আদালত এবং পিপি-দেরকে সহযোগিতা, খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন, খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, মামলা দায়ের ও পরিচালনায় সহায়তার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ২৪২ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১ জন এনালিস্ট এবং জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১জন বায়োকেমিস্ট ও ১জন কেমিস্টসহ ৩ জনকে খাদ্য বিশ্লেষক এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর আওতায় নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য বাজেয়াপ্তকরণ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ) বিধি ২০১৪ জারি করা হয়েছে।

নিয়মিতভাবে ঝুঁকি নির্ভর পরিদর্শন কার্যক্রমকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত নিরাপদ খাদ্যের মানদণ্ড নির্ণয় করার জন্য বিএফএসএ কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রবিধানমালার প্রণয়ন করা হয়েছে: (১) খাদ্যের নমুনা গ্রহণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭; (২) খাদ্যের দূষক, টক্সিন ও অবশিষ্টাংশ প্রবিধানমালা, ২০১৭; (৩)খাদ্য সংযোজক দ্রব্য প্রবিধানমালা, ২০১৭; (৪) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭। এছাড়া, ১) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকুরী

প্রবিধানমালা, ২০১৭ এবং ২) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কারিগরি কমিটি) গঠন বিধিমালা, ২০১৭; ৩) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রবিধানমালা, ২০১৭ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই সকল বিধি ও প্রবিধানমালা প্রয়োগের মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নের প্রভাব দৃশ্যমান হবে।

বক্স-৩ এ বিভিন্ন খাতের মাধ্যমে চলমান জাতীয় ও আঞ্চলিক/স্থানীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের কিছু হালনাগাদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। নিরাপদ খাদ্যের জন্য এফএও-এর কারিগরি সহায়তায় এবং ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্যের প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএফএসএ কর্তৃক আন্তঃ-মন্ত্রণালয় এবং আন্তঃ-সংস্থা সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নতিকরণে প্রকল্পটি সহযোগিতা করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৩৯.৫৭ কোটি টাকার "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপনে দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বক্স- ৩: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে দেশব্যাপী প্রচারণামূলক কর্মসূচির আওতায় ৪ (চার) লাখ পোষ্টার, ৬ (ছয়) লাখ স্টিকার এবং ৩ (তিন) লাখ প্যাম্পলেট মূদ্রণ করে জেলা প্রশাসক, ডিসি ফুড ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। পত্র পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে নিরাপদ খাদ্য সচেতনামূলক প্রচারণা চলছে। সচেতনামূলক ফেইসবুক ক্যাম্পেইন, মোবাইলফোনে ম্যাসেজ প্রদান করা হচ্ছে। একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী করে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। ডিএফপি এর মাধ্যমে চারটি টিভি স্পট নির্মানের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার ৫ চাবিকাঠির উপর একটি এ্যমিনেশন চিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা ও শ্লোগান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পবিত্র ঈদুল আজহায় নিরাপদ কোরবানীর পশু উৎপাদন ও বিক্রয় বিষয়ে সংবাদপত্রে গণবিজ্ঞপ্তি, মাইকিং, পোষ্টার, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে বিশেষ প্রচারনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১) অনুমোদন: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১) অনুমোদিত হয়েছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনার ৬টি লক্ষ্য রয়েছে। এই পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে সরকারের রূপকল্প ২০২১, বাংলাদেশ ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এ উল্লেখিত নির্দেশনা ও অনুশাসনসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে (বক্স-৪)। এই কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পথ নকশা (Road Map) প্রণয়ন করা হয়েছে।

বক্স ৪: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১)

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর ধারা-৫ অনুসারে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় ২০১৫ সনে। পরবর্তিতে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১) অনুমোদিত হয়েছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে সরকারের রূপকল্প ২০২১, বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এ উল্লেখিত নির্দেশনা ও অনুশাসনসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার ৬ টি লক্ষ্য রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

কৌশলগত লক্ষ্য ১ - নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে স্টেট অব দ্যা আর্ট তথা সেন্টার অব এক্সিলেন্স এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা।

কৌশলগত লক্ষ্য ২- খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, আইন-কানুন এবং খাদ্য ও খাদ্যপোকরণের নিরাপদ মান জোরদার করা এবং পাশাপাশি সকল নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

কৌশলগত লক্ষ্য ৩- খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত সকল সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফলপ্রসূ ও ধারাবাহিকভাবে খাদ্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

কৌশলগত লক্ষ্য ৪- নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ নীতিমালা প্রণয়ন, বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন,কার্যকর ও প্রয়োগ করতে বিজ্ঞানভিত্তিক উপদেশ প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রবর্তন বা কাঠামো গঠন।

কৌশলগত লক্ষ্য ৫- খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী সমর্থনে খাদ্য পরীক্ষাগারের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা। পাশাপাশি খাদ্যবাহিত রোগ এবং পশুরোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের উপর নজরদারির ব্যবস্থা আধুনিকায়ন।

কৌশলগত লক্ষ্য ৬- সর্বোচ্চমানে নিরাপদ খাদ্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের লক্ষ্যে উৎসাহ যোগাতে সকল অংশীজন, বিশেষতঃ খাদ্যশিল্পের সাথে জড়িতদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ত থাকা এবং নিরাপদ খাদ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

উৎসঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

৬.৩.২. নীতি গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পরবর্তী করণীয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মসূচি ১২-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে ৬২.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট চাহিদার মধ্যে ৪১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সংস্থান করা হয়েছে, যা কর্মসূচি-১২ বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের নির্ধারিত বাজেটের ৬৬.২৮% ও সিআইপি বাস্তবায়নে ১২টি কর্মসূচির মোট বাজেট চাহিদার প্রায় ০.২৩%। তিনটি উপ-কর্মসূচি নিয়ে কর্মসূচি ১২ গঠিত, যাতে ৭টি বাস্তবায়িত ও ৪ টি চলমান প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ১২.১-এর অর্থসংস্থান ৮.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কোন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প নেই। উপ-কর্মসূচি ১২.১-এ ১টি বাস্তবায়িত এবং ১টি চলমান প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ১২.২-এর অর্থসংস্থান হয় ১৪.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কোন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প নেই। উপ-কর্মসূচি ১২.২-এ ২টি বাস্তবায়িত এবং ২টি চলমান প্রকল্প রয়েছে। উপ-কর্মসূচি ১২.৩-এর অর্থসংস্থান ১৮.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও কোন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প নেই। উপ-কর্মসূচি ১২.৩-এ ৪টি বাস্তবায়িত এবং ১টি চলমান প্রকল্প রয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে কর্মসূচি ১২-এর মোট বাজেট ব্যয় ১.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ সালে ছিল ৪.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কর্মসূচি ১২-এর আওতায় মোট ২৬.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থানের ৬৩.৭৭%। কর্মসূচি ১২-এর আওতায় সিআইপি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৫০% ও ৫০%। অপরদিকে, চলমান প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ১% ও ৯৯% । এ ধারা নিরাপদ খাদ্য এবং খাদ্যের গুণগতমান এর উৎকর্ষ সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্ব হ্রাসের নির্দেশ করে।

নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের গুণগত-মান এবং এ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ দেখভাল করার জন্য সরকারের বিভিন্ন খাত এবং প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে। বিএফএসএ-এর সার্বিক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ নিরাপদ খাদ্য নীতি, কর্মপরিকল্পনা, বিধি ও প্রবিধাণমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/খাতের কার্যক্রম সমন্বয় করা। আইইডিসিআর (IEDCR) ইতিমধ্যে দেশে খাদ্য বাহিত রোগের নজরদারি (surveillance) প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নেটওয়ার্কের জরুরী 'কন্টাক্ট পয়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পোল্ট্রি, মৎস্য ও হর্টিকালচারে মূল্য সংযোজনে ঝুঁকি বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম:

- **বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১) ও এর** পথ নকশা (Road Map)**যথাযথ বাস্তবায়ন**

  বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১)-এর খসড়া মে, ২০১৬ মাসে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১) বাস্তবায়নের জন্য জন্য একটি পথ নকশা (Road Map) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ টেকসইভাবে সব মানুষের নিরাপদ খাদ্য-প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

- **নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রণীত অনুমোদিত বিধি ও প্রবিধানমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ**

  নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রণীত ১টি বিধি ও ৪টি প্রবিধানমালাসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত বিধি ও প্রবিধানমালা বাস্তবায়ন করা জরুরী। এছাড়াও আরও তিনটি প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালাগুলো দ্রুত চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া উচিত। এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়, সহ-সভাপতি হিসেবে মন্ত্রীপরিষদ সচিব এবং সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধিতে বিএফএসএ কেন্দ্রীয়ভাবে সহযোগিতা করছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বিত করা এবং স্বাস্থ্য খাতসহ বিভিন্ন অংশীজনদের আরও সক্রিয় সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন।

- **নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রচারণামূলক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ ও অব্যাহত রাখা**

  খাদ্যে ভেজাল ও বিষ প্রদান রোধকল্পে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পোস্টার, স্টিকার ও প্যাম্পলেট বিতরণ, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ (উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়) করার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত স্লোগান গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে মাইকিং করার কর্মসূচিও সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বার্তা ও স্লোগান বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারের ধারা অব্যাহত রেখে সাধারণ জনগণকে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে।

- **বাজারে সরবরাহকৃত খাদ্যের নিরাপদ মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ**

  বিএসটিআই এবং তদসংশ্লিষ্ট সংস্থার কার্যকর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে হবে। নির্দিষ্ট পণ্যের কারিগরি বিষয়সমূহ দেখভাল করার জন্য গঠিত কোডেক্স উপ-কমিটিসমূহের কর্মকান্ড কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য উপ-কমিটিসমূহকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং নিয়মিত সভা আয়োজন করা প্রয়োজন। কোডেক্সের নীতিমালা অনুযায়ী বিএফএসএ বিসিসি কর্মসূচিকে সহায়তাসহ আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির প্রসারের জন্য কাজ করছে। বিএসটিআই-এর মানের আওতায় খাদ্য পণ্যের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং সংকট নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (HACCP) পদ্ধতি কার্যকর করা, মৎস্য এবং অন্যান্য খাতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর আচরণ-বিধি (কোড অব কন্ডাক্ট) অনুসরণ করার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করাও জরুরী।

- **নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডায়রিয়ার প্রকোপ হ্রাসকরণ**

  মা ও সেবাদানকারী ব্যক্তিসহ পরিবারের সকল সদস্যদের বিশেষ বিশেষ সময়ে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে, যেমন খাওয়ার পূর্বে, শিশুকে খাওয়ানোর পূর্বে, খাদ্য তৈরির পূর্বে এবং পায়খানা করার পরে। খাবার পানির গুণাগুণ এবং খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সংশোধনমূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিতে হবে। এছাড়া ওয়াশ (WASH) কার্যক্রমসহ সকল পরিবারে স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- **নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য-শৃঙ্খলের সকল স্তরের সামর্থ্য (capacity) শক্তিশালীকরণ**

  খাদ্য উৎপাদন পর্যায় থেকে শুরু করে ভোক্তাদের খাবার থালা পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য শৃঙ্খলের সকল স্তরের সামর্থ্য শক্তিশালীকরণে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বিশেষ করে হাতে কলমে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার যে বিপুল সংখ্যক কর্মী বাহিনী রয়েছে তাদের সামর্থ্যের শক্তিশালীকরণের মাধ্যমেই খাদ্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে। দেশব্যাপী নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিরাপদ খাদ্যের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

৭. খাদ্য নিরাপত্তা এবং সিআইপি-তে অর্থায়ন

যে সকল কর্মসূচি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি আঙ্গিক (যেমন - খাদ্য লভ্যতা (availability of food), খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ (access to food) ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারে (**utilization of food**) অবদান রাখে, সে সব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ এবং এর কৌশলের উপর রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) আলোকপাত করে। জাতীয় খাদ্য নীতি ও এর কর্মপরিকল্পনার আওতায়, অগ্রাধিকার-ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা করতে সিআইপি সহায়তা করে এবং প্রত্যাশিত বিনিয়োগকে পরিকল্পনার মূল স্রোতধারা অর্থাৎ এডিপি-অভিমুখী করে অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। এছাড়াও সিআইপি কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতের বিনিয়োগ পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করে।

এই অধ্যায়টি ৩টি অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে গঠিত। অনুচ্ছেদ ৭.১ এ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি অঙ্গনে সংশ্লিষ্ট মুখ্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ সমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের ধারা উপস্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করত, খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং জেন্ডার ইস্যুতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তার উপর আলোকপাত করা। অনুচ্ছেদ ৭.২ এ, সিআইপি অর্থায়ন বিষয়ক পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সিআইপি'র সময়সীমা, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং তার সঠিকতা নিরূপণ, অর্থায়ন ব্যবধান (financial gap) এবং সিআইপি-এর অগ্রাধিকার কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনা। অনুচ্ছেদ ৭.৩-এ ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সিআইপি-এর আর্থিক বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক উপাত্তসমূহকে তিনটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে; যেমন: (১) খাদ্য নিরাপত্তার প্রত্যেক অঙ্গের (খাদ্য লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার) শ্রেণীবিন্যাস; (২) এডিপি ও এডিপি বহির্ভূত খাতে সিআইপি কর্মসূচিতে অর্থায়ন; এবং (৩) সিআইপি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জনে অর্থ ব্যয় এবং সিআইপি কর্মসূচিতে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য অঙ্গীকারকৃত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ। উপবিভাগ অনুসারে বরাদ্দ বিভাজন পরিশিষ্ট ৪.২ এবং ৪.৩ তে উল্লেখ করা হয়েছে ।

৭.১. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট এবং খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থান

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়ন পরিবীক্ষণে দারিদ্র বিমোচন এবং জেন্ডার ইস্যুতে সরকারি বাজেট ব্যয়ের গতিধারা বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই অধ্যায়ে মূলত: খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি অঙ্গনে সংশ্লিষ্ট মুখ্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ সমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের ধারা উপস্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করত, খাদ্য নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং জেন্ডার ইস্যুতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তার উপর আলোকপাত করা। খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ-সমূহের বাজেট বরাদ্দকে খাদ্য-ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের কার্যকরী প্রতিনিধিত্বমূলক (proxy) নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধরা হয়েছে। সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট বরাদ্দ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২৪৭.৮ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে এবং তা ২০১৭-১৮ সালে ৯০৩.৪৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। তবে, সরকারী মোট ব্যয়ের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট সহযোগী মন্ত্রণালয়সমূহের ব্যয় ২০০৭-০৮ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর সময়ে উঠানামা করলেও এর সার্বিক গতিধারা ছিল নিম্নমুখী। সরকারি মোট ব্যয়ের মধ্যে উক্ত মন্ত্রণালয়-সমূহের বাজেট ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩০% থেকে পরবর্তী বছরসমূহে হ্রাসবৃদ্ধির পর ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩২% এ দাঁড়ায়। পরবর্তীতে উক্ত বাজেট হ্রাস পেতে শুরু করে, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৫% এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৪%, এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৩% এ নেমে আসে। সহযোগী মন্ত্রণালয়-সমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

লেখচিত্রঃ ৩২ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট

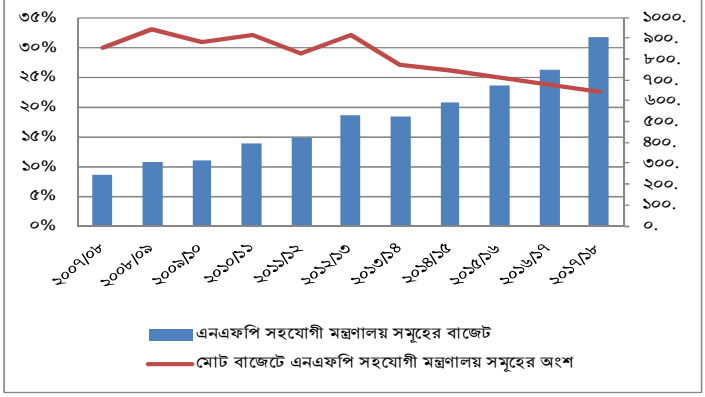

৭.২. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের জেন্ডার বিষয়ক বাজেট

সরকারী উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন ব্যয়ের সাথে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের সংযোগ রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ৪ লক্ষ ২৬৬ কোটি টাকার মধ্যে মহিলাদের শেয়ার ১ লক্ষ ১২ হাজার ১৯ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২৭.৯৯% যা গত বছরের ২৬.৯৮% এর চেয়ে মাত্র ১% বেশী। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সহযোগী মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ক্ষেত্রে এই ব্যয় ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ৫ গুণ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫ গুণের অধিক এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬ গুনের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র ৩৩)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৩০ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৬ % বেশী। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-সমূহ এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থা-সমূহে মোট বাজেটের ৮২% বরাদ্দ ছিল কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৭৬.৯৪% হয়েছে।

লেখচিত্র ৩৩: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের জেন্ডার বাজেট

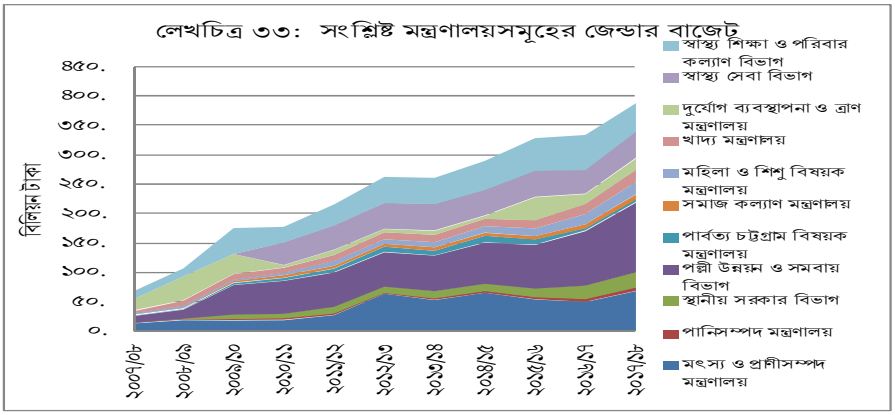

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

জেন্ডার ইস্যুতে সহযোগী মন্ত্রণালয়-সমূহের ব্যয় ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী হলেও বিভিন্ন সময়ের উঠানামা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতে সহযোগী মন্ত্রণালয়-সমূহের ব্যয় ছিল রেকর্ড পরিমাণ (৫৬%), যা পরবর্তী বছরসমূহে হ্রাস পায়। কিন্তু ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে পুনরায় তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ব্যয় ৪৯% থেকে বেড়ে ৫১%-এ স্থির হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আবারও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭% এ উন্নীত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পূর্বের রেকর্ড অতিক্রম করে ৫৭% এ উন্নীত হয়েছে। (লেখচিত্র: ৩৪)।

লেখচিত্র ৩৪: খাদ্য নীতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের জেন্ডার বাজেট ব্যয়ের অংশ

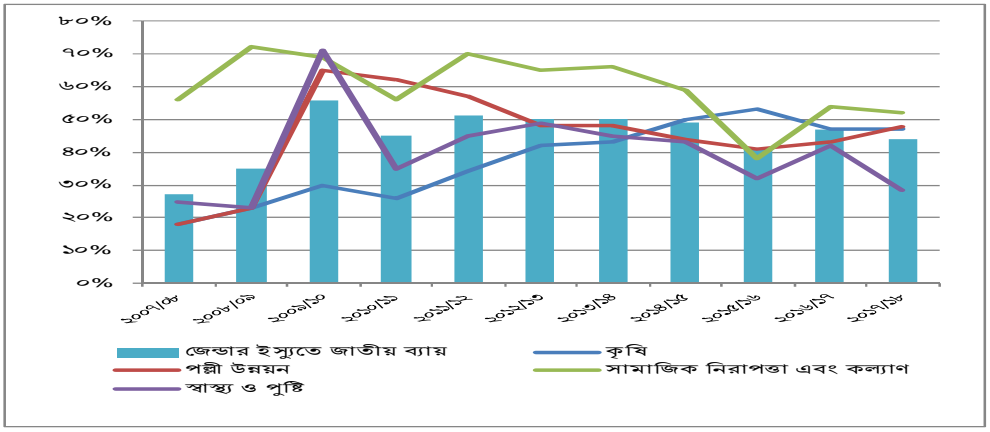

খাত-ভিত্তিক বিভাজন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট[৭] অংশে জেন্ডার ইস্যুতে ব্যয় ১৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭% এ উন্নীত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন খাতে[৮] উক্ত ব্যয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ২৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬৫%-এ উন্নীত হয়; অবশ্য পরবর্তী ৬ বছরে উক্ত ব্যয় ২২% ভাগ হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৩% এ নেমে আসে। তবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮% এ উন্নীত হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক অংশীদার মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে কল্যাণমূলক কাজে নিযুক্ত অংশীদারগণের[৯] জেন্ডার ইস্যুতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তাদের ব্যয়ের হার সর্বাধিক ৭২% (লেখচিত্র ৩৪)। তদ-পরবর্তী সময়ে কল্যাণ খাতে জেন্ডার বাজেট উঠানামা করে শেষপর্যন্ত নিম্নমুখী ধারা অর্জন করে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই হার ৫২% এ স্থির হয়। অনুরূপ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে ২০০৯/১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ব্যয় ৭১% হওয়ার পর থেকে উক্ত ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নমুখী গতিধারা বজায় রাখে।

বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে জেন্ডার ইস্যুতে ব্যয় বৃদ্ধির সচেতনতা বাড়ানোর জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল (gender-responsive) বাজেট বিবরণী প্রদান নিশ্চিতভাবে একটি কার্যকর পন্থা। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং শিশুর স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিতকরণে, বিশেষ করে দরিদ্র পল্লী এলাকার শিশুদের ক্ষেত্রে মহিলাদের মুখ্য ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেটের নিম্নগতি উদ্বেগজনক সংকেত দেয়।

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারী ব্যয়

অর্থ মন্ত্রণালয় দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ব্যয়[১০] বিবরণী প্রদান করে থাকে যা দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে অরক্ষিত মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য সক্ষম উপাদানকে লক্ষ্যবস্তু করে। বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দারিদ্র বিমোচন খাতে বাজেটের গতিধারা ক্রমবর্ধমান হলেও গত ১০ বছর ধরে সরকারি মোট ব্যয়ের অনুপাতে এ খাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে । তদুপরি গত দশকের তুলনায় বর্তমান দশকে দারিদ্র বিমোচনের গতি বেশী ছিল। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন ব্যয় ৩৭৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০৩%[১১]। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন বাজেট ২৭% বৃদ্ধি পেয়ে ২১২৯.৪৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে (লেখচিত্র: ৩৫)।

লেখচিত্র ৩৫ - দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ব্যয়

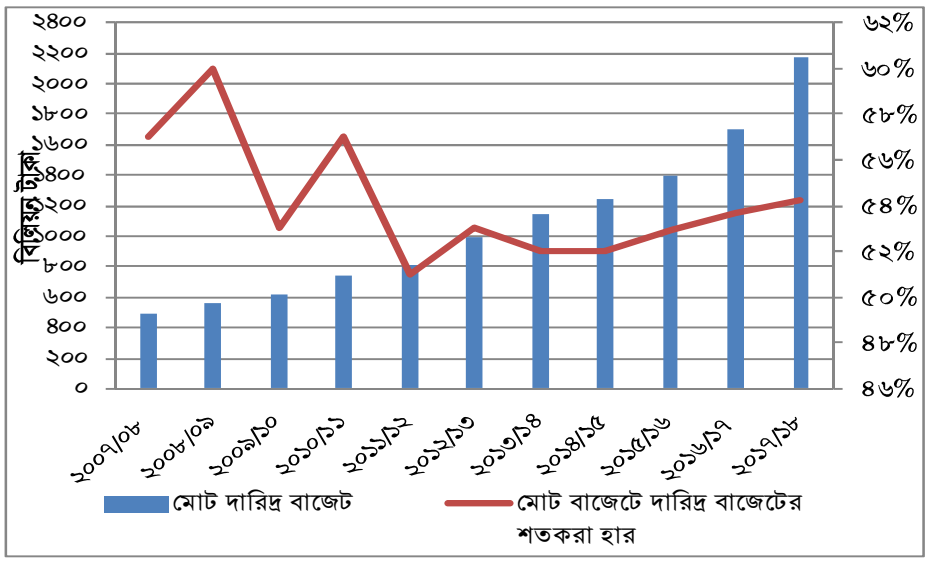

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় ২০১৭।

৭. [7] কৃষি খাতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৮. [8] পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯. [9] দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১০. [10] অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপাত্ত, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয় সহ ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ এর সংক্ষিপ্ত বাজেটকে বিবেচনা করে।
১১. [11] ২০০৭-০৮ থেকে ২০১৭-১৮ সময়ের মধ্যে সরকারী বাজেট ০.৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫ বিলিয়ন টাকা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হলেও জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়েনি, বরং হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে আয়-দারিদ্রের জাতীয় গড় হার ছিল প্রায় ৫১%যা ২০১৬ সাল নাগাদ কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৩% এ (Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey ২০১৬, BBS) যা একটি সন্তোষজনক অগ্রগতি বলে বিবেচিত হয়। অপরদিকে এ সময়ে দেশে ধনী-দরিদ্রের আয় বৈষম্য সামান্য হ্রাস পেলেও উহাকে স্বস্তিদায়ক অবস্থা বলা যায় না। ফলে বিনিয়োগ পরিকল্পনায় দরিদ্র বান্ধব প্রবৃদ্ধি (pro-poor growth) এর বিষয়টি আরও বেশী বিবেচনায় রাখা দরকার।

৭.৩. সিআইপি বাজেটের ক্রমবিকাশ

২০১৫-১৬ অর্থবছরের শেষে সিআইপি বাজেট দাঁড়িয়েছিল ১৬.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে মোট অর্থায়নকৃত অর্থের পরিমান ছিল ১০.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি মনিটরিং রিপোর্টে সিআইপি বাজেটের হিসাব প্রদর্শণ করা হয়নি, কারণ; ২০১৫-১৬ অর্থবছর সিআইপি১ এর শেষ পরিবীক্ষণ বৎসর হিসেবে গন্য করা হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরটি মূলত সিআইপি ২ এর শুরুর বছর। একারণে পাইপলাইন প্রকল্প এবং সিআইপি বাজেটে অব্যয়িত অর্থের হিসাব সম্বলিত সিআইপি১ এর বাজেটের হিসাব প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা লোপ পেয়েছে। এই প্রতিবেদনে মোট বাজেটের চেয়ে মোট অর্থায়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তদুপরি বরাদ্দকৃত অর্থের কি পরিমান অব্যয়িত রয়েছে তা দেখানো হয়েছে। ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখে সিআইপি-ভুক্ত চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মোট অর্থায়ন হয়েছে ১১.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অংশ ছিল যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%।

এছাড়াও সর্বশেষ হিসাব-দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সিআইপি-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে ২.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অব্যয়িত রয়েছে যার মধ্যে চলমান প্রকল্পে অব্যয়িত রয়েছে ২.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা সিআইপি১ পরবর্তি সময়ে ব্যবহৃত হবে। বাকী ০.৬৩ বিলিয়ন অব্যয়িত রেখেই কতিপয় প্রকল্প তাদের প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্ত করেছে। অব্যয়িত ২.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ১.৮ বিলিয়ন সরকার এবং ০.৯৫ বিলিয়ন অংশিদার সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত।

লেখচিত্র ৩৬ - খাদ্য নিরাপত্তার মাত্রা-ভিত্তিক সিআইপি'র ক্রমবিকাশ

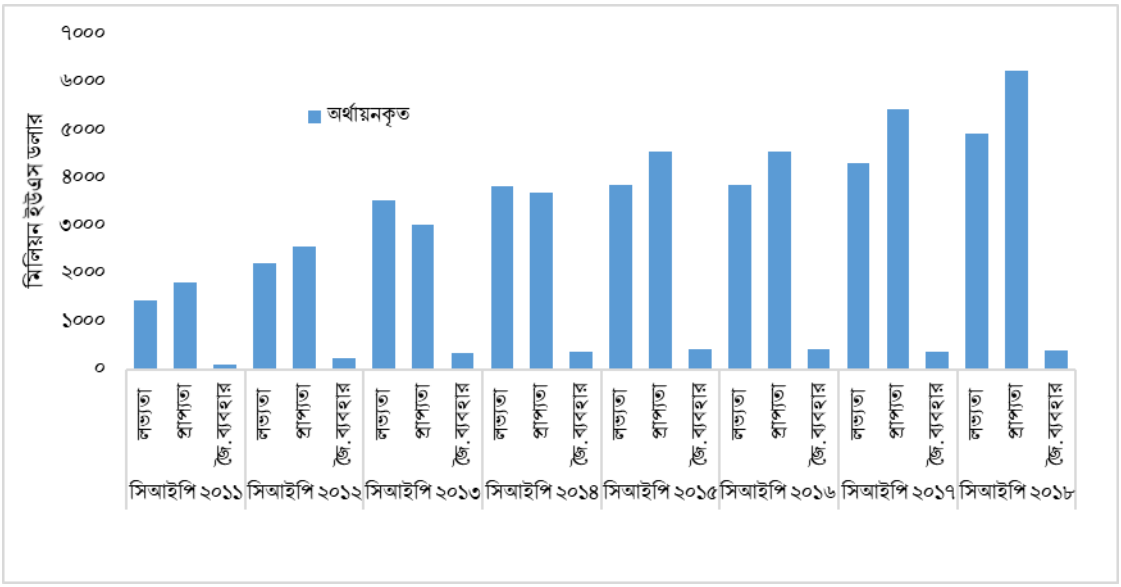

৩০শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরে সিআইপি-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের মোট অর্থায়ন খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি মূল আঙ্গিক (খাদ্য লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার) অনুযায়ী যেভাবে বিভাজিত হয়েছে তা হচ্ছে: খাদ্য লভ্যতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৪২.৬%, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫৪%, এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩.৫%। পূর্ববর্তী বছরের

শেষে (৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত) খাদ্য লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের অংশ ছিল যথাক্রমে ৪২.৭%, ৫৩.৭%, ও ৩.৬%। লক্ষণীয় যে, সর্বশেষ হিসাব মতে পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ের তুলনায় মোট সিআইপি অর্থায়ন এর হিস্যা খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি আঙ্গিকে প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সিআইপি বাজেটে উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক নতুন কোন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত না হওয়া ।

সারণী - ৩২ : সিআইপি-এর শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে অর্থায়নকৃত বাজেটের সারসংক্ষেপ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

সিআইপি-এর অঙ্গ-ভিত্তিক উপাদান	সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে অর্থায়ন (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ সময়ে চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পে অর্থায়ন)			সিআইপি অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ		
	সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	মোট অর্থায়ন	সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	মোট
	২	৩	৪ = (২+৩)	৫	৬	৭ (=৫+৬)
খাদ্য লভ্যতা	৩১৩৭	১৭৯১	৪৯২৮	৮৯১	৩৭৪	১২৬৫
খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	৪২৭৩	১৯৭৪	৬২৪৭	৮৭৯	৪৩৬	১৩১৫
খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	১০৪	৩০০	৪০৪	৩১	১৪৪	১৭৫
মোট	**৭৫১৪**	**৪০৬৪**	**১১৫৭৯**	**১৮০১**	**৯৫৪**	**২৭৫৫**

উপরোক্ত সারণী ৩২-তে প্রদর্শিত তথ্য আরও নির্দেশ করে যে, খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি আঙ্গিকের মধ্যে মোট অর্থায়নের অংশ হিসাবে 'খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার' ক্ষেত্রটির হিস্যা 'খাদ্য লভ্যতা'-ক্ষেত্রের হিস্যা বা 'খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ' ক্ষেত্রের হিস্যার তুলনায় অনেকাংশে কম।

সিআইপি-এর অর্থায়নকৃত বাজেট

সিআইপি বাস্তবায়নের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সাত বছর সময়কালে ৩০শে জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় বছর সময়ের তুলনায় সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে অর্থায়ন ১.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা ভিত্তি-বছর (২০০৯-১০)-এর শেষের তুলনায় ৮.১২ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে (পরিশিষ্ট ৪.১)। উল্লেখ্য, ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সাত অর্থবছরে সিআইপি-এর মোট বাজেটে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশ সরকার 'খাদ্য লভ্যতা' সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে অর্থায়নের ৬৩.৬৫%, 'খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ' সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে অর্থায়নের ৬৮.৪০% বিনিয়োগ করেছে। অপরদিকে, উন্নয়ন সহযোগীরা পুষ্টির জন্য 'খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার' ক্ষেত্রে অর্থায়নের ৭৪.২৬% বিনিয়োগ করেছে।

লেখচিত্র ৩৭: খাদ্য নিরাপত্তার অঙ্গভিত্তিক অর্থায়নকৃত বাজেট

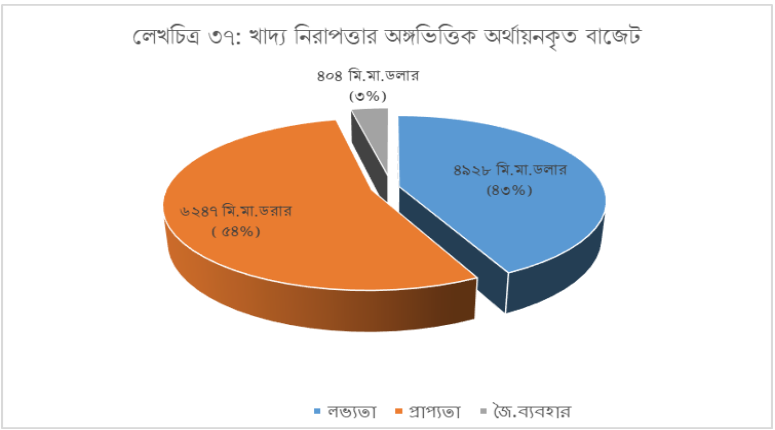

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচিভিত্তিক বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছর ২০১৫-১৬ এর প্রায় অনুরুপ রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্মসূচি-২ উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচি-৬ বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নয়ন এবং কর্মসূচি-৯ কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনি এই তিনটি কর্মসূচির একত্রিত বাজেট মোট বাজেটের ৬৯% যা গত বছর প্রায় একই ছিল (৬৮.৫%)। অন্য তিনটি অপেক্ষাকৃত কম প্রাপ্ত বাজেটের খাত যেমন কর্মসূচি-১ টেকসই ও বহুমূখী কৃষি, কর্মসূচি-৩ কৃষি উপকরণ ও মাটির উর্বরতা এবং কর্মসূচি-৪ মৎস্য ও

মৎস্যচাষ উন্নয়ন এর একত্র বাজেট ২১.৬৩% যা গত বছরের ২৩.৮% এর চেয়ে হ্রাস পেলেও ভিত্তি বছরের ১৯% এর তুলনায় বেশী রয়েছে।

এভাবে সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত ৬টি কর্মসূচির (কর্মসূচি - ১, ২, ৩, ৪, ৬, ও ৯) একত্রিত বাজেটের হিস্যা মোট অর্থায়নকৃত বাজেটের প্রায় ৯১%, যেখানে অবশিষ্ট ৬টি কর্মসূচির একত্রিত হিস্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯%। ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত 'খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার' আঙ্গিকের আওতায় ৩টি কর্মসূচির বিপরীতে মোট সিআইপি-এর বাজেট বরাদ্দের হিস্যা মাত্র ৩.৫ % হয়েছে, যা ৩০শে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বরাদ্দের হিস্যার (৩.৬%) চেয়ে সামান্য কম। 'খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার' আঙ্গিকে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রধানত 'কর্মসূচি ১০- কমিউনিটি-ভিত্তিক নিউট্রিশন'-এ নিবিষ্ট ছিল যেখানে 'কর্মসূচি ১১' ও 'কর্মসূচি ১২'- এর আওতায় মোট বাজেট বরাদ্দের হিস্যা ছিল খুবই নগণ্য (যথাক্রমে ০.৯৯% ও ০.৩৬%)।

লেখচিত্র ৩৮: কর্মসূচিভিত্তিক সিআইপি ২০১৮ অর্থায়নকৃত বাজেটের অংশ

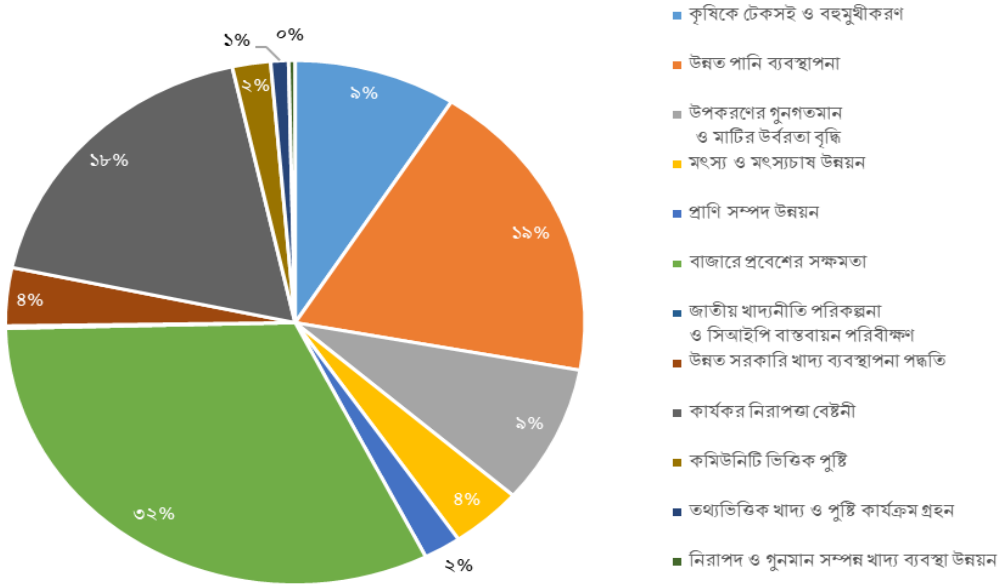

সিআইপি-তে অর্থায়নকৃত বাজেট: অতিরিক্ত অর্থায়ন ও বাজেটের পরিবর্তন

৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সাতটি অর্থবছরের শেষে পূর্ববর্তী অর্থবছর ও ভিত্তি-বছরের শেষের তুলনায় সিআইপি বাজেটের (বিশেষ করে সমাপ্ত এবং চলমান প্রকল্পের বাজেটের) বিকাশ বছর-ভিত্তিক সিআইপি অর্থায়নের পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট সংশোধন থেকে দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত এক বছর পূর্বের অবস্থার তুলনায় আর্থিক বাজেট ১৪৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে নতুনভাবে শুরু করা প্রকল্পসমূহের মোট বাজেট ছিল ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সারণী ৩৩)।

সারণী – ৩৩ : সিআইপি বাজেটে অতিরিক্ত অর্থায়নের মূল্যায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সিআইপি উপাদান	৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সিআইপি অর্থায়নকৃত বাজেট	৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সিআইপি অর্থায়নকৃত বাজেট	২০১৫-১৬ থেকে ২০১৬-১৭ এর পরিবর্তন	পরিবর্তনের ধরণ		২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ এর পরিবর্তন	পরিবর্তনের ধরণ	
				রিভিশন	নতুন প্রকল্প		রিভিশন	নতুন প্রকল্প
খাদ্যের লভ্যতা	৪৯২৮	৪৩১৪	৬১৪	৫৬৬	৪৮	৩৪৮০	১৮৯৭	১,৫৮৩
খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	৬২৪৭	৫৪৩৪	৮১৩	৮১৩	০	৪৪৩৯	৩০৯০	১,৩৪৯
খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	৪০৪	৩৬৭	৩৭	৩৭	০	৩০৯	২১৫	৯৪
মোট	**১১৫৭৯**	**১০১১৫**	**১৪৬৪**	**১৪১৬**	**৪৮**	**৮২২৮**	**৫২০২**	**৩০২৬**

সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত পাইপ-লাইন প্রকল্পসমূহের বিকাশ

৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় অর্থবছরের শেষে পূর্ববর্তী ছয় অর্থবছরের শেষে সিআইপি পাইপলাইন বাজেট ছিল ০.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পাইপলাইন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৪৮। ৩০শে জুন, ২০১৫ তারিখে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের শেষে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত পাইপলাইন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১২৪টি, যা ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখে অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শেষে ৪৮ টিতে নেমে আসে। যে কারণে সে সময় পাইপলাইন বাজেটও ০.৯৩ বিলিয়নে নেমে আসে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মনিটরিং এ পাইপলাইন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা করা হয়নি। তবে সিআইপি বাজেটে খাদ্য নিরাপত্তার সকল আঙ্গিকের হিস্যা সুষম করার নিমিত্ত ভবিষ্যত ব্যবহৃত প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় খাদ্যের জৈ,ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাইপলাইন প্রকল্পের সংখ্যা ও অর্থায়ন বৃদ্ধি অপরিহার্য। অতি-সম্প্রতি সময়ে অর্থাৎ আগষ্ট ২০১৭ মাসে গৃহীত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) ও সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের কারণে অঙ্গভিত্তিক বিনিয়োগ চাহিদা বিশেষ করে খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের হিস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হবে বলে ধারণা করা যায়।

লেখচিত্র ৩৯: সিআইপি পাইপলাইন বাজেটের খাদ্য নিরাপত্তার মাত্রাভিত্তিক ক্রমবিকাশ

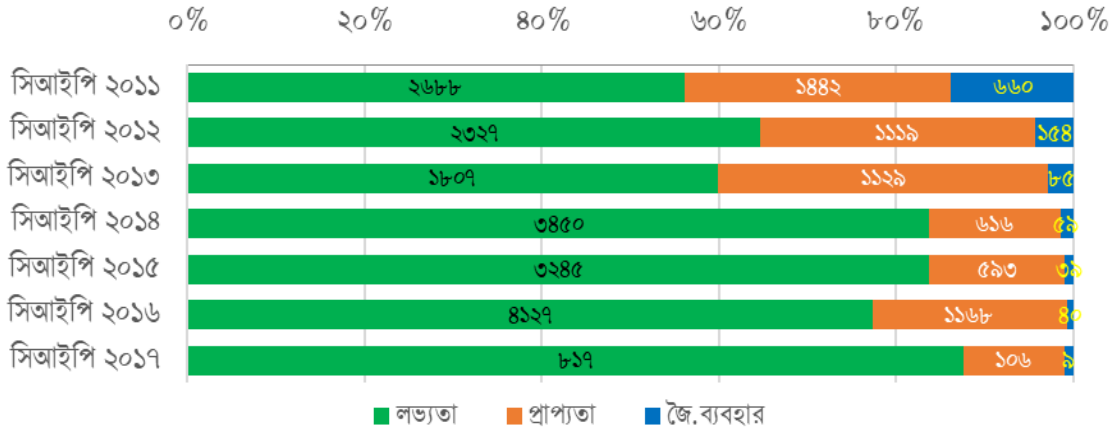

৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের হালনাগাদ সংখ্যা

৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থায়নকৃত ৫০৬ টি প্রকল্পের মধ্যে ২৯৬ টি প্রকল্প ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ২১০ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সারণী ৩৪-এ কর্মসূচি অনুযায়ী ভিত্তি-বছর এবং ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী বছরের সাথে ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থায়নকৃত প্রকল্পের তুলনা তুলে ধরেছে। ভিত্তি-বছরের তুলনায় অর্থায়নকৃত প্রকল্পের সংখ্যা ৩৩৫ টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী - ৩৪ : ভিত্তি-বছর ও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩০শে জুন ২০১৭ তারিখে প্রকল্প সংখ্যা

সিআইপি-এর কর্মসূচি			৩০শে জুন ২০১০		৩০শে জুন ২০১৫		৩০শে জুন ২০১৬				৩০শে জুন ২০১৭	
			চলমান / সমাপ্ত	পাইপ-লাইন	চলমান/ সমাপ্ত	চলমান/সমাপ্ত	পাইপ লাইন	চলমান	সমাপ্ত	পাইপ লাইন	চলমান	সমাপ্ত
১	খাদ্যের লভ্যতা	টেকসই ও বহুমুখী কৃষি	২৮	৬২	৯৩	৯৩	২৭	৪০	৬৪	১৬	৩৯	৬৫
২		উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা	৩১	২৯	৬২	৬৫	৩১	৪০	৩৯	৩	৪০	৩৯
৩		কৃষি উপকরণ ও মাটির উর্বরতা উন্নয়ন	১৬	২০	৩২	৩৩	৫	৮	২৯	২	১০	২৭
৪		মৎস্য ও মৎস্য-চাষ উন্নয়ন	১৭	২০	৩৬	৪৩	৮	২২	২৭	৩	২২	২৭
৫		পশুসম্পদ উন্নয়ন	১২	২২	২৬	৩০	১৭	২১	১৪	১১	২৩	১৪
		খাদ্যের লভ্যতা	**১০৪**	**১৫৩**	**২৪৯**	**২৬৪**	**৭৪**	**১৩১**	**১৭৩**	**৩৫**	**১৩৪**	**১৭২**
৬	খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নয়ন	৩১	২৯	৬৫	৬৮	২৭	৪৩	৪৫	৪	৪৪	৪৪
৭		জাতীয় খাদ্য নীতি ও সিআইপি পরিবীক্ষণ	৩	৬	৫	৫	২	০	৫	১	০	৫
৮		উন্নত সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৩	১৮	৯	১০	৩	৩	৭	২	৩	৭
৯		কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী	১৯	১৫	৩৫	৩৮	৮	১৩	২৫	৩	১৩	২৫
		খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	**৫৬**	**৬৮**	**১১৪**	**১২১**	**৪০**	**৫৯**	**৮২**	**১০**	**৬০**	**৮১**
১০	খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	কমিউনিটি-ভিত্তিক পুষ্টি	৪	১৫	২৯	৩২	৬	৩	২৯	২	৭	২৫
১১		তথ্য ভিত্তিক খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ	৩	৯	১৩	১৩	২	৮	৮	০	৫	১১
১২		নিরাপদ ও মান সম্পন্ন খাদ্য-ব্যবস্থা উন্নয়ন	৪	১১	১০	১১	২	৪	৭	১	৪	৭
		খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	**১১**	**৩৫**	**৫২**	**৫৬**	**১০**	**১৫**	**৪৪**	**৩**	**১৬**	**৪৩**
		মোট	**১৭১**	**২৫৬**	**৪১৫**	**৪৪১**	**১২৪**	**২০৫**	**২৯৯**	**৪৮**	**২১০**	**২৯৬**

সিআইপি প্রকল্পসমূহের গড় বাজেট

সারণী ৩৫-এ খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি আঞ্জিক সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিসমূহের আওতায় সমাপ্ত ও চলমান ও প্রকল্পসমূহের গড় আকারে প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহের ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত গড় বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের (৩০শে জুন ২০১৬ পর্যন্ত)-এর গড় বরাদ্দের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে (২০.০৭ থেকে ২২.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে), যা ভিত্তি-বছর (২০০৯-১০)-এ ছিল ১৯.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি অঞ্চ-ভিত্তিক বিভাজন বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, চলমান এবং সমাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের চেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যের লভ্যতার আওতায় প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে গড় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৪৬%, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে ১৪.৯১% এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১০.৪৮%।

সারণী- ৩৫ : সিআইপি সমাপ্ত/চলমান এবং পাইপলাইন প্রকল্প সমূহে গড় বরাদ্দ

সিআইপি-এর কর্মসূচি			৩০শে জুন ২০১০ পর্যন্ত		৩০শে জুন ২০১৫ পর্যন্ত		৩০শে জুন ২০১৬ পর্যন্ত		৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত
			চলমান/ সমাপ্ত	পাইপ লাইন	চলমান / সমাপ্ত	পাইপ লাইন	চলমান / সমাপ্ত	পাইপ লাইন	চলমান / সমাপ্ত
১	খাদ্যের লভ্যতা	টেকসই ও বহুমুখী কৃষি	৫.০	৮.৮	৭.৭	৯.৯	৮.৬২	৩০.৫৮	১০.০৯
২		উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা	২৪.৭	২৯.৬	২৫.২	৫৫.৫	২৩.৭৯	১৩.৬২	২৭.৬২
৩		কৃষি উপকরণ ও মাটির উর্বরতা উন্নয়ন	২১.৯	১৩.০	২৬.৩	৪৮৪.৮	২৫.৮৬	১০.৬০	২৬.৭৭
৪		মৎস্য ও মৎস্য-চাষ উন্নয়ন	৭.৬	১৬.৬	১১.৮	৩৮.৩	৭.৯২	৬.২৩	৯.৪৯
৫		প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	৫.১	৩১.৫	৫.৯	১১.০	৫.৫৩	২২.৪৮	৬.৫২
		খাদ্যের লভ্যতা	**১৩.৯**	**১৭.৬**	**১৪.৮**	**৫৫.৮**	**১৪.১৯**	**১৬.৭০**	**১৬.১০**
৬	খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নয়ন	৩৬.৯	২৩.০	৩৮.৯	১৫.১	৩৬.২৮	৯.৯৯	৪২.২৩
৭		জাতীয় খাদ্য নীতি ও সিআইপি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	৩.৪	১১.৩	৩.৪	১১.০	৩.৫১	২০.০০	৩.৫১
৮		উন্নত সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনা	২১.১	১৬.৯	৩৩.৭	৪১.৭	৩৮.০১	১১.৫৪	৪১.২৯
৯		কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী	৩১.১	২৬.২	৪১.৮	৭৬.৫	৪৮.৫৫	৭.৫৯	৫৫.২৭
		খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	**৩২.৩**	**২১.১**	**৩৭.৯**	**২৯.২**	**৩৮.৫৫**	**১২.২৮**	**৪৪.৩০**
১০	খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	কমিউনিটি-ভিত্তিক পুষ্টি	২০.৩	৩০.৭	৬.৫	৩.৮	৭.৬৫	১.৮৬	৭.৭৩
১১		তথ্য ভিত্তিক খাদ্য-পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ	০.২	২.৪	৫.৩	০.৫	৫.০৮	০	৭.১৯
১২		নিরাপদ ও গুণ সম্পন্ন খাদ্য-ব্যবস্থা উন্নয়ন	৩.২	১৬.১	৩.৩	৮.৩	৩.৬০	৬	৩.৭৮
		খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	**৮.৬**	**১৮.৯**	**৫.৬**	**৪.০**	**৬.২০**	**২.৫৬**	**৬.৮৫**
		মোট	**১৯.৬**	**১৮.৭**	**২০.০**	**৪৩.০**	**২০.০৭**	**১৯.৪১**	**২২.৮৮**

জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে বাজেট ব্যবহার

সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে বাজেট ব্যবহার সিআইপি কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ব্যয়ের প্রতিফলন প্রদর্শন করে। ৩০শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সিআইপি বাজেটের ক্রমপুঞ্জিত ব্যবহার হয়েছে ৮.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বার্ষিক গড় ব্যবহার হিসাবে যা দাঁড়ায় ১.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরে ছিল ১.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার আংগিকসমূহে বিভাজন হিসাবে অর্থায়নকৃত বাজেটের মধ্যে ব্যবহারের হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪১.৫%, ৫৫.৯% এবং ২.৬% । মোট ব্যবহারের মধ্যে সরকারী খাতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৫.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সারণী ৩৬)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেট ব্যবহার ১.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রকল্প প্রতি গড় ব্যবহার ২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্প প্রতি গড় ব্যবহার গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (২.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্থলে ২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এই ব্যয়হার ভিত্তি বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় (সারণী ৩৬)।

বার্ষিক সিআইপি কর্মসূচি বাস্তবায়নে দক্ষতা

সিআইপি বাস্তবায়নকালে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি প্রকল্পের মোট বাজেট এবং বছর-ভিত্তিক বাজেটের হিসাব রাখে। অতঃপর: সিআইপি সময়কালে ঐ প্রকল্প বাস্তবায়নে যতদিন সময় লাগে তার ভিত্তিতে বাজেট হিসাব করা হয়। উল্লেখ্য বার্ষিক হারাহারি (pro-rata) বাজেটের যে অংশ ব্যয় করা হয়, তাদের অনুপাতকে সিআইপি বাস্তবায়নে দক্ষতার হার ধরা হয়েছে।

বাজেটের অব্যয়িত অংশ পরবর্তী বছরে যোগ হয় এবং উক্ত অব্যয়িত অংশকে হিসাবে নিয়ে পরবর্তী বছরের হারাহারি বাজেট গণনা করা হয়। পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত অর্থের প্রবাহ পরবর্তী বছরের বাজেটের আকার বৃদ্ধি করে বিধায় বাজেট ব্যয়ের দক্ষতা হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতিতে প্রকল্পের মেয়াদকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা আবশ্যকীয়। কারণ, বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ এবং এর ব্যয়ের দক্ষতা নির্ভর করে প্রকল্পের মেয়াদকালের উপর। বস্তুত, যেসব প্রকল্প দুর্বলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, সে সব প্রকল্পের সমন্বয়সাধন (যেমন বাজেট সংশোধন, প্রকল্পের সময় বৃদ্ধিকরণ, ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়ন গতিতে প্রভাব ফেলে। লেখচিত্র ৪০-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রকল্প-ভিত্তিক ব্যয় নির্বাহের হার এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় দেখানো হয়েছে (সারণী ৩৬)। এখানে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ছিল ৬৪% যা ২০১৫-১৬ সালে ছিল ৬২% এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৫২% । লেখচিত্র ৪০-এ সিআইপি কর্মসূচি অনুযায়ী বার্ষিক বাস্তবায়ন হার দেখা যায়।

সারণী - ৩৬ : ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যবহার (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

সিআইপি-এর কর্মসূচি			২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যবহার			২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যবহার			২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যবহার			৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যবহার		
			সরকারী	দাতা সংস্থা	মোট	সরকারী	দাতা সংস্থা	মোট	সরকারী	দাতা সংস্থা	মোট	সরকারি	দাতা সংস্থা	মোট
১	খাদ্যের লভ্যতা	টেকসই ও বহুমুখী কৃষি	৬৭	৫২	১১৯	১০৪	৫২	১৫৬	৯৩	৫৫	১৪৮	৫১৭	২৮০	৭৯৭
২		উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা	১৬৪	৪৯	২১৩	১৭১	৭৫	২৪৬	২০৫	৭৬	২৮০	১১৩০	৩৬৮	১৪৯৮
৩		কৃষি উপকরণ ও মাটির উর্বরতা উন্নয়ন	৭১	৫৬	১২	৪৬	২৮	৭৪	২৫	৯	৩৩	৩০৯	৬৫২	৯৬১
৪		মৎস্য ও মৎস্য-চাষ উন্নয়ন	৫৪	১৫	৬৯	৪৬	২২	৬৮	৫১	১৯	৭০	১৬৫	৭৮	২৪৩
৫		প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	২৮	১	২৯	১১৬	১	১১৭	৩২	০	৩২	১২৫	৪০	১৬৫
		খাদ্যের লভ্যতা	**৩৮৪**	**১৭৩**	**৫৫৮**	৪৮৩	১৭৮	৬৬১	৪০৬	১৫৮	৫৬৪	২২৪৬	১৪১৭	৩৬৬৩
৬	খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নয়ন	৩৮০	৮৮	৪৬৭	৩৯৫	১৩৩	৫২৮	৩৯৮	১৩৯	৫৩৭	২১৫০	৬৮৫	২৮৩৫
৭		খাদ্য নীতি ও সিআইপি পরিবীক্ষণ	০	২	২	০	০	০	০	০	০	০	১৬	১৬
৮		উন্নত সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১৬	১৩	৩০	২৭	১২	৩৯	১০	১৬	২৬	২১২	৪৮	২৬০
৯		কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী	১৮১	১৪৬	৩২৮	১৭৬	৮২	২৫৮	১৯৯	৪৭	২৪৬	১০৩২	৭৮৯	১৮২১
		খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	**৫৭৭**	**২৫০**	**৮২৭**	৫৯৮	২২৭	৮২৫	৬০৭	২০২	৮০৯	৩৩৯৪	১৫৩৭	৪৯৩২
১০	খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টি	১২	৩৮	৪৯	১৩	২০	৩৩	১২	১১	২২	৫৬	১১০	১৬৬
১১		তথ্যভিত্তিক খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ।	৩	৮	১১	৪	১	৫	৪	২০	২৪	৯	২৮	৩৭
১২		নিরাপদ মানসম্পন্ন খাদ্য-ব্যবস্থা উন্নয়ন	৫	৩	৮	০	৪	৪	০	২	২	৮	১৮	২৭
		খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	**১৯**	**৪৯**	**৬৮**	১৭	২৫	৪২	১৫	৩৩	৪৮	৭৩	১৫৬	২২৯
		মোট	**৯৮১**	**৪৭২**	**১৪৫৩**	**১০৯৮**	**৪৩০**	**১৫২৮**	**১০২৮**	**৩৯৩**	**১৪২১**	**৫৭১৩**	**৩১১১**	**৮৮২৪**

২০১৬-১৭ অর্থবছর পরবর্তীকালে সিআইপি অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন

৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি আঙ্গিকে (খাদ্য লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহার)-মোট ১১৫৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের মধ্যে মোট ব্যবহার হয়েছে ৮৮২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক ব্যয় হার দাঁড়িয়েছে ৭৬%। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত এই হার ছিল ৬৮%। কর্মসূচিভিত্তিক ৩,৭ ও ৯ ব্যতিত সকল কর্মসূচির ব্যয়হার সার্বিক ব্যয়হারের নীচে। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিনিয়োগে প্রত্যাশিত অগ্রাধিকার বাস্তব ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত হয়নি , বিশেষত: পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহার এর ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

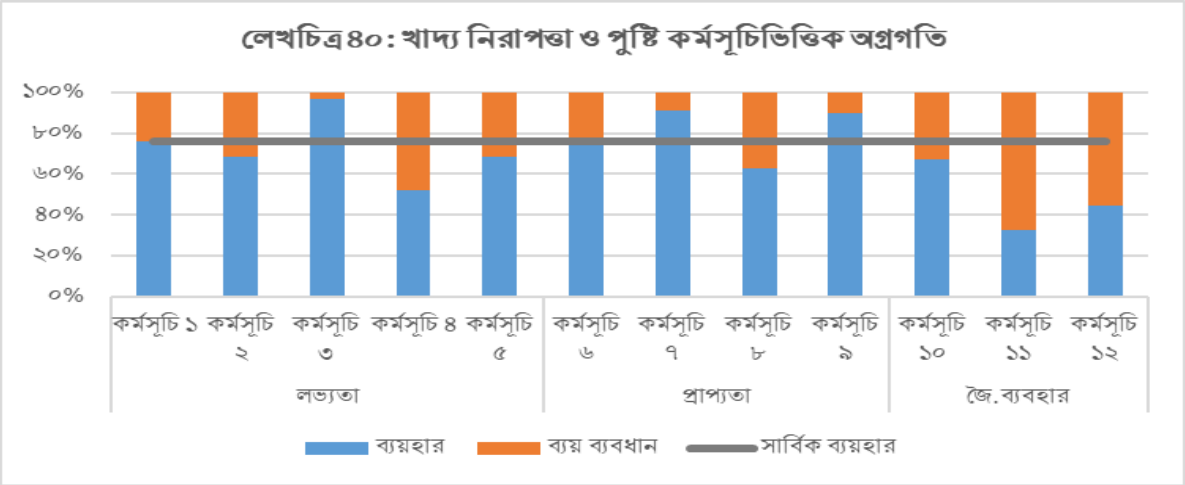

সারণী ৩৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর পরবর্তী সময়ের অর্থায়ন পরিস্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সিআইপি প্রোগ্রাম			চলমান প্রকল্প সমূহ ৩০শে জুন ২০১৬ তারিখে			চলমান প্রকল্প সমূহ – ৩০শে জুন ২০১৭ তারিখে		
			মোট	সরকারী	দাতা-সংস্থা	মোট	সরকারী	দাতা-সংস্থা
১	খাদ্যের লভ্যতা	টেকসই ও বহুমুখী কৃষি	৩৯৩	২২৩	১৭০	১৬০	৬৩	৯৭
২		উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা	১৪১৪	৮০৩	৬১১	৬০৮	৪১১	১৯৮
৩		কৃষি উপকরণ ও মাটির উর্বরতা উন্নয়ন	৭১	৬৬	৫	-৫১	৩৪	-৮৪
৪		মৎস্য ও মৎস্য-চাষ উন্নয়ন	৪৩২	২৫২	১৮০	২১২	১১০	১০২
৫		প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	১২৮	১২৮	০	৫৩	৫৩	০
		খাদ্যের লভ্যতা	**২৪৩৮**	**১৪৭২**	**৯৬৬**	**৯৮৩**	**৬৭১**	**৩১২**
৬	খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নয়ন	১৯০১	১৫৩৫	৩৬৬	৭২৫	৪৫৭	২৬৮
৭		জাতীয় খাদ্য নীতি ও সিআইপি পরিবীক্ষন	০	০	০	০	০	০
৮		উন্নত সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৩২৩	৫৮	২৬৫	১০৮	৩৭	৭১
৯		কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী	৪৪৮	৩৪৩	১০৫	২২৭	২১৩	১৪
		খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ	**২৬৭২**	**১৯৩৬**	**৭৩৬**	**১০৬০**	**৭০৭**	**৩৫৩**
১০	খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টি	২৯	২৬	৩	১৪	১৬	-১
১১		তথ্য ভিত্তিক খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ।	৪৭	৪	৪৩	৬৮	৯	৫৯
১২		নিরাপদ ও মান সম্পন্ন খাদ্য-ব্যবস্থা উন্নয়ন	৫	০	৫	৫	০	৫
		খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার	**৮১**	**৩০**	**৫১**	**৮৭**	**২৪**	**৬৩**
		মোট	**৫১৯১**	**৩৪৪৮**	**১৭৫৩**	**২১৩০**	**১৪০২**	**৭২৮**

৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছর পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগের অংশ হিসাবে ২১০ টি চলমান প্রকল্পে ৪.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন চাহিদা নির্ধারিত রয়েছে। যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ ১.৪০

বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিনিয়োগ ০.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলমান প্রকল্প বাজেট চাহিদা বিভাজনের হিস্যায় ৪৬.১৫% খাদ্যের লভ্যতা, ৪৯.৭৭% খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং ৪.০৮% খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত রয়েছে (সারণী ৩৭)। লক্ষণীয় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছর পরবর্তী সময়ের জন্য নির্ধারিত বাজেট চাহিদায় খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বরাদ্দের হিস্যা বেশ অপর্যাপ্ত। যদিও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার খাতে মোট বাজেট বরাদ্দের হিস্যা (৪.০৮%) ভিত্তি-বছরের বরাদ্দের হিস্যা (৩.০%)-এর তুলনায় সামান্য বেশী। এ ধারা নির্দেশ করে যে, দেশে পুষ্টি-সংবেদনশীল এবং পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা বিশেষত: ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সিআইপি-তে বর্ধিত অর্থায়নের মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৭.৪. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়ন অংশীদারদের অবদান

লেখচিত্র ৪৩-তে সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অর্থায়নে যে অবদান রেখেছে তার বিবরণ প্রদর্শিত হয়েছে। সর্বাধিক বিনিয়োগ করেছে এমন ৫টি সংস্থার মধ্যে - বিশ্বব্যাংক, চীন, আইডিএ, আইডিবি এবং ডিএফআইডি এর মধ্যে একমাত্র বিশ্বব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন সংস্থা 'খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার' সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে কোন বিনিয়োগ করেনি। এছাড়া জাইকা, ইউএসএআইডি, ইউনিসেফ তাদের বিনিয়োগের নগন্য অংশ খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার খাতে বিনিয়োগ করেছে। আইডিএ নেদারল্যান্ডস, ডব্লিওএইচও, ইউএনএফপিএ, ইউনিসেফ, ইইউ সংস্থাসমূহ জৈবিক ব্যবহার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের শীর্ষাবস্থানে রয়েছে। শীর্ষ বিনিয়োগকারী ৫টি সংস্থার মধ্যে চীন তাদের বিনিয়োগের পুরো অর্থই বিনিয়োগ করেছে খাদ্য লভ্যতার ক্ষেত্রে। আইডিএ তাদের বিনিয়োগের ৮২% ই বিনিয়োগ করছে লভ্যতার ক্ষেত্রে বাকী ১৮% প্রাপ্যতায়। এছাড়া ডাব্লিওএফপি বিনিয়োগের সিংহভাগ বিনিয়োগ করেছে প্রাপ্যতায়।

দ্বিতীয় শীর্ষ বিনিয়োগকারী ৫টি দেশের মধ্যে ডিএফআইডি তাদের বিনিয়োগের শতভাগই বিনিয়োগ করেছে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ক্ষেত্রে। জাইকা ৮৪% খাদ্য লভ্যতা এবং ১৫% খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং মাত্র ১% খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে। ইফাদ, এডিপি এবং আইডিএ নেদারল্যান্ড ১০০% অর্থায়ন করেছে লভ্যতার ক্ষেত্রে। এবং ইউএসএআইডি ৯% লভ্যতা ৭৪% প্রাপ্যতায় এবং ১৭% খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার খাতে বিনিয়োগ করেছে। ইউএনডিপি, নেদারল্যান্ড, চীন, ড্যানিডা ভারত নিবিড়ভাবে খাদ্য লভ্যতা, আইডিএফ, ইতালি, এসডিএফ খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে এবং সিডা, ইইউ, ইউএনএফপিএ, এফএও, ইউনিডো, ইউনিসেফ খাদ্যের জৈবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে বিনিয়োগ করেছে। সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী সংস্থা হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, যার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ৫৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া, চীন ও আইডিবি এর বিনিয়োগ ৪৭৯ ও ৪৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আইডিএ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৩৫২, ডাব্লিওএফপি এবং ডিএফআইডি ২৫৮ ও ২৪০ মি মিলিয়ন মার্কিন ডলার । জাইকা, ইফাদ,ইউএসএআইডি, এডিবি এদের বিনিয়োগ ১০০ থেকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে। এফএও, ইইউ, এসডিএফ,আইডিএফ,ইতালি,পিওওএল এবং এসডিসি এর বিনিয়োগ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নীচে। এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত অননুমোদিত ২০৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে সিংহ ভাগই অর্থাৎ ১৩৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৬৫%) সরকারি বিনিয়োগ হিসেবে পরিদৃষ্ট। বাকী ৭২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ৫০% এর উপরে বিশ্বব্যাংকের একক বিনিয়োগ রয়েছে। এছাড়া, উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে জাইকা, আইডিবি,ওএফআইডি এবং ইউএসএআইডি ।

লেখচিত্র ৪১ – এডিপি-এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সিআইপি-তে বিনিয়োগ

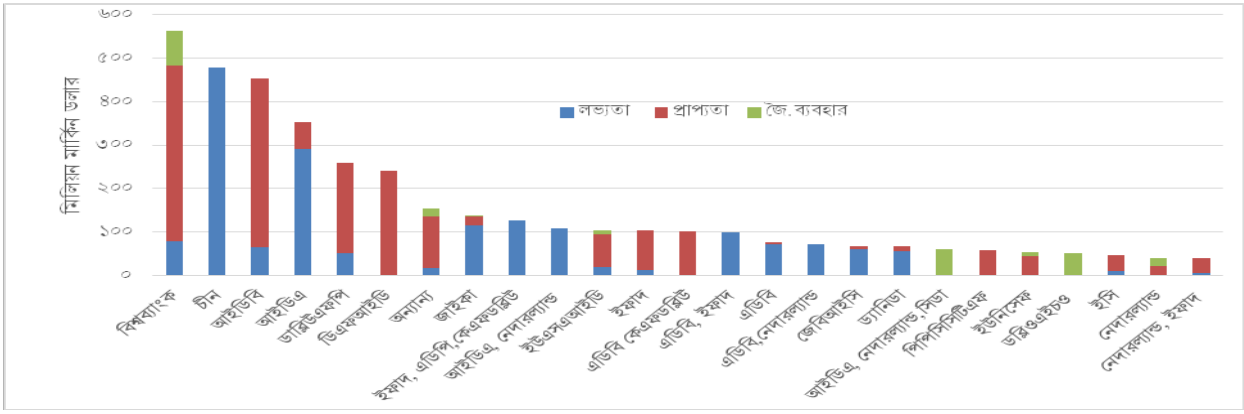

৭.৫. সুপারিশমালা

- **জুন ৩০ ,২০১৭ পরবর্তী সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিতে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান**

  ২০১৬/১৭ অর্থবছরে সিআইপিতে অন্তর্ভূক্ত ভবিষ্যতে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের সংখ্যা ৪৮ থেকে বেড়ে ২০১৭/১৮ অর্থবছরে ৫৯ হলেও গত অর্থবছরের মাত্র ১০টি প্রকল্প এবছর তালিকাভূক্ত হয়েছে। বাকী ৩৮টি প্রকল্প ২০১৭/১৮ অর্থবছরে এডিপিতে চলমান বা পাইপলাইন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। পূর্ববর্তী বছরের পাইপলাইনে অনুমোদনের অপেক্ষারত প্রকল্পকে প্রকৃত বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন প্রচেষ্টা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার ।

- **কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন**

  পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থব্যয়ের গতি কম ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১.৪৪ বিলিয়ন যা ২০১৬-১৭ তে হ্রাস পেয়ে ১.৪৩ বিলিয়নে নেমে এসেছে। ব্যয়ের গতি অতি দ্রুত উন্নতি না হলে নতুন প্রকল্প গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। সরকারী প্রকল্পের অর্থায়ন এবং বিনিয়োগের সুফল প্রাপ্তি ত্বরান্বিতকরণে ব্যয় বৃদ্ধিতে গতিশীলতা আনয়ন করা আবশ্যক।

- **নতুন ও পুরাতন সিআইপি-এর মধ্যে সেতুবন্ধন**

  ১ জুলাই ২০১০ থেকে ৩০শে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সিআইপি-এর ৪টি উপ-কর্মসূচি যেমন ৩.৪, ৪.৩, ৮.১ ও ৮.২ এর আওতাধীন কোন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়নি। অন্যান্য কতিপয় উপ-কর্মসূচি (যেমন ২.৩.,৪.২ , ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৪,৩. ৭.১, ৮.১, ১০.৩, ১১.২, ১১.৩ ও কোন প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়নি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের পরবর্তীকালে বাস্তবায়নের জন্য সিআইপি ২ এর সকল কর্মসূচি এবং উপকর্মসূচির আওতায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে প্রণীতব্য 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি'-এর সকল উদ্দেশ্য এবং এসডিজি'র সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। প্রকল্প গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

- **পুষ্টি সংবেদনশীল প্রকৃতির প্রকল্পসমূহ আরও বৃহত্তর পরিসরে প্রণয়ন**

  'খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার' সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান ভিত্তি-বছরের তুলনায় সাম্প্রতিককালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা নির্দেশ করে যে, খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রাপ্তির অনস্বীকার্য বিষয়টি শুধুমাত্র রাজনৈতিক আলোচ্য বিষয় থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে অর্থায়নের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়নে বিনিয়োগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পুষ্টি সংবেদনশীল হস্তক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে একটি আন্ত:খাত-ভিত্তিক বিষয় বিধায় 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা' সংক্রান্ত সকল (জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনা, এনপিএএন, সিআইপি ইত্যাদি) দলিলে সতর্কভাবে বিবেচনা করা দরকার। অধিকন্তু, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরেও উন্নয়ন সহযোগীদের পুষ্টিসংক্রান্ত কর্মসূচিতে বড় আকারের বিনিয়োগ রয়েছে। উক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সরকারের সাথে মত-বিনিময় করে এডিপি-এর মাধ্যমে পুষ্টিসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

৮. সার্বিক মূল্যায়ন এবং সুপারিশমালা

জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান করে। জাতীয় খাদ্য নীতি কর্ম-পরিকল্পনা ২০০৮ থেকে ২০১৫ সময়কালে এ কৌশলগুলোকে ২৬টি হস্তক্ষেপযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি); যা কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের একটি পথনির্দেশক যা খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১২ টি কর্মসূচি নির্দিষ্ট করে। জাতীয় খাদ্য নীতি ও কর্মপরিকল্পনায় যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ১.৪ এবং দ্বিতীয় অংশে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন কৌশল ও দায়িত্বাবলী সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৮.১. সার্বিক মূল্যায়ন

২০১৫ পরবর্তী আলোচ্যসূচিতে স্থানান্তর

জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য পুষ্টিহীনতা, শিশুর কম ওজন (underweight) এবং খর্বতা (stunting) কে নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অপুষ্টির নির্দেশক থেকে দেখায় যে, বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (১৭%) অর্জন করেছে, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১৬.৪%। শিশুর কম ওজন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হয়েছে। বিডিএইচএস প্রদত্ত তথ্যানুসারে ২০১৪ সালে এই নির্দেশকের হার ছিল ৩২.৬%। শিশুর খর্বতার ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান অগ্রগতি দেখা যায়, যা ১৯৯৬-৯৭ সময়ের ৬০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ৩৬% এ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু খর্বতার এই হার এখনও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্ব নিম্ন সীমা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মাত্রার থেকে বেশী। এক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য বহুখাত-ভিত্তিক উদ্যোগ এবং পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে জোরদার করা উচিত।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ৪টি নির্দেশক, যেগুলো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত আছে, তা থেকে দেখা যায় যে, কৃষিজ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩.৪% হলেও, তা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারি ব্যয় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি-এর ২.১৯% থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.০৯% এ হ্রাস পেয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩% এর তুলনায়ও কম। বর্তমান মূল্যে আর্থসামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট বরাদ্দ মনিটরিং সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্যের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে, যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০%, তা ২০১০ সালে হয়েছে ৩১.৫% এবং ২০১৬-১৭ সনে হয়েছে ২৪.৩%। মাথাপিছু দারিদ্র্য সূচক (poverty headcount index) অনুযায়ী ২০১৫ সালে দারিদ্র্যের হার ২৫% এ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ১ অর্জনের নির্দেশনা দেয়। কিলোগ্রাম প্রতি মোটা চালের হিসাবে জাতীয় মজুরির অনুপাত কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮.৫% হয়েছে, তবে তা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে।

সাম্প্রতিক দশকের অর্জনের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বর্তমানে ২০১৬-২০২০ সময়ের মধ্যে এসডিজি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের উপযুক্ত অবস্থানে আছে এবং এর লক্ষ্যসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে যা জাতীয় পরিকল্পনার অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়সমূহের সাথে সমন্বিত। বহুবিধ বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক আলোচনা এবং প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি বিষয়ক কার্যক্রমকে সংহত করবে, যা কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য খাত এবং পুষ্টির মধ্যে সংযোগ সাধন করে এবং নতুন খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ কাঠামোর প্রসারে সহায়তা প্রদান করবে।

কৃষিজ বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিতকরণ

বনজ সম্পদ বাদে কৃষিজ জিডিপি প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে, এর কারণ হচ্ছে শস্য খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া। পরিবীক্ষণ সময়ে ৩ বছর চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে চালের আমদানি নির্ভরশীলতা অর্ধেকের বেশী পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসে ২% হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে চালের বেসরকারি আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়েছে, যার প্রধান কারণ হচ্ছে ভারতীয় চালের নিম্ন মূল্য। চাল উৎপাদনের অস্থিতিশীলতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩.১% হয়েছে যা ২০১৩-১৪-তে ছিল ২.৮৬%। ১৯৯০ দশকের শেষ দিক থেকে বোরো চাল উৎপাদন ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আমন এবং আউশ উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি কে সমন্বয় করছে। খাদ্যশস্যের মূল্যের নিম্নগতি, চাল এবং গম উভয়ের

ক্ষেত্রেই হচ্ছে, এর কারণ হচ্ছে চাল উৎপাদনে মৌসুম ভালো ছিল এবং গমের আন্তর্জাতিক মূল্য কম ছিল। কৃষির আরও বহুমুখীকরণের নিদর্শন চলমান আছে, যেহেতু চাল ব্যতীত অন্যান্য শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন হয়েছে। খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন অনুশীলন এবং Save and Grow পদ্ধতি অবলম্বনে কৃষি উপকরণের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে চাল উৎপাদনের নিবিড়তা (intensification) বাড়ানো প্রয়োজন।

খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ টেকসই ও উন্নীতকরণ

চালের হিসাবে মজুরীর অনুপাত ইতিমধ্যে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, তবে তা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার উপরে ছিল। এর কারণ হচ্ছে, গত তিন বছরের গড় মজুরী সূচকের বৃদ্ধি একই সময়ের চালের মূল্যসূচক বৃদ্ধির তুলনায় কম ছিল। গত এক দশকে কৃষিতে বর্তমান মূল্যে মজুরির হার তিনগুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে দৈনিক ৭৯ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দৈনিক ২৮৭ টাকায় উন্নীত হয়েছে। পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় ২০০০-২০১০ দশকে আয় দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে, তবে স্থান ভেদে এই হ্রাসের তারতম্য রয়েছে। মাথাপিছু আয়ের ধীর-বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হারের সন্তোষজনক হ্রাস অবশ্য আয় বৈষম্য হ্রাসে আশানুরূপভাবে প্রতিফলিত হয়নি। জানুয়ারি থেকে জুন ২০১৫ মাসে পর্যন্ত সার্বিক মূল্যস্ফীতি এবং খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি তুলনামূলকভাবে স্থির দেখা গেছে, এবং তা ৬%-এর সামান্য উপরে ছিল। যা সাধারণ ভোক্তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিল।

পুষ্টি ফলাফলে খাদ্য বৈচিত্র্য উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধির প্রভাব

মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে, কিন্তু তা দারিদ্র্য হ্রাসের সমহারে হচ্ছে না। পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং WASH কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অ-শস্য খাদ্যের ভোগ, যার মধ্যে রয়েছে প্রাণিজ উৎসের খাবার, শাকসবজি এবং ফলমূল, ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে মহিলা, কিশোরী, এবং শিশু ও কিশোর ফিডিং-এ খাদ্য-বৈচিত্র্যর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। পুষ্টি এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়। পুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভালো ফলাফলের জন্য পুষ্টি সুনির্দিষ্ট ও পুষ্টি সংবেদনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

সিআইপি-এর কার্যক্রম ও অর্থায়ন পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ

২০১০ সালের জুলাই থেকে শুরু করে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সাত বছর সময়ে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহে মোট বাজেট চাহিদা নির্ধারিত হয়েছে ১৭.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৬৪.৭৯% (১১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) অর্থায়ন সম্পন্ন করে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত ৫০৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নের হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৬৫%ও ৩৫%। অবশিষ্ট ৬.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ চাহিদা সম্পন্ন ২১০টি প্রকল্প চলমান (২১০টি অনুমোদিত প্রকল্প) অথবা অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন (৫৯টি পাইপ-লাইন প্রকল্প) পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি আঙ্গিক, যথা - খাদ্য লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ এবং খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিআইপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাজেট বিভাজনের হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭.৫%, ৪৮.৮% এবং ৩.৭%। এক্ষেত্রে এক বছর পূর্বে অর্থাৎ বিগত ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাজেটে উক্ত বিভাজন ছিল যথাক্রমে ৪৬.৬%, ৫০.৬% এবং ২.৮%। উল্লেখ্য, সিআইপি-এর ভিত্তি বছরে আঙ্গিক-ওয়ারী প্রত্যাশিত বাজেট বিভাজন ছিল যথাক্রমে ৫১.০%, ৪০.০% ও ৯.০%। বর্তমান ও ভিত্তি-বছরের আঙ্গিক-ওয়ারী বাজেট বিভাজনে পার্থক্য নির্দেশ করে যে, খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে প্রত্যাশিত অগ্রাধিকার বাস্তব ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত হয়নি, বিশেষত: পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত 'খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহার'-এর ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

সিআইপি বিশ্লেষণ থেকে নিম্নবর্ণিত উপসংহার পাওয়া যায়:

- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে বর্ধিত হারে বিনিয়োগ বজায় রাখা প্রয়োজন;
- কার্যক্রমের সুফল পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও সঞ্চালনের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন;
- শ্লথ অগ্রসরমান ও পিছিয়ে পড়া ক্ষেত্রসমূহে নজর দেয়া প্রয়োজন ; এবং
- পুষ্টি-কেন্দ্রিক ও পুষ্টি-সংবেদনশীল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।

৮.২. সার্বিক সুপারিশমালা

জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রের উন্নয়নকে উৎসাহিত করছে, একই সাথে টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং শস্যখাতে চাল থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কৃষির বহুমুখীকরণও উৎসাহিত হচ্ছে। বর্তমান বছরগুলোতে নিরাপদ কৃষি দ্রব্যের বিষয়টি সারাদেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যাতে কৃষি দ্রব্যের মান উন্নয়ন এবং কৃষিজ উৎপাদনের উৎপত্তি তথ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন অনুশীলন ও কৃষি উপকরণের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে চাল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষির বহুমুখীকরণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ফসল কর্তন পরবর্তী সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষুদ্র খামারিদেরকে বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়ার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন, তাদেরকে চাহিদা-ভিত্তিক সহায়তা এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, যার মধ্যে বীমা এবং কৃষিঋণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশ হচ্ছে নদী খনন (ড্রেজিং), জলাবদ্ধতা দূর করা, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, সেচ কাজে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, সৌর-বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং কম পানি ব্যবহার হয় এমন শস্যের উৎপাদন বাড়ানো।

মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং খামার পর্যায়ে তার সরবরাহ উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনাকে জৈব ব্যবস্থাপনার সহিত সমন্বিত করা দরকার। জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যনীতি উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দরিদ্রতা লাঘব করবে এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করবে এবং তা সামুদ্রিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সিআইপি পরিবীক্ষণ সময়কালে মাংস, দুগ্ধ ও ডিম উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এ বৃদ্ধির ধারা চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রাণির টিকাদান কর্মসূচি বৃদ্ধি, চিকিৎসা সেবা এবং প্রজনন মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। জ্ঞান সহায়তা এবং প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাণি-সম্পদের উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা দরকার।

কর্মসূচি-১: গবেষণা এবং সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে কৃষিকে টেকসই ও বহুমুখীকরণ

- কৌলি-তাত্ত্বিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- পুষ্টি উন্নয়নে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজের আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা;
- মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত কারণে অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উন্নয়নে অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ।

কর্মসূচি-২: সেচ কাজের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন

- জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত কারণে অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উন্নয়নে অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ;
- সেচ কার্যে ভূ- উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- উপকূলীয় অঞ্চলের পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেজ হালনাগাদ (এনডব্লিউআরডি) অব্যাহত রাখা;
- নদীর গতিপথ ও পানি-প্রবাহ অব্যাহত রাখা; এবং
- হাওর এবং জলাভূমির সার্বিক ও টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।

কর্মসূচি- ৩: কৃষি উপকরণের মান উন্নয়ন

- খামার পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি**করণ;**
- আইপিএম (IPM) এর মাধ্যমে শস্যের রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;
- যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিনিয়োগের জন্য ঋণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- উচ্চ-ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ।

কর্মসূচি - ৪: মৎস্য ও মৎস্য চাষ উন্নয়ন

- প্রধান প্রধান মাছের উন্নত জাতের পোনা সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য-পুষ্টি নিরাপত্তায় ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভিটামিন;এ ঘাটতি পূরণ-
- সামুদ্রিক মাছের সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন ;
- প্রজননের মাধ্যমে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ;
- মাছের অভয়ারণ্য বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র্য সুরক্ষা-বৃদ্ধিকরণ;

- মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণএবং ;
- মৎস্যচাষে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকর-ণ।

কর্মসূচি - ৫: হাঁস-মুরগী ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণি-সম্পদের উন্নয়ন

- সম্মুখ এবং পশ্চাৎ যোগসূত্র)backward and forward linkage (শক্তিশালীকরণ;
- প্রাণিসম্পদ পণ্য উন্নয়ন ও এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- চামড়ার গুণগত মান উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ;
- দুগ্ধজাতীয় দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে স-হায়তা প্রদান;
- গুণগত মানের জাত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠাকরণএবং ;
- বিপণন চেইন পাওয়ার নিশ্চয়তা বৃদ্ধিকরণ।

জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য ২: খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি

নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে জনসাধারণের খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের অগ্রগতির সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, চাল-ভিত্তিক মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্য মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ ও বিতরণের মাধ্যমে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি চলমান রয়েছে। সাধারণ মূল্যস্তর ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ন্যায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল, যার মূলে রয়েছে বিশ্বব্যাপী জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়া। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শক্তিশালী জীবন-যাত্রার মান, ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষক ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে মূল্য ব্যবধান হ্রাস এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা। যদিও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, এখনও দেশে ৩৭.৮ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্য-সীমার নীচে রয়ে গেছে। আয় বৈষম্যের সামান্য অগ্রগতি হয়েছে যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুবিধা পাচ্ছে না। জনসাধারণের, বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের, খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তির সুযোগ ও সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কিছু বিশেষ বিষয়ে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। এবিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে আয় বৈষম্য, পল্লী এলাকায় খামার-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, জনসাধারণের খাদ্যের অধিকার বিষয়ক উদ্যোগকে বৃদ্ধি করা, মৌসুম-ভিত্তিক, স্থান-ভিত্তিক ও লক্ষ্য-ভিত্তিক দুর্দশাগ্রস্ত, লোকদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সম্প্রসারণের সংযোগ স্থাপন করা অন্যতম।

কর্মসূচি - ৬: বাজারে প্রবেশের সক্ষমতা, কৃষিতে মূল্য সংযোজন এবং খামার বহির্ভূত আয় বৃদ্ধি

- খামার-গেট এবং খুচরা পর্যায়ের মূল্য ব্যবধান হ্রাসকরণ;
- খাদ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি ও অপচয় হ্রাসকরণ;
- গ্রামীণ পরিবহণ ও বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন ;
- কৃষি খাতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মজুরীর পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কৃষি কর্মসংস্থান উৎসাহিত প্রদান;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ; এবং
- কৃষক সংগঠনগুলির দর-কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

কর্মসূচি - ৭: জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা ও সিআইপি বাস্তবায়নের ও পরিবীক্ষণের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

- নীতি, কর্মপরিকল্পনা এবং কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- নতুন নীতি এবং সিআইপি বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; এবং
- নীতি বিষয়ক দিক-নির্দেশনা ও নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সরবরাহ শক্তিশালীকরণ।

কর্মসূচি - ৮: উন্নত সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- সরকারি খাতে-মান সম্পন্ন খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ ত্বরান্বিতকরণ;
- সরকারি সংগ্রহ কর্মসূচির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য মজুদ পরিবীক্ষণ উন্নতকরণ;
- কার্যকর পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং খাদ্য তথ্য-ব্যবস্থা প্রণয়ন; এবং
- নতুন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের (NSSS) সাথে PFDS ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সাধন।

কর্মসূচি- ৯: অধিকতর কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং সার্বিক দক্ষতার উন্নয়ন

- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের সঙ্গে নগদ এবং খাদ্য-ভিত্তিক কর্মসূচির সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ;
- বাজার-তাড়িত উদ্যোগসহ ক্ষুদ্র/মাঝারি শিল্প সম্প্রসারণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; এবং
- পুষ্টি সমন্বিত খাদ্য-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণে গুরুত্ব বৃদ্ধিকরণ।

জাতীয় খাদ্য নীতি উদ্দেশ্য ৩: খাদ্যের ব্যবহার ও পুষ্টি

মহিলা, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে খাদ্য বৈচিত্র্যের মাধ্যমে শস্য-বহির্ভূত খাদ্য, যেমন: প্রাণিজ খাদ্য, শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদির ভোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আরও বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বৈচিত্র্যপূর্ণ সুষম খাদ্যের গ্রহণ গ্রামীণ ও শহুরে সকল মানুষের মধ্যে বিস্তার ঘটানোর জন্য খাদ্য-ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক। অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ছাড়াও যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে অথবা পুষ্টি সংক্রান্ত যে সকল উপাদান, উপকরণ এবং বার্তা রয়েছে, যা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পুষ্টি কর্মসূচি ও সেবায় ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে মিল এবং সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। বিষয়ভিত্তিক গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয় করতে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে খাদ্য বৈচিত্র্যর বিষয়টি প্রচার এবং এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বাড়ানো দরকার। অসংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা দরকার যাতে উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে স্বাস্থ্য ব্যয় কমানো যায়। সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রের একটি সাধারণ জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ও খাত-ভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি-নীতি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। দেশের জন্য একটি যথার্থ খাদ্য ও পুষ্টি পরিকল্পনাকে সহযোগিতার জন্য জাতীয়ভাবে পুষ্টি জরিপ করা আবশ্যক। নিরাপদ খাদ্য বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয় এবং এ সমস্যা দূরীকরণে 'নিরাপদ খাদ্য আইন' সারা দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

কর্মসূচি - ১০: কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম এবং সেবাসমূহ

- ঢাকা শহরের বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণের উপর জোরদারকরণ;
- দেশব্যাপী দুগ্ধপোষ্য ও কম বয়সী শিশু-খাদ্যের কর্মসূচি (IYCF Programmes) প্রচার বৃদ্ধিকরণ;
- মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতে পুষ্টি সংবেদনশীল কৌশল সম্প্রসারণ, বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়ন জোরদারকরণ;
- সেবা-দানকারীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সহযোগিতা প্রদান;
- খাদ্যে পুষ্টি-সমৃদ্ধকরণের উদ্যোগ জোরদারকরণ;
- পুষ্টি বিষয়ক এক দশকের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ;
- দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনের ঘোষণা এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ; এবং
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি সমূহের সংকলন ও হালনাগাদকরণ।

কর্মসূচি – ১১ : তথ্যভিত্তিক খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ে নতুন সেক্টরাল পরিকল্পনা HNPSIP (২০১৬-২০২১) বাস্তবায়ন;
- বিসিসি-র ব্যবধান (gap) কমাতে কৌশল প্রতিষ্ঠাকরণ;
- খাদ্যের পুষ্টিমানের সারণী এবং খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;

- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থায় বিরাজমান বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন; এবং
- পুষ্টির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং সমন্বয়ের উৎকর্ষ সাধন।

কর্মসূচি-১২ : নিরাপদ খাদ্য ও গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১) যথাযথ বাস্তবায়ন;
- নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রবিধানমালা অনুমোদনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ;
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- বাজারে সরবরাহকৃত খাদ্যের নিরাপদ মান নিশ্চিতকরণ;
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডায়রিয়ার প্রকোপ হ্রাসকরণ; এবং
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য-শৃঙ্খলের সকল স্তরের সামর্থ্য (capacity) শক্তিশালীকরণ।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্রসমূহ (END NOTES REFERENCES)

১. FPMU (২০১৫). Roadmap for the National Food Policy Plan of Action and Country Investment Plan Monitoring Report ২০১৬. Food Planning and Monitoring Unit (FPMU), Ministry of Food (MoFood). ১৫ October ২০১৫

২. The FPMC is chaired by the Minister of Food and includes the following: Ministers for Finance, Commerce, Agriculture, Local Government, Rural Development and Cooperatives, Disaster Management and Relief; Secretaries of the Cabinet Division, Internal Resources Division, Finance Division, Statistics and Informatics Division, Food, Women and Children Affairs, Disaster Management and Relief, Health and Family Welfare, Agriculture, and Fisheries and Livestock. Director General FPMU acts as the Member-Secretary of the Committee and FPMU provides secretarial support.

৩. The NC is chaired by the Minister for Food and includes the following: Secretaries from the Ministry of Finance (Finance and Economic Relations Divisions), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Ministry of Agriculture (MoA), Ministry of Fisheries and Livestock (MoFL), Ministry of Water Resources (MoWR), Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR), Ministry of Food (MoFood) and IMED; members from the Planning Commission (General Economics Division and Agriculture, Water Resources and Rural Institutions Division); and the Vice Chancellor of Bangladesh Agricultural University (BAU), Executive Chairman of the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), President of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, Mission Director of United States Agency for International Development (USAID), Representative of FAO, Director General of the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Country Director of the World Bank and Chief of Party of the International Food Policy Research Institute (IFPRI).

৪. The FPWG is chaired by the Secretary of MoFood and consists of representatives from the Planning Commission (General Economics Division, Socio-economic Infrastructure Division and Agriculture, Water Resources and Rural Institutions Division), Ministry of Finance (Finance Division and Economic Relations Division), IMED, and FPMU, MoFood.

৫. Annex ২ provides the structure and list of ministries and agencies participating in the TTs.

৬. Prevalence estimates for underweight are based on the ২০০৬ WHO reference standards.

৭. The MDG-১ underweight target is based on the ২০০৬ WHO standard. Before this was established, the National Centre for Health Statistics (NCHS) standard was used in ১৯৯০ to set the MDG underweight target at ৩৩%. The NCHS results in higher levels of underweight and lower levels of stunting than the WHO standard.

৮. Prevalence estimates for stunting are based on the ২০০৬ WHO reference standards.

৯. Revised ২০১৬ Health, Population and Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) target.

১০. The agricultural GDP includes crop, horticulture, fishery and animal products, but excludes forestry.

১১. The definition of social protection used here includes cash and non-cash transfers, microcredit and programmes for social empowerment – and it corresponds to the broadest definition used by the Ministry of Finance (MoF), called “Social Protection and Empowerment” in budgetary reports, and corresponds to the definition used in the ৬FYP, pp.১৬২-১৬৩.

১২. PoU is defined as the number or fraction of people whose dietary energy intake is below the threshold Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) for their age, sex and height.

১৩. FSIN (২০১৬). Measuring Food Security and Nutrition: An Independent Technical Assessment and User’s Guide for existing Indicators. Food Security Information Network (FSIN), Technical Working Group on Measuring Food and Nutrition Security

১৪. FAO, IFAD and WFP (2015). The State of Food Insecurity in the World 2015. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress. Rome, FAO.

১৫. Headey, D. (2015). The other Asian enigma: Explaining the rapid reduction of undernutrition in Bangladesh [Policy Brief]. (2015) 4 pp. [LANSA Policy Brief, Issue 1].

১৬. As per the WHO thresholds for assessing severity of malnutrition among children under ৫ years of age, high prevalence ranges of public health significance in percent are: stunting ৩০-৩৯, underweight ২০-২৯, and wasting ১০-১৪.

১৭. GED (2015a). Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015. General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka. September, 2015.

১৮. HIES-BBS 2016 Preliminiary Report, BBS.

১৯. FPMU (২০১৩). Strengthening the impact of poverty reduction on nutrition. [FPMU/NFPCSP Policy Brief, Issue ৯]. Food Planning and Monitoring Unit, Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh. April ২০১৩ (also available at www.fpmu.gov.bd).

২০. It is a ৩-year moving average of the ratio between (imports) and (net production + imports – export).

২১. Measured by the coefficient of variation of the difference between annual production and its ১০-year rolling linear trend.

২২. Rice production instability is measured by the coefficient of variation of the difference between production and rolling linear trend over a ১০-year period.

২৩. As the trend has changed every year, inclusion of ২০১৪/১৫ which had a higher production and exclusion of ২০০৪/০৫ which had a historical lower production creates higher deviation from new trend during ২০০৫/০৬-২০১৪/১৫.

২৪. Merchandise trade statistics record all goods which add to or subtract from the stock of material resources of a country by entering (imports) or leaving (exports) its economic territory".
২৫. FAO (২০১১). Save and Grow: A policymakers' guide to the sustainable intensification of smallholder crop production.
২৬. FAO (২০১০). Agricultural value chain development: Threat or opportunity for women's employment? Gender and Rural Employment Policy Briefs #৪.
২৭. Kreft, S., Eckstein, D., Dorsch, L. and Fischer, L. (২০১৫). Global Climate Risk Index ২০১৬ – Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-related Loss Events in ২০১৪ and ১৯৯৫ to ২০১৪. Germanwatch e.V. (also available at www.germanwatch.org/en/cr).
২৮. According to the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (২০০৯), more than ১০ billion USD was invested over the period ১৯৭৪-২০০৯. [MoEF (২০০৯). Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan. Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh (also available at www.climatechangecell.org.bd)].
২৯. MoF (২০১৪). Bangladesh Climate Fiscal Framework. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka. June ২০১৪.
৩০. FAO (২০১৪). State of World's Forests ২০১৪: Enhancing the socioeconomic benefits from forests. Rome, FAO.
৩১. Thirteen percent of land is covered by forestry, with ৭০% of tree density. [GED (২০১৫b). Seventh Five Year Plan ২০১৬-২০২০: Accelerating Growth, Empowering Citizens. General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka. December ২০১৫].
৩২. World Bank (২০১৩). op. cit.
৩৩. BBS (২০১১). Report of the Household Income and Expenditure Survey ২০১০. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning. Dhaka, December ২০১১.
৩৪. World Bank (২০১৩). op. cit.
৩৫. ~~GED (2015a). op. cit.~~
৩৬. MoF (২০১৫a). Bangladesh: Socioeconomic Progress. Finance Division, Ministry of Finance. Government of Bangladesh. Dhaka, September ২০১৫.
৩৭. Pramanik, S., Deb, U. and Bantilan, C. (২০১৪). Rural Non-farm Economy in Bangladesh: Nature, Extent, Trends and Determinants. Paper presented at the ৮th Conference of the Asian Society of Agricultural Economists, held on ১৫-১৭ October ২০১৪ at the BRAC Centre for Development Management, Savar, Dhaka.
৩৮. BIDS (২০১৪a). Growth of Rural Non-farm Activities in Bangladesh. Implications for Household Income and Employment. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS). Policy Brief No. ১৪০৪, April ২০১৪.
৩৯. Faruque, A. (২০১৪). From Basic Need to Basic Right: Right to Food in Context. A study prepared for National Human Rights Commission of Bangladesh, Dhaka. June ২০১৪ (available at www.nhrc.org.bd).
৪০. BLAST and RtF&SS (২০১৫). The Right to Food: Legal Protection in Bangladesh. Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) Campaign for Right to Food & Social Security (RtF&SS). May ২০১৫. Dhaka, Bangladesh (also available at www.blast.org.bd).
৪১. Inaugural speech by the Prime Minister Sheikh Hasina in the South Asian Right to Food Conference held in Dhaka on ৩০ May ২০১৫.
৪২. Media reports quite often allege that in times of natural disasters, many needy people are not properly reached, and the coverage and magnitude of benefits remain inadequate.
৪৩. GED (২০১৫c). National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh. General Economics Division, Planning Commission, Government of Bangladesh. Dhaka, July ২০১৫ (also available at www.plancomm.gov.bd/nsss).
৪৪. A previously developed nine-item (food groups) scale questionnaire has been used to ascertain the quality of a woman's diet in light of her nutritional needs and validated for women in Bangladesh. This scale has been revised to include ten-item food groups since July ২০১৪.
৪৫. WHO, UNICEF, USAID, AED, UCDAVIS, IFPRI (২০০৮). Indicators for assessing infant and young child feeding practices: conclusions of a consensus meeting held ৬-৮ November ২০০৭ in Washington D.C., USA. World Health Organization (WHO) ২০০৮. (available at www.who.int/nutrition/publications).
৪৬. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, and ICF International (২০১৫). Bangladesh Demographic and Health Survey ২০১৪: Key Indicators. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT, Mitra and Associates, and ICF International.
৪৭. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, and ICF International (২০১৩). Bangladesh Demographic and Health Survey ২০১১. Dhaka, Bangladesh and Calverton, Maryland, USA: NIPORT, Mitra and Associates, and ICF International.
৪৮. NIPORT (২০১৪). Utilization of Essential Service Delivery Survey ২০১৩, Provisional report. National Institute of Population Research and Training (NIPORT).
৪৯. WHO (২০১১). Keeping promises, measuring results: Commission on information and accountability for women's and children's health. Geneva, Switzerland: WHO.
৫০. These are varieties produced by BARI, BINA and Universities, approved by Seed Certification Agency (SCA).
৫১. An inbred rice variety is the result of a cross between two or more different varieties and subsequent selection through several cycles of self-pollination or inbreeding. Normally, each rice flower contains both male and female organs. This allows the plant to reproduce itself through

self-pollination or inbreeding. A hybrid is the product of a cross between two genetically distinct rice parents. When the right parents are selected, the hybrid will have both greater vigour and yield than either of the parents.

৫২. Hossain M, Jaim WMH, Paris TR, Hardy B, editors (২০১২). Adoption and diffusion of modern rice varieties in Bangladesh and eastern India. Los Baòos (Philippines): International Rice Research Institute.

৫৩. Ahman, R. (২০১৫, October ০৮). Bangladeshi scientists ready for trial of world's first 'Golden Rice'. Production of the vitamin A enriched rice to start soon. Retrieved from www.thedailystar.net.

৫৪. BAU developed one aromatic hybrid rice variety (BAU Hybriddhan-১) and one garlic variety (BAU Garlic-৩) under NATP. [BIDS (২০১৪b). Impact Evaluation Study of National Agricultural Technology Project (NATP) Phase I. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS). Carried out by Evaluation Sector of Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED), Ministry of Planning. June ২০১৪].

৫৫. Nnoung, A.M., and Burton, E.S. (২০১৬). Major Institutions providing extension/advisory services in Bangladesh. Global Forum for Rural Advisory Services. Retrieved from www.g-fras.org.

৫৬. MoA (২০১৫). Annual report ২০১৪-২০১৫. Ministry of Agriculture (available at www.moa.gov.bd).

৫৭. In ২০১৪/১৫, area under maize, pulses, oilseeds, potato, spices and vegetables increased by ৫.৯%, ৭.৫%, ৫.৭%, ২.০%, ৮.১% and ৬.৬%, respectively, over ২০১৩/১৪.

৫৮. NARS consists of its apex body the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and ১০ agricultural research institutes e.g. Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), Bangladesh Jute Research Institute (BJRI), Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA), Bangladesh Sugarcane Research Institute (BSRI), Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI), Bangladesh Fishery Research Institute (BFRI), Soil Resource Development Institute (SRDI), Bangladesh Forest Research Institute (BFoRI), and Bangladesh Tea Research Institute (BTRI). For BTRI, financial data were not available.

৫৯. Rahman, S. and Salim, R. (২০১৩). Six Decades of Total Factor Productivity Change and Sources of Growth in Bangladesh Agriculture (১৯৪৮–২০০৮). Journal of Agricultural Economics, ৬৪: ২৭৫–২৯৪.

৬০. BIDS (২০১৪b). op. cit.

৬১. Yosef, S., Jones, A.D., Chakraborty, B., Gillespie, S. (২০১৫). Agriculture and Nutrition in Bangladesh: Mapping Evidence to Pathways. Food and Nutrition Bulletin ২০১৫, Vol. ৩৬(৪) ৩৮৭ ৪০৪.

৬২. Agriculture Sector Development Strategy: background paper for preparation of the ৭FYP (available at www.plancomm.gov.bd).

৬৩. GED (২০১৫b). op. cit.

৬৪. Md Siddique (২০১৫, July ৩০). The 'ZERO COST' Extension Model. Retrieved from wp.ekrishok.com.

৬৫. MoA (২০১৫). op. cit.

৬৬. LCGB (২০১৪, March ২). Brief write up on NATP: Phase I. Local Consultative Groups in Bangladesh (LCGB). Retrieved from www.lcgbangladesh.org.

৬৭. BIDS (২০১৪b). op. cit.

৬৮. MoA (২০১৫). op. cit.

৬৯. Ibid.

৭০. GED (২০১৫b). op. cit.

৭১. Ibid.

৭২. ADB (২০১৩). Bangladesh: Main River Flood and Bank Erosion Risk Management Program. (Financed by the Japan Fund for Poverty Reduction). Technical Assistance Consultant's Report prepared for Bangladesh Water Development Board by Northwest Hydraulic Consultants, Canada, in association with Resource Planning and Management Consultants Ltd., Bangladesh (available at www.adb.org).

৭৩. MoWR (২০১৫ & ২০১৪). Annual reports for ২০১৪-২০১৫ and ২০১৩-২০১৪. Ministry of Water Resources (MoWR), Government of the People's Republic of Bangladesh (available at mowr.portal.gov.bd).

৭৪. BADC (২০১৩). Minor irrigation survey report ২০১২-২০১৩. Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC), Ministry of Agriculture, Government of the People's Republic of Bangladesh.

৭৫. Qureshi, A.S., Ahmed, Z., Krupnik, T.J. (২০১৪). Groundwater management in Bangladesh: An analysis of problems and opportunities. Cereal Systems Initiative for South Asia Mechanization and Irrigation (CSISA-MI) Project, Research Report No. ২., Dhaka, Bangladesh: CIMMYT.

৭৬. GED (২০১৫b). op. cit.

৭৭. MoWR (২০১৫). op. cit.

৭৮. GED (২০১৫b). op. cit.

৭৯. MoA (২০১৫). op. cit.

৮০. Flanagan, S.V., Johnston, R.B., Zhenga, Y. (২০১২). Arsenic in tube well water in Bangladesh: health and economic impacts and implications for arsenic mitigation. WHO Bulletin: ৯০, ৮৩৯-৮৪৬.

৮১. FAO (২০০৬). Arsenic contamination of irrigation water, soil and crops in Bangladesh: Risk implications for sustainable agriculture and food safety in Asia. RAP publication ২০০৬/২০. Bangkok: FAO.

৮২. Ross, Z., Duxbury, J.M., DeGloria, S.D., Paul, D N.R. (২০০৬). Potential for arsenic contamination of rice in Bangladesh: spatial analysis and mapping of high risk areas. International Journal of Risk Assessment and Management, ২০০৬ Vol.৬, No.৪/৫/৬, pp.২৯৮ – ৩১৫.

৮৩. Qureshi, A.S. et.al. (২০১৪). op. cit.

৮৪. Biswas, A.K. (২০১৫, September ৫). Integrated coastal zone management in Bangladesh. Environmental Web Portal. Retrieved from www.bdenvironment.com.

৮৫. Rahman, M.M., Giedraitis, V.R., Lieberman, L.S., Akhtar, T., TaminskienĘ, V. (২০১৩). Shrimp Cultivation with Water Salinity in Bangladesh: The Implications of an Ecological Model. Universal Journal of Public Health ১(৩).
৮৬. GoB (২০০৫). Coastal zone policy. Ministry of Water Resources. Government of Bangladesh.
৮৭. Alauddin, Md., Biswas J. (২০১৪). Agricultural Credit in Bangladesh: Present Trend, Problems and Recommendations. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.৫, No.২৭, ২০১৪.
৮৮. Bowen, W. (২০০৫). Urea Deep Placement as an Option for Increasing Nitrogen Efficiency. Presentation prepared for Rice-Wheat Consortium Meeting, Dhaka Bangladesh.৬-৮ February ২০০৫. Retrieved from www.betuco.be.
৮৯. Haque, S.A. (২০০২). Urea super granule point placement on potato: a new concept. Symposium #১৪, Paper #২০৩০, poster presentation. ১৭th World Congress of Soil Science (WCSS), held ১৪-২১ August ২০০২ in Bangkok, Thailand.
৯০. Sikhdar, R. and Xiaoying, J. (২০১৪). Urea Super Granule as key conductor in agricultural productivity development in Bangladesh. Developing Country Studies, Vol. ৪., No. ৬.
৯১. Palma, P. (২০১৩, September ২১). Aid for farmers, pride for country. Fertilizer applicator invented by Bangladeshi scientist lessens farmers' pain; getting popular in several African countries. Retrieved from www.thedailystar.net.
৯২. FAO Asia Regional IPM/Pesticide Risk Reduction Programme (২০১৫, April). Facts and figures. Bangladesh National IPM Programme. Retrieved from www.vegetableipmasia.org.
৯৩. BB (২০১৬). Annual Report ২০১৪/১৫: Chapter-৯ Agricultural and Rural Finance pp৭৯-৮৭. Bangladesh Bank (BB).
৯৪. The project includes a two-step loan as well as a technical assistance component. The budget is ৯,৯৩০ million Yen from JICA and ৬৬০ million taka from GoB. As of June ২০১৫, an amount of ৩.২ billion taka was refinanced against ৪৩৬ enterprises.
৯৫. Lewis, D. (১৯৯৭). Rethinking aquaculture for resource-poor farmers: perspectives from Bangladesh. Food Policy, Vol. ২২: pp ৫৩৩-৫৪৬.
৯৬. GoB (১৯৯৮). The Fifth Five Year Plan (১৯৯৭-২০০২). General Economics Division, Ministry of Planning, Government of Bangladesh (also available at www.plancomm.gov.bd).
৯৭. Alam, M.F. and Thomson, K.J. (২০০১). Current constraints and future possibilities for Bangladesh Fisheries. Food Policy, Vol. ২৬, pp২৯৭-৩১৩.
৯৮. Mia, M.S. (২০১৫). Climatic and anthropogenic factors changing spawning pattern and production zone of Hilsha fishery in the Bay of Bengal. Weather and Climate Extremes ৭ (২০১৫) ১০৯-১১৫.
৯৯. Zaher, M. (২০১৫). Role of BFRI in Technology Generation: Recent Achievement and Future Plan In Sankalan National Fisheries Week ২০১৫, Fisheries Directorate, Ministry of Fisheries and Livestock, Dhaka.
১০০. Personal communication with Professor Mostofa A.R. Hossain, Department of Fish Biology and Genetics, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.
১০১. Ittefaq Report (2016, February 14). Earning from shrimp exports down by 19%. The Daily Ittefaq. Retrieved from www.clickittefaq.com.
১০২. Sumaila, U.R., Bellmann, C., Tipping, A. (২০১৪). Fishing for the Future: Trends and Issues in Global Fisheries Trade. E১৫ Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum, ২০১৪.
১০৩. DoF (২০১৫). Annual Report ২০১৪-১৫: Department of Fishery, Government of Bangladesh.
১০৪. WorldFish (২০১৫, September ২১). Equipping fish farmers with the knowledge and machinery to produce their own low-cost, quality fish feed is increasing the productivity of aquaculture in rural Bangladesh. Retrieved from www.worldfishcenter.org.
১০৫. Fiedler, J.L., Lividini, K., Drummond, E., Thilsted, S.H. (২০১৬). Strengthening the contribution of aquaculture of food and nutrition security: The potential of a vitamin A-rich, small fish in Bangladesh. Aquaculture, Volume ৪৫২, ১ February ২০১৬, pp. ২৯১-৩০৩.
১০৬. Ibid., p. ২৯১.
১০৭. Ibid., p. ৩০০.
১০৮. Apu, A.N., 2014. Bangladesh Small and Medium-scale Aquaculture Value Chain Development: Past Trends, Current Status and Likely Future Directions. Kenya, Nairobi (also available at www.value-chains.org).
১০৯. Global Food Security (২০১০, September). Community-based fisheries management in Bangladesh. Retrieved from www.foodsecurity.ac.uk.
১১০. MoFL (২০১৬). Annual report ২০১৪-১৫. Ministry of Fisheries and Livestock, Government of the People's Republic of Bangladesh.
১১১. Whitney (২০০৯, July ১৫). SMS reporting for avian flu in Bangladesh (www.avianflunetwork.blogspot.nl).
১১২. GED (২০১৫b). op. cit.
১১৩. Netherlands Enterprise Agency (accessed on 2016, March 6). Cattle and buffalo improvement in Bangladesh Retrieved from www.rvo.nl.
১১৪. GIZ (২০১২, February). GIZ in Bangladesh: Sustainable Energy for Development. Retrieved from www.giz.de/en.
১১৫. www.promotebdleather.net.
১১৬. LGED (২০১৫). Annual Report ২০১৪-২০১৫. Local Government Engineering Department (LGED), Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives (LGRDC), Government of Bangladesh.
১১৭. MoF (২০১৫b). Bangladesh Marches On. Finance Division, Ministry of Finance, Government of Bangladesh. Dhaka, September ২০১৫.

১১৮. MoF (২০১৫c). Budget Speech ২০১৫-১৬. Ministry of Finance, Government of of Bangladesh. ৪ June ২০১৫.
১১৯. BB (২০১৫). Annual Report (২০১৪-১৫), Bangladesh Bank (BB), Ministry of Finance. Government of Bangladesh, Dhaka.
১২০. MoF (২০১৫c). op cit.
১২১. Anecdotal evidences suggests that there exist some productivity difference between male and female workers for some of the agricultural operations.
১২২. BBS (২০১১). Report on Labour Force Survey ২০১০. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh. August ২০১১.
১২৩. Begum, F.S. (২০১৪). Gender Inequality and Womens' Empowerment: Suggested Strategies for the ৭th Five Year Plan. Prepared for General Economics Division, Planning Commission, Government of Bangladesh. Dhaka. December ২০১৪.
১২৪. MoF (২০১৫b). op cit.
১২৫. MoF (২০১৫c). op cit.
১২৬. Ibid.
১২৭. Ibid.
১২৮. Ahmed, A. et al. (২০১৬). op. cit.
১২৯. Akter, M. K. (২০১৫). Sector profile and strategic planning for agro-based food industry of Bangladesh. Bangladesh Textile Today. Vol. ৮(১), January ২০১৫.
১৩০. Khan, R.I. (২০১৪). Agro-based Industry of Bangladesh: Prospects and Challenges. IDCL Monthly Business Review. Vol. ১০(৩). March ২০১৪.
১৩১. BB (২০১৫). Annual Report (২০১৪-১৫). op cit.
১৩২. Alam, M. J., Akter, Sh., Begum, I.A. (২০১৪). Bangladesh's Rice Procurement System and Possible Alternatives in Supporting Farmer's Income and Sustaining Production Incentives. Research conducted through NFPCSP, FAO/MoFood. Dhaka.
১৩৩. FAO (২০১৪). Farmers' organizations in Bangladesh: A Mapping and Capacity Assessment. Bangladesh Integrated Agricultural Productions Project. FAO: Rome.
১৩৪. Additional resources mobilized for the CIP is calculated as the total of ongoing and completed projects as of June of each financial year.
১৩৫. Actual closing stock for fiscal year 'X' corresponds to opening stocks of 'X', plus domestic procurement and total import of year 'X', minus off-take of year 'X' as maintained at FPMU. This figure compares against the budget closing target as planned in the national budget document of the Ministry of Finance.
১৩৬. MFSFP (২০১৩). Modern Food Storage Facilities Project. Project document submitted to the Government of Bangladesh by the International Development Association (IDA). World Bank, Dhaka. ২০১৩.
১৩৭. FPMU (২০১৫). Bangladesh Food Situation Report April-June, ২০১৫. Volume ১০১. Food Planning and Monitoring Unit (FPMU). Ministry of Food, Government of Bangladesh (available at www.mofood.gov.bd).
১৩৮. Data obtained from the Department of Agricultural Marketing, Dhaka.
১৩৯. This is believed to have happed particularly in ২০১০/১১ during which distribution through OMS constituted ৩৯% of total public foodgrain distribution in the country. This volume of OMS operation is believed to have had some moderating effect on the market price of coarse rice in some urban locations.
১৪০. Directorate General of Food. Ministry of Food, Government of Bangladesh. Dhaka, June ২০১৫.
১৪১. Information available from the Ministry of Food showed that construction of godowns in some locations was being delayed due to problems associated with acquisition of land.
১৪২. This is because in most cases farmers, particularly small and marginal farmers, do not have direct access to the procurement centres, and the major part of procurement is done through contract with millers.
১৪৩. Alam, M.J. et al (২০১৪). op. cit.
১৪৪. BIDS (২০১২). Estimation of Parameters Needed for Integrated and Effective PFDS Planning in Bangladesh. A study conducted by the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) for the Ministry of Food, Government of Bangladesh. Dhaka. December ২০১২.
১৪৫. GED (২০১৫b). op. cit.
১৪৬. The definition of SSN used here includes cash transfers, non-cash transfers and food-for-work. Moreover, it corresponds to what the MoF budgetary reports call "Social Protection".
১৪৭. While the Government SSN spending consists of social protection and social empowerment spending, in this report social protection spending, being a more comprehensive category, corresponds to the sum of SSN and social empowerment spending.
১৪৮. WB (২০১৫). Bangladesh - Employment Generation Program for the Poorest Project. Washington, D.C.: World Bank Group.
১৪৯. GED (২০১৫b). op. cit.
১৫০. According to a comprehensive compilation of MoF, there are ১৪৫ programmes financed through the budget. Total spending for these programmes in ২০১৪/১৫ was ৩০৭.৯ billion taka, or around ১৩% of the Government budget.
১৫১. Tirivayi, N., Knowles, M. and Davis, B. (২০১৩). The interaction between social protection and agriculture: A review of evidence. From Protection to Production. Rome: FAO.
১৫২. GoB (২০১২). National Agricultural Extension Policy ২০১২. Ministry of Agriculture, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka.

১৫৩. Arifeen, S., Black, R.E., Antelman, G., Baqui, A., Caulfield, L., Becker, S. (২০০১). Exclusive breastfeeding reduces acute respiratory infection and diarrhea deaths among infants in Dhaka slums. Pediatrics ২০০১; ১০৮:E৬৭.
১৫৪. BRAC Institute of Global Health and FAO (২০১৪a). Baseline Survey Report on Improving Food Security of Women and Children by Enhancing Backyard and Small Scale Poultry Production in the Delta Region. BIGH and FAO. ২০১৪.
১৫৫. www.spring-nutrition.org/countries/Bangladesh.
১৫৬. BRAC Institute of Global Health and FAO (২০১৪b). Baseline Survey Report on Integrated Agriculture and Health Based Interventions for Improved Food and Nutrition Security in Selected Districts of Southern Bangladesh. BIGH and FAO. ২০১৪.
১৫৭. Endline Survey Report on Integrated Agriculture and Health Based Interventions for Improved Food and Nutrition Security in Selected Districts of Southern Bangladesh. INFS & FAO.২০১৬
১৫৮. FAO and FHI ৩৬০ (২০১৬). Minimum Dietary Diversity for Women: A Guide for Measurement. Rome: FAO.
১৫৯. Helen Keller International (HKI) and James P Grant School of Public Health (JPGSPH), BRAC Institute of Global Health (BIGH) (২০১৫). State of food security and nutrition in Bangladesh: ২০১৪. Dhaka, Bangladesh: HKI and JPGSPH.
১৬০. Yosef, S. et al (২০১৫). op. cit.
১৬১. NIPORT, Mitra and Associates, and ICF International (২০১৫). op. cit.
১৬২. MoHFW (২০১৪). Mid-Term Review of the Bangladesh Health, Population and Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) ২০১১-২০১৬. Ministry of Health and Family Welfare, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
১৬৩. HarvestPlus (২০১৫). Bangladesh. Country Brief. November ২০১৫ (available at www.harvestplus.org).
১৬৪. Leyvraz, M., laillou, A., Rahman, S., Ahmed, T., Rahman, A.S., Alam, N., Ireen, S., and Panagides, D. (২০১৫). An Assessment of the Potential Impact of Fortification of Staples and Condiments on Micronutrient Intake of Young Children and Women of Reproductive Age in Bangladesh, Nutrients ২০১৫, ৭(১২): ৯৯৬০–৯৯৭১.
১৬৫. Co-convened by DfID and USAID.
১৬৬. Partnership between FAO, UNICEF, WFP, WHO and IFAD aimed at strengthening multisectoral coordination, nutrition governance, advocacy and knowledge sharing) and the SUN Donor/Development Partner Network, co-convened by DfID and USAID.
১৬৭. FAO and WHO (২০১৫). Second International Conference on Nutrition: Report of the Joint FAO/WHO Secretariat on the Conference. Rome, ২০১৫.
১৬৮. State of Food Security and Nutrition (SFSN) ২০১৫, JPGSPH, BRAC University , BBS, KHI.
১৬৯. MoHFW (২০১৫). Annual Programme Review, ২০১৫ of the Health, Population and Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) ২০১১-২০১৬. Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh.
১৭০. MoPME (২০১৪). Annual Primary School Census ২০১৪. Monitoring and Evaluation Division, Directorate of Primary Education, Ministry of Primary and Mass Education (MoPME), Government of Bangladesh.
১৭১. MoHFW (২০১১). Programme Implementation Plan of the Health, Population and Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) ২০১১ -২০১৬. Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh.
১৭২. FHI ৩৬০: Alive & Thrive Project (২০১৩). Engaging the media: A practical guide to meeting child nutrition advocacy goals through working with journalists. Dhaka, Bangladesh (also available at: www.aliveandthrive.org).
১৭৩. Fanzo, J., Curran, S., Remans, R., Mara, V., Briseòo, J.S., Cisewski, D., Denning, G., and Fracassi, P. (২০১৪) Stimulating the potential of nutrition sensitive investments, Centre on Globalization and Sustainable Development. Centre on Globalization and Sustainable Development. Earth Institute: Columbia University.
১৭৪. WHO, UNICEF, USAID, AED, UCDAVIS, IFPRI (২০০৮). op. cit.
১৭৫. Institute of Nutrition and Food Science (২০১৫). Draft IAHBI Terminal Report (২০১৫).
১৭৬. Ruel, M. and Alderman, H. (২০১৩). Nutrition sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? The Lancet, Maternal and Child Nutrition ৩ Series: ৬৬-৮১.
১৭৭. BBS, Bill & Melinda Gates Foundation, FAO (২০১৪). Report on in Depth Capacity Assessment of Bangladesh to produce agricultural and rural statistics.
১৭৮. IPC is a set of protocols to classify the severity and causes of food insecurity and provide actionable knowledge by consolidating wide-ranging evidence.
১৭৯. BSTI was established by the Government through an Ordinance passed in July ১৯৮৫. The Ordinance has been amended as the BSTI (Amendment) Act, ২০০৩.
১৮০. HKI and JPGSPH, BIGH (২০১৫). op. cit.
১৮১. Ibid.
১৮২. NFP Partner ministries and divisions include: MoA, MoFL, MoWR, LGD, Rural Development and Co-operatives Division (RDCD), Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs (MoCHTA), Ministry of Social Welfare (MoSW), MoWCA, MoFood, MoDM, MoHFW.
১৮৩. Agriculture sector includes MoA, MoFL and MoWR.
১৮৪. Rural Development includes LGD, RDCD and MoCHTA.
১৮৫. MoSW, MoWCA, MoFood and MoDMR.
১৮৬. MoF data considers MoFood/a, MoDMR/b consolidated budget for ২০০৭/০৮